সুকুমার বিচিত্রা

সুজিত কুমার নাগ
সম্পাদিত

। পরিবেশক ।
নিউ বুক সাপ্লাই এজেন্সী
১৮/এম, টেমার লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৯৪

প্রকাশক :
শ্রীসুজিত কুমার নাগ
১১৬/২, শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড
কলিকাতা-৩১

প্রচ্ছদ :
শ্রীঅঞ্জন বসু

মুদ্রাকর :
শ্রীনিমাই চন্দ্র ঘোষ
দি রঘুনাথ প্রিন্টার্স
৪/১ই, বিডন রো
কলিকাতা-৭০০০০৬

এই প্রসঙ্গে

বাংলা কিশোর ও শিশু-সাহিত্য সুকুমার রায় এক স্মরণীয় নাম। তাঁর সাহিত্য সুকুমার সৃষ্টি, বৈচিত্রময় বহুমুখী প্রতিভা আমাদের জাতীয় জীবনের এক অপূর্ব ইতিহাস। তিনি আমাদের বাংলা সাহিত্যে যা দান করে গেছেন, তা চিরকল্পনাই উজ্জ্বল হয়ে রইবে। সুকুমার রায় জন্মেছিলেন আজ থেকে একশ বছর আগে এই বাংলার বুকে। তাঁকে স্মরণ করেই শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি এই সুকুমার বিচিত্রা। বুদ্ধিমান পাঠক মাত্রই জানেন, বইয়ের মলাটই তার আসল পরিচয় নয়, তারও একটা দিক আছে, এই সংকলন এই সুকুমার রায়ের জীবন ও সাহিত্য নিজে সুচিন্তিত আলোচনা রয়েছে যা চিরকালের জন্য অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে এ বিশ্বাস আমাদের আছে। যাঁদের লেখা এই সংকলন গ্রন্থে অন্তর্ভূর্ক্ত করা হয়েছে তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞ নিয়ে স্মরণ করি 'সাপ্তাহিক দেশ' মাসিক 'সন্দেশ' আনন্দ মেলা পত্রিকাকে। আর নেপথ্য থেকে শ্রীদেব কুমার বসু ও শ্রীনিমাই ঘোষ আমাদের নানাভাবে সাহায্য করেছেন এই জন্য তাঁর কাছে আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ।

যাঁদের জন্য এই সংকলন গ্রন্থ তাঁদের ভাললাগলে আমাদের প্রচেষ্টা স্বার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

আশ্বিন ১৩৯৪ সুজিত কুমার নাগ

সুকুমার বিচিত্রা

[শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলী]

সুজিত কুমার নাগ

সূচীপত্র

হয়নি, আর হবেও না

সত্যজিৎ রায়

১৯২১ সালের ২ মে আমার জন্ম। তার আগেই বাবা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তারপর আমার দু বছর বয়সে ১৯২৩ সালের ১০ সেপ্টেম্বর তিনি চলে গেলেন।

ন'দিন পর বই হয়ে বেরল 'আবোল তাবোল'। পুত্র হিসেবে পিতা সম্পর্কে কিংবা 'আবোল তাবোল' নিয়ে আমার কোন স্বতন্ত্র, বিশিষ্ট স্মৃতি কিছু নেই। কেউ কেউ বলেন, রামগরুড়ের ছানা, ট্যাঁশ গরু বা কাঠবুড়ো লিখবার সময় বাবা কোন জীবিত মানুষকে নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন।

'বুঝিয়ে বলার' মত উদ্ভট পাণ্ডিত্য নিয়ে ঘুরে বেড়ান, এমন মানুষ তো কিছু কিছু রয়েছেনই। কিন্তু সত্যি তারা ছিলেন কিনা এ সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে আমার আলাদা কিছু জানা নেই। আর দশজন বাঙালী ছেলের কাছে ছোটবেলায় 'আবোল তাবোল' যে আকর্ষণ নিয়ে আসে, আমার কাছেও তাই। আর 'আবোল তাবোল' সম্পর্কে এত কথা বলা হয়েছে যে নতুন করে আর নতুন কোন কথা শোনাবার নেই। এটুকু বলতে পারি, এমনটি কোনদিন হয় নি, আর হবেও না। লেখা এবং ছবির এমন সাযুজ্য, এমন অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ দুর্লভ। প্রতিটি লেখার সঙ্গে যে ছবিটি তিনি এঁকেছেন, এ ছাড়া অন্য কোন রকম ভাবে এর চেয়ে ভাল করে সেই কবিতার চরিত্র বা ব্যঞ্জনাটিকে প্রকাশ করা যেতনা।

'কুমড়োপটাশ' কিম্বা 'খিচুড়ির' হাঁসজারু, গিরগিটিয়া বকচ্ছপ—এইসব কল্পনার প্রাণীগুলিকে অন্য কোন চেহারায় ভাবাই যায় না। যে সব চরিত্র পরিচিত, যেমন নোটবইয়ের সেই 'এই দেখ পেনসিল, নোটবুক এ হাতে' নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটি কিম্বা পাগলা জগাই, তারাও সঠিক। কেবল যেটা বাড়তি সেটা ঐ চরিত্রগুলির মজার দিকটা। 'আবোল তাবোল' কোনদিন পুরানো হবে না, এ কথাটা বলা যায়। প্রজন্মের পর প্রজন্মের মধ্য দিয়ে 'আবোল তাবোল' তার বিশিষ্ট জায়গাটির দখল রেখে চিরকাল এক বিস্ময় হয়ে থাকবে।

দৈনিক 'আজকাল' পত্রিকা ২০. ৯. ৮৭ তারিখের
পত্রিকা থেকে সংকলিত করা হয়েছে।
অনুলিখন :—সুপ্রিয় সেন।

সুকুমার রায়ের জীবনপঞ্জী

প্রলয় সেন

সুকুমারের জন্ম ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে। তিনি পিতামাতার দ্বিতীয় সন্তান। বিদ্যালয় জীবনের পাঠ শেষ করেন সিটি স্কুলে। কলেজীয় শিক্ষা কলকাতাতেই। ছেলেবেলা থেকেই পিতা উপেন্দ্রকিশোরের অনেক গুণ তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন তিনি। পদার্থ এবং রসায়ন—একই সঙ্গে দুই বিষয়ে অনার্স সহ তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে বি. এস. সি পাশ করেন। বিজ্ঞান মনস্কতা, সাহিত্যপ্রীতি, চিত্রাঙ্কন-দক্ষতা, সংগীতপ্রিয়তা—ছেলেবেলা থেকেই এসব গুণ ধরা পড়েছিল সুকুমার চরিত্রে।

আট বছর বয়সে লেখা তাঁর 'নদী' কবিতাটি প্রকাশিত হয় শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'মুকুল' পত্রিকায়। পরের বছর ঐ একই পত্রিকায় প্রকাশ পায় বিদেশী কবিতার ছায়া অবলম্বনে রচিত তাঁর আর একটি কবিতা—নাম 'টিক্ টিক্-টং'।

ছেলেবেলা থেকেই সুকুমার ছিলেন আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। ভাই-বোনেদের নানা রকম গল্পে মাতিয়ে রাখতেন। জীবজন্তু এবং মানুষের বিচিত্র স্বভাব অনুকরণ করে চটজলদি ছড়া বেঁধে এবং সেই সঙ্গে নাটুকে অঙ্গভঙ্গি করে সকলকে আনন্দ দিতেন। ছেলেবেলা থেকেই অত্যন্ত আমুদে ছিলেন সুকুমার। নানা ধরনের ছন্দ-মিলে হাতে খড়ি ও এই সময়ে। সন্ধ্যার সময়ে ছড়া বাঁধবার নানা মজার খেলায় মেতে উঠত রায়চৌধুরী পরিবার। যে-কোন একজন কবিতার একটি পংক্তি বলতেন বানিয়ে। ছন্দ মিল, এই সব ভাবের ক্ষমতা বজায় রেখে পরের জন পরবর্তী পংক্তিটি রচনা করত। যেমন—

'একদা এক বাঘের গলায় ফুটেছিল অস্থি,'
'যন্ত্রনায় কিছুতেই নাহি তার স্বস্তি,'

'তিনদিন তিনরাত নাহি তার নিদ্রা,'
'সেঁক দেয় তেল মাখে লাগায় হরিদ্রা।'

এইভাবে সুকুমার ছেলেবেলা থেকে ছন্দ-মিল ক্ষমতাটি অর্জন করেন। এছাড়া—তৎকলীন বাংলার শ্রেষ্ঠ মনীষীরা ছিলেন পিতা উপেন্দ্রকিশোরের সুহৃদজন।

সেই সুবাদে ছেলেবেলা থেকেই সুকুমার পণ্ডিতপ্রবর শিবনাথ শাস্ত্রী, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, বিজ্ঞানসাধক জগদীশচন্দ্র বসু কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনীষীদের সান্নিধ্যে আসেন। ফলে প্রথম পর্বেই সুকুমার রায়ের মনোজগৎ সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

কলেজীয় শিক্ষা সমাপ্ত হবার কিছুদিন পরেই প্রতিষ্ঠিত হয় 'ননসেন্স ক্লাব'। ক্লাবের মুখপত্র হিসেবে প্রকাশ পায় 'সাড়ে বত্রিশ-ভাজা'। ব্রাহ্মসমাজের যুবকবৃন্দ, বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে গড়া এই ক্লাব সংগঠনের মধ্য দিয়েই সুকুমার প্রতিভা কোন খাতে বইবে তার আভাস পাওয়া যায়। এই সময়ে ননসেন্স ক্লাবে সদস্যদের নিয়ে অভিনয়ের উদ্দেশ্যে রচিত 'ঝালাপালা' ও 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' তাঁব অনন্য সৃষ্টিক্ষমতা উজ্জ্বল প্রমাণ।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে গুরুসদয় বৃত্তি পেয়ে উন্নত ধবনের ছাপার কাজ, ব্লক ইত্যাদি তৈরীর বিষয়ে শিক্ষার্থে সুকুমার বিদেশে যাত্রা করেন এবং লণ্ডনের 'L. C. C. School of photo Engineering and Lithography' তে ভর্তি হন। সেই সঙ্গে ম্যাঞ্চেস্টার স্কুল অব টেকনলজি'তেও স্টুডিও এবং ল্যাবরেটরির কাজে তালিম নেন এবং সেখানকার পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে প্রথম হন। তিনিই ইংলণ্ডের রয়েল ফটোগ্রাফিক সোসাইটির প্রথম ভারতীয় সদস্য হবার কৃতিত্ব অর্জন করেন। সুকুমার লণ্ডনে ছিলেন দুবছর। তাঁর প্রবাস জীবন ছিল কর্মব্যস্ত। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে June মাসে রবীন্দ্রনাথ লণ্ডনে যান।

এ সময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুকুমার রায়ের ঘনিষ্ঠতার বন্ধন আরও নিবিড়তর হয়। মা বিধুমুখীকে লেখা একটি চিঠি থেকে

আমরা জানতে পারি—"রবিবাবুরা আজ না হয় কাল জার্মানি, ফ্রান্স প্রভৃতি জায়গায় বেড়াতে বেরোবেন। দ্বিজেনবাবু (দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র) তাঁদের সঙ্গে যাচ্ছেন। আমাকেও যাবার জন্য রবিবাবু বিশেষ করে বলছেন—কাজেই আমিও রাজি হয়েছি।" রবীন্দ্রনাথের 'সুদূর', 'পরশপাথর,' 'সন্ধ্যা,' কুঁড়ির ভিতর কাঁদিছে গন্ধ' ইত্যাদি কবিতা সুকুমার এই পর্বে অনুবাদ করে ইংলণ্ডের বিদগ্ধ সমাজ কবির পরিচিতি ঘটাতে সাহায্য করেন। এছাড়া সুকুমার **'The Spirit of Rabindranath'** নামেও একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। এটি লণ্ডনের বিখ্যাত পত্রিকা **'Quest'**-এ প্রকাশিত হলে সুধীমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই সুকুমার ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন।

সুকুমার বিলেত থেকে ফেরাব চার মাস আগে 'সন্দেশ' পত্রিকার প্রকাশ ঘটে। কলকাতায় এসে স্বভাবতই তিনি উপেন্দ্রকিশোর প্রবর্তিত এই কাগজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন। ক্রমশঃ তাঁর লেখা এবং ছবিতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে 'সন্দেশ'-এর পাতা। 'খেয়াল রস'-এর স্রষ্টা এই লোকজীয় অচিরে আবালবৃদ্ধ-বনিতা--তাবৎ বাঙালি পাঠককে মুহুর্মহু সম্মোহিত করতে থাকে। 'আবোল তাবোল' 'খাই খাই' 'হ য ব র ল' 'পাগলা দাশু', 'বহুরূপী' অন্যান্য কবিতা,' অন্যান্য গল্প', নাটকাদি ('লক্ষ্মণের শক্তিশেল' চলচিত্তাঞ্চরী' 'ঝালাপালা' 'অবাক জলপান' 'শব্দকল্পদ্রুম' 'হিংসুটে' ইত্যাদি), 'জীবজন্তু' প্রভৃতি গ্রন্থে আবদ্ধ তাঁর কালোত্তীর্ণ রচনার সবটাই সন্দেশের বিভিন্ন সংখ্যার স্ব-অঙ্কিত চিত্রসহ প্রকাশিত হয়। উপেন্দ্রকিশোরের মৃত্যুর পর 'সন্দেশ' এর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব স্বভাবিত সুকুমারের ওপর বর্তায়।

শুধু 'সন্দেশ' এর পরিচালনা নয় শুধু, সেই সঙ্গে উপেন্দ্রকিশোর প্রতিষ্ঠিত 'ইউ, রায় এণ্ড সন্স'-এর কাজকর্মেও পিতার সঙ্গে হাত হাত লাগাক সুকুমার। বিলেত থেকে তিনি ছাপাখানা এবং ক্যামেরার যে সব উন্নততর প্রয়োগ-পদ্ধতি শিখে এসেছিলেন সে-

সবের ও ব্যবহারে তৎপর হন। পিতার অভিজ্ঞতা ও উৎসাহ এবং নিজের প্রতিভা ও কর্মদক্ষতায় ইউ, রায় এণ্ড সন্স থেকে প্রকাশিত গ্রন্থাদি কি মুদ্রণের অভিনবত্বে কি সচিত্র-অঙ্গসজ্জায় এদেশে নবযুগের সূচনা করে। সেই সঙ্গে স্ফূর্তিবাজ মজলিশপ্রিয় সুকুমার ১৯১৫ সাল নাগাদ 'ননসেন্স ক্লাব'-এর কথা স্মরণে রেখে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করেন 'মনডে ক্লাব'-এর (তাঁর তর্জমায় এই ক্লাবের নাম মণ্ডা সম্মেলন)। প্রত্যেক সোমবার কোন না কোন বিশিষ্ট সদস্যের বাড়িতে এই ক্লাবে অধিবেশন বসত। ক্লাবের মধ্যমণি ছিলেন সুকুমার। সম্পাদক শিশির কুমার দত্ত। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, রবীন্দ্র সমালোচক অজিতকুমার চক্রবর্তী, গীতিকার অতুলপ্রসাদ সেন, ঐতিহাসিক কালিদাস নাগ, বিজ্ঞানী প্রশান্ত মহলানবীশ, সমালোচক লেখক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ও শিক্ষাবিদ্ নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত, 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদক হিরণকুমার সান্যাল, প্রমুখ খ্যাতনামা ব্যক্তিরা ছিলেন এই ক্লাবের সদস্য। সুকুমারের সংক্ষিপ্ত অথচ কর্মব্যস্ত জীবনের আর এক কীর্তি প্রচলিত ধর্মানুশাসনের বিধি এবং নিষেধগুলি দূর করে ব্রাহ্মসমাজে নতুন চিন্তাভাবনা তথা রক্তসঞ্চার করা। ব্রাহ্মসমাজের তরুণদের দিয়ে এই কাজে তিনি একটি যুবগোষ্ঠী তৈরী করে আলোচনা এবং সভা ইত্যাদির মাধ্যমে আলোড়ন সৃষ্টি করেন।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সুকুমারের বিবাহ হয়। পাত্রী কালীনারায়ণ গুপ্তের কন্যা সুপ্রভা। তখন সংগীতচর্চার ক্ষেত্রে গুপ্ত পরিবারের খ্যাতি দেশজোড়া। সুপ্রভাও খুব ভাল গান গাইতেন। সুকণ্ঠের জন্য তিনি রবীন্দ্রনাথের স্নেহভাজন হন। বহু অনুষ্ঠানে তিনি রবীন্দ্রনাথের কথামত গান গেয়েছেন। সুকুমার সুপ্রভার একটিই মাত্র সন্তান—সত্যজিৎ রায়। সত্যজিতের জন্ম ১৯২১ খৃষ্টাব্দে।

এই সময়ে একবার তিনি পৈতৃক ভদ্রাসন দেখার মানসে মাসূয়া

গ্রামে বেড়াতে যান। সেখানে আকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন।

একে উদয়াস্ত খাটুনি, তার ওপর কালাজ্বরে আক্রান্ত হয়ে তাঁর প্রাণশক্তি হ্রাস পেতে থাকে। তখন কালাজ্বর ছিল দুরারোগ্য ব্যাধি। শয্যাশায়ী হলেও তিনি যথাসাধ্য পরিশ্রম করতে থাকেন। 'সন্দেশ' পত্রিকার সম্পাদনা এবং লেখা ও ছবির আঁকার কাজ চলতে থাকে সমানে। স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য কিছুকাল বাইরে কাটিয়ে আসেন। সুফল হয় না কিছুই। দীর্ঘ আড়াই বছর লড়াই করেন ব্যাধির সঙ্গে। রোগশয্যায় নিয়মিত আসতেন শুভানুধ্যায়ীর দল। শান্তিনিকেতন থেকে প্রায়ই কলকাতায় তাঁকে দেখতে আসতেন আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন। নানা শাস্ত্রকথা শুনিয়ে তাঁর দুঃখ দূর করবার চেষ্টা করতেন। হাজার কাজের ফাঁকেও ঠিক সময় করে হাজির হতেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। শয্যাপার্শ্বে বসে একের পর এক গান গাইতেন। শেষের দিকে নিজের মৃত্যু সম্পর্কে স্থিরনিশ্চয় হয়ে গিয়েছিলেন সুকুমার। এই সময় লেখা এক রচনায় আশ্চর্যভাবে তা ধরা পড়ে। তিনি লিখেছিলেন—"ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর, গানের পালা সাঙ্গ মোর।" অতঃপর সেই চরমক্ষণ ঘনিয়ে এল।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর দশ মাস দশ দিন বয়ঃক্রমকালে ছড়ার সম্রাট, খেয়াল রসের অনন্য স্রষ্টা সুকুমার রায়ের অকাল মৃত্যু ঘটল। তিনি লিখলেন—

"অজর অমর অরূপ রূপ,
নই আমি এই জড়ের স্তূপ।
দেহ নহে মোর চিরনিবাস,
দেহের বিনাশে নাহি বিনাশ॥"

একথা তাঁর মৃত্যুঞ্জয়ী প্রতিভা সম্পর্কে সর্বাংশে সত্য।

শুধু পিতাপুত্র সম্পর্কে নয়, প্রতিভার দীপ্তিতেও উপেন্দ্রকিশোর এবং সুকুমার—এই দুই ব্যক্তিত্ব করেছে এক বিরল সাযুজ্য। সারস্বত সাধনায়, বিজ্ঞান মনস্কতায়, সঙ্গীত প্রেমে, অঙ্কন বৈশিষ্ট্যে,

বন্ধুবাৎসল্যে, পরিহাসপ্রিতায়, সাংগঠনিক দক্ষতায়, এমন কি মুদ্রণ ও ফটোগ্রাফী বিষয়ক অনুরাগে এ জাতীয় বিস্ময়কর মিল, অমোঘ পারম্পর্য সত্যিই দুর্লভ। দুজনেই স্বল্পায়ু। উপেন্দ্রকিশোরের প্রয়াণ ৫২ বছর বয়সে। সুকুমারের ছত্রিশের কোঠায় পৌঁছাবাব আগেই। অথচ, এঁদের সীমিত সাহিত্যচর্চার ফসল চিরকালের বাঙালি পাঠকেব কাছে এক মহার্ঘ সম্পদ। .

সুকুমার তাঁর নাম

লীলা মজুমদার

সুকুমার রায়ের জন্ম ১৮৮৭ সালে। দীর্ঘায়ু মানুষ নন, ১৯২৩ সালেই তাঁর জীবনাবসান হয়। কিন্তু স্বল্পায়ু হয়েও যা সাহিত্য তিনি সৃষ্টি করে গিয়েছেন, তার তো মৃত্যু নেই। শুধু তা-ই নয়, তাঁর ছড়া, তাঁর ছবি, তাঁর গল্প, তাঁর নাটক আমাদের জীবনে আজও জোগাচ্ছে সেই সঞ্জীবনী রস, মৃত্যুকে যা তুচ্ছ করতে শেখায়। শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসেবেই এখানে প্রকাশ করা হলে তাঁর সম্পর্কে এই রচনামালা।

একটা মানুষ কী বলেছিল বলে যদি তাকে মনে রাখতে হয়, তা হলে তাকে সে-কথা লিখে যেতে হয়। নিজে না লিখলেও, তার শিষ্য-শাকরেদদেব লিখতে হয়। আব, যদি সে কী করেছিল বলে তাকে মনে বাখতে হয়, তা হলে হয় তাকে নিজের জীবনকথা লিখতে হয, নযতো কোনও বন্ধু বা প্রিযজনকে সে-কথা লিখতে হয়।

সুকুমাব বায জন্মেছিলেন ১০০ বছব আগে এই কলকাতা শহবেই। কর্নওযালিস স্ট্রিটেব ১৩ নং মস্ত লাল বাড়ির একটা ঘরে। বাড়িতে অনেক ভাড়াটে ছিলেন। একতলায ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালযের সবে পত্তন হয়েছিল। সেখানে সুকুমারের, তাঁর ছোট্ট দিদি সুখলতা আব পরে অন্য ভাইবোনদেরও হাতেখড়ি হয়েছিল।

পাশের খোলা জমিতে প্রতি বছর শীতকালে একটা ছোট সার্কাস বসত। ওঁরা ওপর থেকে অবাক হয়ে দেখতেন, রাতে যারা ঝকমকে সাজ করে আশ্চর্য খেলা দেখায়, দিনের বেলা তারাই আবার সাধারণ লোকের মতো চান করে, কাপড় কেচে দড়িতে মেলে দেয। ১৩ নং বাড়িতে ছোট ছেলেদের দেখবার আরও জিনিস ছিল। একতলায় মস্ত মস্ত চৌবাচ্চায়, জল ধরে রাখা হত। সেখানে ভাড়াটেরা কেউ-কেউ মাছ, কচ্ছপ জিইয়ে রাখতেন। পাশের বাড়িতে মস্ত

বিলিতি আমড়ার গাছ ছিল, আর একজন দয়ালু মালি লম্বা বাঁশের আগায় গোছাগোছা আমড়া বেঁধে দোতলার চানের ঘরের জানলা গলিয়ে ছেলেমেয়েদের দিত।

মস্ত ছাদে উঠে বাড়ির আর স্কুলের বোর্ডিংয়ের সব ছেলেমেয়েরা খেলা করত। শুনেছি, মাঝে-মাঝে দেখা যেত, একটা কাঠির আগায় ময়লা জিনিস ফুটিয়ে একটা হাসিখুশি ছোট ছেলে ছোট-ছোট মেয়েদের তাড়া করে বেড়াচ্ছে, আর তারা ছি! তাঁতা কী যে করো, বলে পালাচ্ছে।

ওই ছেলের ডাকনাম তাতা, আর, তার দিদির ডাকনাম হাসি। রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' বইখানি থেকে নাম দুটি নেওয়া। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সুখলতাদি সর্বদা এত গম্ভীর মুখে বসে থাকত যে, তার ও-নাম লোকে ভুলেই গেল।

সুকুমার আমার জ্যাঠতুতো দাদা, আমরা তাকে বড়দা বলে ডাকতাক। ছোটবেলা থেকে রোজ অন্তত আধ ঘণ্টা সবাই মিলে তাঁর লেখা নাটকগুলো থিয়েটারি ঢঙে না পড়লে আমাদের দিন কাটত না। আমরা থাকতাম শিলং পাহাড়ে, প্রতি মাসে পথ চেয়ে থাকতাম কবে 'সন্দেশ' আসবে। এলেই শেষের দিকের কিম্ভুত-কিমাকার ছবিসহ আবোলতাবোল ছড়াগুলো পড়তাম, আর ভাবতাম, আবোলতাবোল তো মোটেই নয়, দিব্যি সুন্দর মানে বোঝা যাচ্ছে। পাগলা দাশুর গল্পগুলো মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। এইভাবে আমরা বড়দা'র চ্যালা বনে গিয়েছিলাম। একই জিনিস বারেবারে পড়েও আশ মিটত না। এক-একবার পড়ি আর নতুন-নতুন রস খুঁজে পাই। আর হেসে মরি। আমাদের মাসি দেখে-দেখে অবাক হতেন, কিসে এত মজা পাচ্ছি ভেবে পেতেন না।

জানো নিশ্চয়, যে-সব কথা লোকে ভুলতে পারে না, এক দিক দিয়ে বলা যায় যে, বুড়ো গাছের মতো মাটির তলায় কথার শিকড় [illegible] বাড়তে অনেকদূর হয়তো আর-একটা কথার চারাগাছ [illegible] [illegible] পায় [illegible] মাটির [illegible]

নদীর মতো কথা বয়ে চলে ; যেখান দিয়েই বয়ে যায় উপরের মাটিটাকে সবুজ সজীব করে দিয়ে যায়। সুকুমার রায়ের চিন্তার ফসলগুলো, তিনি চলে যাবার ৬৪ বছর পরেও আমাদের মনে রস জোগাচ্ছে।

পৃথিবীতে গোনাগুনতি মানুষ জন্মেছেন, যাঁরা কখনও সেকেলে বা পুরনো হয়ে যান না। হয় তাঁরা এমন সব গান বেঁধেছেন, নয় গল্প বলেছেন, নয় ছড়া কেটেছেন, নয় ছবি এঁকেছেন বা মূর্তি গড়েছেন, যার মানে বুঝতে কারও অসুবিধা হয় না, যা ভাবতে ভাল লাগে ; যাতে এত মজা লাগে যে, মনে জোর পাওয়া যায়। এমন-সব কথা শুধু তারাই লিখতে পারে, যারা দুনিয়াটাকে, আর দুনিয়ার সব জীবজন্তু, গাছপালা, তা সে সত্যিই হোক, কি কল্পিতই হোক, সবাইকে এবং সব-কিছুকে ভয়ংকর ভালবাসে। একবার পান্তভূতের জ্যান্ত ছানাটার আর তার মায়ের মুখ দুটো মনে করো, আর মায়ের কথাগুলো ভেবে দ্যাখো, অমনি তোমাদেরও মন থেকে সব দুঃখ-দুর্ভাবনা দূর হয়ে যাবে। এ-সব লোক যে-কোনও সময়ে যে-কোনও দেশে জন্মাতে পারেন।

পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলার মসূয়া গ্রামে ওঁদের বাড়ি ছিল। তার চারশো বছর আগে পশ্চিম থেকে এসে ব্রহ্মপুত্রের ধারে বসবাস শুরু করেন। ভাষাবিদ, পণ্ডিত অনেকেই। আমাদের ঠাকুরদার নাম ছিল কালীনাথ রায়, ডাকনাম শ্যামসুন্দর। আরবি, ফারসি আর সংস্কৃত এত ভাল জানতেন যে, হাতে একটা পাণ্ডুলিপি ধরে গড়গড় করে ওই তিন ভাষার যে কোনওটাকে পড়ে যেতেন ; একটুও বুঝবার জো ছিল না, হাতে-ধরা লিপিটা কোন্ ভাষাতে লেখা, মূলটাই পড়ছেন, নাকি অনুবাদ করে পড়ছেন। অনেকেরই চমৎকার গানের গলা আর সুরবোধ ছিল। আর গলার জোর কত। ওঁদের এক জ্যাঠামশাই ব্রহ্মপুত্রের এ-পার থেকে তাঁর কাজের মুনিষকে ডাকতেন, আর সে ও-পার থেকে জবাব দিত। [illegible] তাঁর অনেক [illegible]

সামনের চাতালে বসে থাকতেন। পাশেই বন; সেই বন থেকে বেরিয়ে এসে একদিন একটা বুনো দাঁতাল শুয়োর তাঁকে আক্রমণ করেছিল। বাতের ব্যথায় উঠতে পাবেন না বুড়ো, কিন্তু এক হাতে শুয়োরের, চোয়াল, অন্য হাতে ঘাড় ধরে মোচড় দিতে-দিতে তারস্বরে চ্যাঁচাতে লাগলেন, "কে কোথায় আছস্! আমারে শুয়ারটা মাইরা ফেলায়!" সবাই ছুটে এসে ছাখে, শুয়োর তাঁকে মারা দূরে থাকুক, তিনিই খালি হাতে শুয়োবের ঘাড় মটকে মেরে ফেলেছেন!

এই বংশেব বক্ত ছিল সুকুমাবের শবীরে। বেশ লম্বা, বলিষ্ঠ চেহারা ছিল। অসাধারণ মনেব জোর। যে মুখে সর্বদা হাসি লেগে থাকত, অন্যায়, মিথ্যাচারণ, কিংবা নিষ্ঠুবতা দেখলে সেই মুখ-ই বজ্রগম্ভীব হযে উঠত। তোমরা হয়তো ভাবো, উপেন্দ্রকিশোব রায়চৌধুরীব ছেলেব নাম কী করে সুকুমার রায়। মেজোভাই সুবিনয়ও গোড়ায় বায়চৌধুরী লিখলেও, পরে শুধু রায় লিখতেন। তা হলে আরেকটু পিছনে ফিরে যেতে হয। শ্যামাচবণের এক জ্ঞাতিভাই ছিলেন, তাঁর নাম হরিকিশোর রায়চৌধুরী। তাঁর বাবা নিজের অবস্থার উন্নতি কাব, জমিদাবি কিনে, বাযচৌধুরী নাম বিধিমতে নিয়েছিলেন। হরিকিশোরের ক'টি মেয়ে জন্মাল, কিন্তু একটিও ছেলে হল না বলে শ্যামসুন্দরেব মেজোছেলে চার বছরের কামদারঞ্জনকে আইনমতে পুষ্যি নিয়ে, নিজের নামেব সঙ্গে মিলিয়ে উপেন্দ্রকিশোব নাম রাখলেন। পরে একটি ছেলেও হয়েছিল, তাঁর নাম নরেন্দ্রকিশোর। হরিকিশোরের বাড়িতে পরম আদরে উপেন্দ্রকিশোব মানুষ হলেও, নিজের বাপ, মা, ভাই-বোনদের প্রতি ভালবাসাও এতটুকু কমেনি। সুকুমার তাঁদের বংশের আগের নাম রায়-ই লিখতেন।

কিন্তু রায়-ও তাঁদের আদি পদবি নয়। বিহারে তাঁদের সকলে 'দেও' বলে জানত। ঈশা খাঁর সময়ে বাংলায় এসে প্রথমে 'দেও' থেকে নামটি হল 'দেব'। তারপর নবাবরা এক সময় তাঁদের 'রায়' উপাধি দিয়েছিলেন, সেই উপাধিটিই থেকে গেছে।

উপেন্দ্রকিশোরের বংশধর কে কে আছেন, তোমাদের হয়তো জানতে ইচ্ছা করে। সবার বড় সুখলতার তিন মেয়ে গত হয়েছে, ছেলে বিলেতে বাস করে। সুকুমারের একমাত্র ছেলে সত্যজিৎ আর তার ছেলে সন্দীপ আছে। মেজোবোন পুণ্যলতার বড় মেয়ে কল্যাণী কার্লেকর, আর তার দুই ছেলে আছে। তা ছাড়া 'সন্দেশ' পত্রিকার এক সম্পাদক হল তার ছোট মেয়ে নলিনী দাশ, তার একটি ছেলে আছে।

কিন্তু এ-সব ব্যক্তিগত তথ্য থেকে ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ কথা হল, ১৯১৩ সালে প্রথম সন্দেশ প্রকাশ করে উপেন্দ্রকিশোর যে-পথ খুলে দিয়েছিলেন, সুকুমারের অনুপ্রেরণায় এবং তাঁর বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনদের যত্নে সেই পথই প্রশস্ত হয়ে এখন তোমাদের ছোটদের সাহিত্যকে এমন একটি উদার-বলিষ্ঠ, সরস-সমৃদ্ধ রূপ দিয়েছে, যার সঙ্গে পৃথিবীর যে-কোনও দেশের ছোটদের সাহিত্যের তুলনা করা যায়।

শতবর্ষের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে অসাধারণ সেই মানুষটির অসাধারণ জীবন। তাঁকে আবার নতুন করে চিনে নিচ্ছি আমরা। আর যতই চিনছি, ততই বুঝতে পারছি যে, তিনি কত বড় মাপের মানুষ ছিলেন।

ছন্দশিল্পী সুকুমার রায়

প্রবোধচন্দ্র সেন

কবি মধুসূদনেব পবে বাংলার প্রধান ছন্দশিল্পী তিনজন—রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১—১৯৪১), দ্বিজেন্দ্রলাল (১৮৬৩—১৯১৩) এবং সত্যেন্দ্রনাথ (১৮৮২—১৯২২)। এই তিন ছন্দশিল্পী কবিব পরেই উল্লেখ কবতে হয কবি সুকুমাব রায-এব (১৮৮৭—১৯২৩) নাম। ছন্দশিল্পী হিসাবে তাঁর কৃতিত্বের পরিচয প্রসঙ্গে মনে বাখতে হবে, তাঁর সাহিত্যচর্চাব কালপবিধি মাত্র আট-নয় বৎসব (১৯১৫—১৩)। তাঁব প্রতিভাবিকাশেব যথেষ্ট সুযোগ তিনি পাননি। দ্বিতীয়ত, ওই স্বল্প সময়টুকুতেও তিনি শুধু শিশুসাহিত্য রচনাতেই নিবত ছিলেন। উচ্চতর সাহিত্যসাধনার সৌভাগ্যও তাঁর হয়নি। তৃতীযত, একমাত্র 'আবোল-তাবোল' বইটিই তিনি সম্পাদন কবতে পেরেছেন। অন্য বইগুলি (কবিতা ও নাটক) পড়ে মনে হযেছে অনেকগুলি পদ্য-রচনার ছন্দেই কবির স্বহস্ত-পবিমার্জনার কিছু অভাব থেকে গেছে। তাই বর্তমান আলোচনায় প্রধানত 'আবোল-তাবোল' বইটিব ছন্দোবৈশিষ্ট্যের প্রতিই পাঠকদেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবা গেল।

কবি সুকুমার তাঁর 'খিচুড়ি' কবিতায় বলেছেন—

> হাঁস ছিল সজারু, (ব্যাকরণ মানি না),
> হয়ে গেল 'হাঁসজারু' কেমন তা জানি না।

তিনি সন্ধি-সমাসের ব্যাকরণ না মানতে পারেন। কিন্তু ছন্দের ব্যাকরণ তাঁকে পুরোপুরিই মেনে চলতে হয়েছে। ভাবের বেলায় যে আবোল-তাবোল বা খিচুড়ি পরম উপভোগ্য হয়, ছন্দের বেলায় তা হয় অসহনীয়। তাতে শিশুবুড়ো সকলেরই কানও হয় ঝালাপালা। এ কথা জানতেন বলেই কবি সুকুমার ছন্দের ব্যাকরণ মেনে চলেছেন সর্বত্র ও সযত্নে। আমি এখানে তাঁর অনুসৃত ছন্দ-ব্যাকণের পরিচয় দিতেই বসেছি, এখানে কোনো রকম আবোল-তাবোল বলা চলবে

না। তাই আশা করি নিছক আবোল-তাবোল-রসিকরা এই মুখ-বন্ধটুকু পড়েই বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করবেন।

॥ ১ ॥

কবি সুকুমার যে অল্পবয়স থেকে যথেষ্ট ছন্দ-সচেতন ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর নানা কবিতায়। সেকালের কবিরা অল্প ছন্দ-রচনা শুরু করতেন মিশ্রবৃত্ত (অক্ষরগোনা) রীতির পয়ার লিখে। রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের কবিলীলা যে পয়ার ছন্দের কবিতা লিখেই শুরু হয়েছিল তা তাঁরা নিজেরাই কবুল করে গেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ 'বারো উৎরে তেরোয় পা' দিয়েই লিখলেন—

কি দয়া পূজিব মাগো, কি আছে আমার।
জ্ঞানহীন আমি দীন সন্তান তোমার॥

এ-রকম আট-দশ লাইন। কবি সুকুমার আট বছর বয়সে এ-রকম 'পয়ার' বন্ধেই লিখেছিলেন 'নদী' নামে ষোল লাইনের একটি কবিতা। সেটি প্রকাশিত হয়েছিল সেকালের শিশুপত্রিকা 'মুকুল-এ' (১৮৯৬, জ্যৈষ্ঠ)। সেকালে পয়ার রচনার যে নিয়ম শেখানো হত তা হল প্রতি লাইনে চোদ্দ অক্ষর থাকা চাই এবং প্রতি দুই লাইনে মিল। কিন্তু শুধু এইটুকুই যে যথেষ্ট নয়, পয়ারে মাত্রাবিন্যাস এবং যতি স্থাপনের নিয়মও মানা চাই, সুকুমার তা বুঝিয়েছেন পয়ার বন্ধের একটা খোঁড়া রূপের দৃষ্টান্ত রচনা করে।

বৃক্ষ হতে দ্রাক্ষাফল ভক্ষণ করিতে
লোভী শৃগাল প্রবেশিল এক দ্রাক্ষা ক্ষেতে
কিন্তু হায় দ্রাক্ষা যে অত্যন্ত উচ্চে থাকে,
শৃগাল নাগাল পাবে কিরূপে তাহাকে।
বারম্বার চেষ্টায় হয়ে অকৃতকার্য
দ্রাক্ষা টক বলিয়া পালাল ছেড়ে রাজ্য।
—পাগলা দাশু, আশ্চর্য কবিতা (১৯১৬, জ্যৈষ্ঠ)

এই আশ্চর্য কবিতার রচয়িতা একজন কবিযশঃপ্রার্থী ছাত্র। এরকম বিকৃত ছন্দ রচনার ফলে যে বিদ্রূপাত্মক হাস্যরস উৎপন্ন হয়, তার আরও নিদর্শন আছে সুকুমারের কোনো কোনো রচনায়। তাতেই বোঝা যায়, সুকুমারের ছন্দোনৈপুণ্য শুধু জন্মলব্ধ প্রতিভার প্রেরণাজাত নয়। সে প্রতিভার সঙ্গে যুক্ত ছিল শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা-লব্ধ সুস্পষ্ট জ্ঞানের প্রক্রিয়া। সুকুমারের বিজ্ঞানশিক্ষা এ ক্ষেত্রেও নিষ্ফল হয়নি।

বাংলা ছন্দের প্রধান রীতি তিনটি, কলাবৃত্ত (moric), দলবৃত্ত (syllabic) ও মিশ্রবৃত্ত (composite)। বাংলা সাহিত্যে এককালে মিশ্রবৃত্তেরই একাধিপত্য ছিল, আধুনিক কালেও মিশ্রবৃত্তেরই প্রাধান্য। কিন্তু সুকুমারের কবিতা-গ্রন্থে মিশ্রবৃত্ত রীতির নিদর্শন দু-একটির বেশি নেই। নাটকগুলিতে খুব কমই আছে। তার কারণ মনে হয় সুকুমারের মতে মিশ্রবৃত্ত রীতির ছন্দ গুরুগম্ভীর ভাবেরই যোগ্য বাহন, তার গতিও স্বভাবত হয় মন্থর। ফলে এই রীতির ছন্দ চপল গতি ও লঘু ভাব প্রকাশের তথা শিশুমনোরঞ্জনের উপযোগী নয়। এই জন্যই 'আবোল-তাবোল', 'খাই খাই' এবং 'অন্যান্য কবিতা', এই তিনটি গ্রন্থে 'পরিবেষণ' (খাই খাই) এবং 'সম্পাদকের দশা' (অন্যান্য কবিতা), এই দুটি রচনা ছাড়া আর কোথাও মিশ্রবৃত্ত রীতির ছন্দ প্রযুক্ত হয়নি।

সুকুমার রায়ের কবিতার প্রধান অবলম্বন দলবৃত্ত ও কলাবৃত্ত রীতির ছন্দ। দলবৃত্ত নূতন নয়। তৎকালীন নবপ্রবর্তিত শিশু-সাহিত্যেও এই রীতির প্রচুর নিদর্শন ছিল। সুকুমারের আসল কৃতিত্ব দলবৃত্ত রীতির প্রবর্তনে নয়, তাঁর আসল কৃতিত্ব এ রীতিকে নূতন তালে নাচাবার ও নূতন সুরে বাজাবার কৌশলে। বাকি রইল কলাবৃত্ত রীতি। সুকুমারের প্রধান কৃতিত্ব এই রীতির প্রয়োগ। তাই কলাবৃত্ত রীতির প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা শুরু করা যাক।

॥ ২ ॥

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে কলাবৃত্ত রীতির প্রবর্তক রবীন্দ্রনাথ। তাঁর 'মানসী' কাব্যেই (১৮৮৭—৯০) এই নূতন ছন্দোরীতির আবির্ভাব। অর্থাৎ কলাবৃত্ত রীতি ও কবি সুকুমারের জন্ম হয় একই বৎসরে। বাংলা ছন্দের তিন রীতিরই প্রধান অবলম্বন ছন্দপঙ্ক্তির পর্ববিভাগ। ছন্দপর্বের রীতি ও রূপের (অর্থাৎ প্রকৃতি ও আকৃতির) পরিচয় পেলেই সমগ্র ছন্দের রীতি ও রূপের পরিচয় পাওয়া সহজ হয়। কলাবৃত্ত পর্ব গঠিত হতে পারে চার, পাঁচ, ছয় বা সাত মাত্রা নিয়ে। অর্থাৎ কলাবৃত্ত পর্বের চার রূপ। তার মধ্যে ছয় মাত্রার পর্বের প্রতিই ছিল রবীন্দ্রনাথের সর্বাধিক আকর্ষণ। পক্ষান্তরে সুকুমার সাহিত্যে ষণ্মাত্রক কলাবৃত্ত পর্বের নিদর্শন খুবই কম। তার কারণ ছয় মাত্রার কলাবৃত্ত পর্বে সুরের প্রাধান্য ঘটে, এরকম পর্ব গীতিকবিতার পক্ষে খুবই উপযোগী। রবীন্দ্রসাহিত্যে গীতিকবিতারই প্রাধান্য, তাই ছয় মাত্রার কলাবৃত্ত পর্বেরও প্রাধান্য। কিন্তু শিশু-সাহিত্যে, বিশেষত আবোল-তাবোল-জাতীয় মজার কবিতায় সুরের প্রাধান্য চলে না। রবীন্দ্ররচনায় ছয় মাত্রার পরেই পাঁচ মাত্রার স্থান। পঞ্চমাত্রক পর্বের ঝোঁকটাও সুর প্রাধান্যের দিকে। সুকুমার-সাহিত্যে পঞ্চমাত্রক পর্বের নিদর্শন একটিও নেই। রবীন্দ্র-সাহিত্যে সপ্তমাত্রক পর্বের প্রয়োগও খুব বিরল নয়। সপ্তমাত্রক পর্বের তরঙ্গিত চাল মন্থর, তাই গুরুগম্ভীর ভাবের উপযোগী। তবু অতি অপ্রত্যাশিতভাবেই সুকুমারের একটি ছোট কবিতায় সপ্তমাত্রক পর্বের নিদর্শন পাওয়া গেছে। দৃষ্টান্তটি এখানেই উদ্ধৃত করা যাক—

এ দিকে মিটিমিটি/দেখ কি চেয়ে ?
হাসি যে ফেটে পড়ে/দু গাল বেয়ে।
হাসে যে রাঙা ঠোঁট/দণ্ড মেলে,
চোখের কোণে কোণ/বিজলী খেলে।

[উদ্ধৃত কবিতাগুলিতে ব্যবহৃত/চিহ্ন পর্বভাগ নির্দেশক।]

—অন্যান্য কবিতা, বেজায় খুশি

লক্ষণীয় এ হাসি অট্টহাস্য নয়, তাতে কলরোলও নেই। তাই এই নীরব হাসির সঙ্গে সাত মাত্রার পর্ব বেশ মানিয়ে গেছে। এর প্রথম পর্ব পূর্ণ (৭ মাত্রা), দ্বিতীয় পর্ব অপূর্ণ (৫ মাত্রা)। এই দুই পর্ব নিয়ে গঠিত একটি অপূর্ণ একপদী পঙ্‌ক্তি।

॥ ৩ ॥

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় রবীন্দ্রসাহিত্যে চার মাত্রার কলাবৃত্ত পর্বের বিরলতা, আর সুকুমার সাহিত্যে তার আধিক্য। এর কারণ কি একটু ভেবে দেখা দরকার। 'মানসী' কাব্য রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ- পাঁচ, ছয় ও সাত মাত্রার কলাবৃত্ত পর্ব নিয়ে অনেক কবিতাই রচনা করেছিলেন। তখন থেকেই কলাবৃত্ত রীতির এই তিন ধারা অব্যাহত গতিতে চলে এসেছে এখন পর্যন্ত। কিন্তু 'মানস' কাব্যে চার মাত্রার কলাবৃত্ত পর্বের প্রয়োগ দেখা যায় দুটি মাত্র কবিতায়— 'নিষ্ফল-উপহার' ও 'কবির প্রতি নিবেদন'। প্রথমটি রচিত আট + ছয় মাত্রার দ্বিপদী (অর্থাৎ পয়ার) বন্ধে। আর দ্বিতীয়টির প্রতি স্তবকে আছে তিন পঙ্‌ক্তি—প্রথম দুই পঙ্‌ক্তি দশ (৪+৪+২) মাত্রার একপদী আর তৃতীয় পঙ্‌ক্তি আট+আট+দশ মাত্রার ত্রিপদী। রবীন্দ্রনাথ স্বাধীনভাবে এই ত্রিবিধ ছন্দ-পঙ্‌ক্তি রচনায় প্রবৃত্ত হননি। তিনি আসলে চেষ্টিত হয়েছিলেন মিশ্রবৃত্ত রীতির পয়ার (অপূর্ণ দ্বিপদী), একপদী ও ত্রিপদী বন্ধকে কলাবৃত্ত রূপ দিতে। কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা সফল হয়নি। অর্থাৎ মিশ্রবৃত্ত ছন্দোবন্ধের এই কলাবৃত্ত রূপ তাঁর নিজের কানকেই তৃপ্ত করতে পারেনি। ফলে কবি মিশ্রবৃত্ত রীতির চতুর্মাত্রক পর্ব নিয়ে গড়া একপদী, দ্বিপদী প্রভৃতি ছন্দোবন্ধকে কলাবৃত্ত রূপ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন বলে সিদ্ধান্ত করলেন। শুধু তাই নয় 'মানসী' কাব্যে যে একটিমাত্র কলাবৃত্ত পয়ার রচনা করেছিলেন (১৮৮৮), সেটিকেও পরবর্তী কালে মিশ্রবৃত্ত রূপ দিয়ে (১৯১৫) স্বস্তি বোধ করলেন। এ বিষয়ে কবির উক্তি (১৯৩৩) এই—"সেদিন যুক্ত-বর্ণকে পয়ারেও দিলেম দুই মাত্রার আসন। লিখলেম

নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছশীতল,
ঊর্ধ্বে পাষাণতট শ্যামশিলাতল।

অনতি কাল পরেই বোঝা গেল পয়ারের উপর এ আইন চালাবার কোনো প্রয়োজন নেই।"—আরও আশ্চর্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর একমাত্র কলাবৃত্ত পয়ারটিকেও মিশ্রবৃত্ত রীতির ছন্দোবন্ধকে কলাবৃত্ত রূপ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন বলে ঘোষণা করছিলেন, তখনও কিন্তু তার রচনায় মাঝে মাঝে চতুর্মাত্রক পর্বের কলাবৃত্ত ছন্দোবন্ধ দেখা যাচ্ছিল। যেমন—

মিলনের, পাত্রটি পূর্ণ যে, বিচ্ছেদে/বেদনায় :
অর্পিনু, হাতে তাঁর,/খেদ নাই, আর মোর খেদ নাই।
—গীতালি-১, 'দুঃখের বরষায়'

এটির রচনাকাল ১৯১৪। এটা তো নিখুঁত কলাবৃত্ত রীতির ত্রিপদী বন্ধ (৮+৮+৪ মাত্রা)। এর প্রতি পর্বে আছে চার মাত্রা। এটি আসলে পয়ার বন্ধেরই একটা বর্ধিত রূপ। পয়ারে থাকে ৮ মাত্রার একটা পূর্ণ পদ আর ৬ মাত্রার একটা অপূর্ণ পদ। আর এই ত্রিপদী বন্ধে আছে দুটি ৮ মাত্রার পূর্ণ পদ ও একটি ৪ মাত্রার অপূর্ণ পদ। এর থেকে একটি পূর্ণপদ বাদ দিলে আর-চার মাত্রার যে দ্বিপদী রূপ পাওয়া যাবে, পয়ারের সঙ্গে তার পার্থক্য শুধু দুই মাত্রার। তা ছাড়া আর কোনো পার্থক্য নেই। তবু এর পরের বছরই তিনি স্বরচিত প্রথম কলাবৃত্ত পয়ারকে মিশ্রবৃত্ত রূপ দিতে গেলেন কেন? একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, এর মূল কারণ পয়ারের পদগঠনে লঘুযতি যে প্রায়শ লুপ্ত হয়, সে বিষয়ে যথেষ্ট সচেতনতার অভাব। আট-ছয় মাত্রার দুই পদ নিয়ে গড়া পঙ্‌ক্তিরূপকেই বলা হয় 'পয়ার'—এটা হল পয়ার বন্ধের মোটা পরিচয়। আসল কথা এই যে, পয়ারের প্রথম পদে থাকে দুটি ৪ মাত্রার পূর্ণ পর্ব—প্রথম পর্বের পরে একটি লঘুযতি। আর দ্বিতীয় পদে থাকে একটি ৪ মাত্রার পূর্ণ পর্ব—প্রথম পর্বের পরে একটি লঘুযতি। আর দ্বিতীয় পদে থাকে একটি ৪ মাত্রার পূর্ণ পর্ব ও একটি

২ মাত্রার অপূর্ণ পর্ব, এই দ্বিতীয় পদেও প্রথম পূর্ণ পর্বের পরে থাকে একটি লঘুযতি। পয়ার-পঙ্‌ক্তির এই দুই লঘু যতির মধ্যে যে-কোন একটি বা দুটিই প্রায়শ লুপ্ত হয়। পয়ার-পঙ্‌ক্তির এই দুই লঘুযতি ও যতিলোপের ব্যাপারটা সেকালে কবি বা অকবি কারও চেতনাতেই ধরা পড়েনি। তারই ফলে মিশ্রবৃত্ত পয়ারের আদলে কলাবৃত্ত পয়ার রচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে ব্যর্থ হতে হয়েছিল। চার মাত্রার পর্বকে প্রাধান্য না দিয়ে লঘুযতিহীন অখণ্ড পদ রচনার প্রয়াসই তার মূল কারণ। 'নিয়ে যমুনা বহে' ইত্যাদি দুই পঙ্‌ক্তির প্রথম তিন পদেই লঘুযতি লুপ্ত। তারই ফলে এই পঙ্‌ক্তি কানকে প্রসন্ন করতে পারেনি। প্রথমেই যদি যতিলোপের বাধা থাকে না থাকত তবে চতুর্মাত্রক পর্বের পয়ার-পঙ্‌ক্তি চলতে পারত স্বচ্ছন্দ গতিতে। তার প্রমাণ আছে ওই কবিতাটিরই এই দুই পঙ্‌ক্তিতে—।

> বরষার নির্ঝরে অঙ্কিত কায়
> দুই তীরে গিরিমালা কত দূর যায়।

এই হল কলাবৃত্ত পয়ারের স্বাভাবিক চাল। 'মিলনের পাত্রটি' ইত্যাদি দৃষ্টান্তটিতেও চতুর্মাত্রক পর্বের স্বাভাবিক চাল অব্যাহত আছে। তাই শ্রুতিরুচিও পীড়িত হয় না।

আরও লক্ষণীয়, এ সময় (১৯১৪) থেকে রবীন্দ্রসাহিত্যে চতুর্মাত্রব কলাবৃত্ত পর্ব নিয়ে গড়া দ্বিপদী, ত্রিপদী প্রভৃতি পঙ্‌ক্তিরূপের কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায় বটে, তার সংখ্যা খুবই কম। আরও দেখা যায় চতুর্মাত্রক পর্বের এসব ছন্দোবন্ধের অর্থাৎ পঙ্‌ক্তিরূপের সংখ্যা কালক্রমে কিছু কিছু বেড়েছে। কবির শেষ বয়সের রচনাতে এসব অপেক্ষাকৃত বেশি। কিন্তু কলাবৃত্ত পয়ারের সংখ্যা খুবই কম। কবি সত্যেন্দ্রনাথের রচনাতেও চার মাত্রার কলাবৃত্ত পর্ব নিয়ে গড়া নানা রূপের ছন্দপঙ্‌ক্তি দেখা যায়। কিন্তু কলাবৃত্ত পয়ারবন্ধের নিদর্শন পেয়েছি বলে মনে হচ্ছে না। এইখানে সুকুমার রায়ের কৃতিত্ব। রবীন্দ্রনাথ যখন চার মাত্রার কলাবৃত্ত পর্বের পয়ারাদি ছন্দোবন্ধ রচনা

নিষ্প্রয়োজন মনে করে তাঁর একমাত্র কলাবৃত্ত পয়ার রচনাকে মিশ্রবৃত্ত রূপ দিচ্ছিলেন (১৯১৫), তার কাছাকাছি সময়েই ছন্দশিল্পী সুকুমারের রচনায় চার মাত্রার কলাবৃত্র পর্বের নানারকম খেলা দেখা যেতে লাগল। সে প্রসঙ্গ তোলার পূর্বে অন্য কয়েকটা কথা বলে রাখা দরকার।

সুকুমারের রচনায় প্রাধান্য পেয়েছে দলবৃত্ত রীতির ছন্দ। আর এ ক্ষেত্রে স্বভাবতই চতুর্মাত্রক পর্বের একাধিপত্য। দলবৃত্তের পরেই কলাবৃত্তের স্থান। আর কলাবৃত্তের এলাকাতেও চতুর্মাত্রক পর্বের স্থানই সর্বাগ্রে। চতুর্মাত্র পর্বের কলাবৃত্ত পঙ্‌ক্তিরই নিদর্শন আছে। কিন্তু দ্বিপদীর তুলনায় অন্য ত্রিবিধ পঙ্‌ক্তিরূপের প্রয়োগ বেশ কম। দলবৃত্ত রীতির ছন্দেও দ্বিপদী পঙ্‌ক্তিরই অনুরূপ প্রাধান্য। যেমন— 'আবোল-তাবোল' বইটিতে দলবৃত্ত রীতির ছন্দ আছে যথাক্রমে ত্রিশ ও কুড়িটি রচনায়। আর ওই ত্রিশটি দলবৃত্ত ছন্দোবন্ধের মধ্যে একুশটিই দ্বিপদী, তেমনি কুড়িটি কলাবৃত্ত ছন্দোবন্ধের মধ্যে ষোলটিই দ্বিপদী। আর এই উভয় রীতিতেই দ্বিপদী পঙ্‌ক্তির প্রতি পদে থাকে চার মাত্রার দুই পর্ব, আর রচনা ভেদে কোনো কোনো পঙ্‌ক্তির শেষ পর্বে দুই মাত্রা কম থাকে। এরকম অপূর্ণ দ্বিপদী পঙ্‌ক্তিরই প্রচলিত নাম 'পয়ার'। 'আবোল-তাবোল'-এর ওই ষোলটি দ্বিপদী বন্ধের মধ্যে পাঁচটিই পয়ার। চতুর্মাত্রক পর্বের এই ষোলটি কলাবৃত্ত দ্বিপদী বন্ধের রচনাকাল ১৯১৬—১৯২২। এই সময়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ ছন্দে কোনো কবিতা রচনা করেছিলেন বলে মনে হচ্ছে না। কবি সত্যেন্দ্রনাথের রচনায় এরকম কলাবৃত্ত পূর্ণ দ্বিপদী বন্ধের কিছু নিদর্শন আছে। কিন্তু তাঁর রচনাতেও কলাবৃত্ত পয়ারের সন্ধান পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। এখানেই সুকুমার রায়ের কৃতিত্ব। এ ক্ষেত্রে বোধ করি তাঁকেই অগ্রণী বলে মেনে নেওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য 'আবোল-তাবোল' প্রকাশের (১৯২৩) পরে এ ক্ষেত্রেও তাঁর অধিকার ও বৈশিষ্ট্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

॥ ৪ ॥

এবার 'আবোল-তাবোল'-এর কলাবৃত্ত দ্বিপদী বন্ধের প্রথম রচনাটি থেকে কয়েক পঙ্‌ক্তি তুলে দিচ্ছি—

হাঁস ছিল 'সজারু',/(ব্যাকরণ মানি না),
হয়ে গেল 'হাঁসজারু', কেমনে তা জানি না।
বক কহে কচ্ছপে,/'বাহবা কি ফুর্তি,
অতি খাসা আমাদের 'বকচ্ছপ' মূর্তি।'
ছাগলের পেটে ছিল না জানি কি ফন্দি,
'চাপিল বিছার ঘাড়ে' ধড়ে মুড়ো সন্ধি।
হাতিমির দশা দেখ, তিমি ভাবে জলে যাই',
হাতি বলে, 'এই বেলা জঙ্গলে চল্ ভাই।'
—আবোল-তাবোল, খিচুড়ি (১৯১৬, মাঘ),

এর প্রতি পঙক্তিতে আছে দুই পদ, প্রতি পদে দুই পব, প্রতি পর্বে ৪ মাত্রা। চাব পর্বে মোট ১৬ মাত্রা। শেষ দুই পঙ্‌ক্তিতে ১৬ মাত্রাব হিসাবে কোনো সন্দেহ নেই। কবি তার ছয় পঙ্‌ক্তির শেষ পর্বে মনে হয় এক মাত্রা কম আছে। আসলে সে এক মাত্রা ভাষায় প্রকাশিত না হলেও আমাদের উচ্চারণের টানে সেটুকু স্বতই পূর্ণ হয়ে যায। এরকম মাত্রাকে বলা যায় 'অব্যক্ত মাত্রা'। এই দৃষ্টান্তের প্রথম ছয় পঙ্‌ক্তির অন্তে একটি করে অব্যক্ত মাত্রা আছে। পঙ্‌ক্তির অন্তে এরকম অব্যক্ত মাত্রা রাখার নীতি সংস্কৃত ছন্দেও স্বীকৃত ছিল। প্রসঙ্গত বলে বাখি এরকম ষোল মাত্রার কলাবৃত্ত দ্বিপদী বন্ধ আসলে সংস্কৃত 'পজ্‌ঝটিকা' ছন্দেরই বাংলা প্রতিরূপ। যা হোক, শুধু পঙ্‌ক্তির অন্তে নয়, প্রয়োজনমতো পদের অন্তেও অব্যক্ত মাত্রা রাখা চলে। এই দৃষ্টান্ত 'সজারু' শব্দের পরে একটি অব্যক্ত মাত্রা গণনীয়। এরকম দৃষ্টান্ত খুব বিরল নয়।

পূর্বেই বলেছি চতুর্মাত্রক পর্বের ছন্দে পর্বের পরবর্তী লঘুযতি অবস্থাবিশেষে লুপ্ত হয়ে থাকে। লঘুযতি লুপ্ত হলে আট মাত্রার পদ তিন-তিন-দুই মাত্রার তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এরকম

লঘুযতিলোপ সবচেয়ে বেশি দেখা যায় মিশ্রবৃত্ত রীতির ছন্দে। কলাবৃত্ত রীতির ছন্দে লঘুযতিলোপের নিদর্শন অনেক কম। উপরের দৃষ্টান্তে শুধু একটি পদে ('চাপিল বিছার ঘাড়ে') লঘুযতি লুপ্ত হয়েছে। বস্তুত সুকুমারের রচনায় যতিলোপহীন চতুর্মাত্রক পর্বেরই প্রাধান্য। তারই ফলে তাঁর রচনায় দেখা দিয়েছে ছন্দের গতিচাঞ্চল্য ও নৃত্যপরায়ণতা। কলাবৃত্ত রীতির হিসাবে 'বকচ্ছপ' পর্বে পাঁচ মাত্রা গণনীয়। কিন্তু ছন্দের গতিবেগে ওই শব্দটি আমাদের উচ্চারণে স্বতই একটু সংকুচিত হয়ে পূর্বগামী চতুর্মাত্রক পর্বের সমতা লাভ করে। এরকম ধ্বনিসংকোচ সাধারণ নীতির ব্যতিক্রম হলেও একেবারে দুর্লভ নয়।

এবার চতুর্মাত্রক পর্বের আর-এক দ্বিপদী বন্ধের প্রসঙ্গ—।

আয় তোর মুণ্ডুটা দেখি./আয় দেখি 'ফুটোস্কোপ' দিয়ে,
দেখি কত ভেজালের মেকি/আছে তোর মগজের ঘিয়ে।··
কাৎ হয়ে কান ধরে দাঁড়া,/জিভখানা উলটিয়ে দেখা,
ভালো করে বুঝে শুনে দেখি/বিজ্ঞানে যে-রকম লেখা।

—আবোল-তাবোল, বিজ্ঞানশিক্ষা (১৯১৯, আশ্বিন)

এর প্রতি পদে আছে যথাক্রমে চার-চার-দুই মাত্রার তিন পর্ব। কেবল 'ফুটোস্কোপ' শব্দটি পূর্বোক্ত 'বকচ্ছপ' শব্দের মতোই একটু সংকুচিত হয়ে চার মাত্রায় পরিণত হয়। এরকম দ্বিপদী বন্ধের নিদর্শন রবীন্দ্রসাহিত্যেও আছে। যেমন—

সুন্দরী ওগো শুকতারা,/রাত্রি না যেতে এসো তূর্ণ।
স্বপ্নে যে-বাণী হল হারা/জাগরণে করো তারে পূর্ণ।

মহুয়া, শুকতারা (১৮২৮, জুন)

রবীন্দ্রনাথের রচনায় এরকম ছন্দোবন্ধ আরও আছে, তবে খুবই কম। কিন্তু কোনো বিচারেই সুকুমারকে এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অনুবর্তী বলে মনে করা যায় না। এ ক্ষেত্রেও সুকুমারের স্বকীয়তা সন্দেহাতীত।

॥ ৫ ॥

এবার যাই মিল-প্রসঙ্গে। পূর্বেই বলেছি 'আবোল-তাবোল' বই-এর যোলটি কলাবৃত্ত দ্বিপদী বন্ধের মধ্যে পাঁচটিই পয়ার। কিন্তু কলাবৃত্ত রীতিতে পয়ার বন্ধ রচনাই সুকুমারের আসল কৃতিত্ব নয়। তাঁর আসল কৃতিত্ব এই পয়ারের মিল ব্যবস্থায় নূতনত্ব সঞ্চারে। যেমন—

ডাকে যদি ফিরিওলা, হাঁকে যদি গাড়ি,
খসে পড়ে কড়িকাঠ, ধসে পড়ে বাড়ি।
ছাদগুলো ঝুলে পড়ে বাদলায় ভিজে,
একা বুড়ী কাঠি গুঁজে ঠেকা দেয় নিজে।
মেরামত দিনরাত কেরামত ভারি,
থুরথুরে বুড়ী তার ঝুরঝুরে বাড়ী।

—আবোল-তাবোল, বুড়ীর বাড়ি (১৩১৮, পৌষ)

এই রচনাটির প্রতি দুই পঙ্‌ক্তির অন্তে যে মিল প্রত্যাশিত তা তো আছেই। অধিকন্তু, এটির প্রতি পঙ্‌ক্তিতে দুই পদের আদিতে যে অপ্রত্যাশিত মিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেইটুকুই এর বিশেষ সম্পদ। তাতেই ছেলে-বুড়ো সকলেরই কান একটা নূতন ধ্বনিরসের স্বাদ পায়। এর আসল কারণ এই,—বাংলা ছন্দে প্রতি পর্বের প্রথমেই একটা ঝোঁকের ঘা পড়ে। এই ঝোঁকেরও কিছু তারতম্য থাকে। এই ঝোঁকের আঘাতেই ছন্দের ধ্বনিপ্রবাহে দেখা দেয় তরঙ্গিত গতিভঙ্গি। আর পর্বের প্রথমেই যদি একটা রুদ্ধদল থাকে তবে পর্বতরঙ্গ অনুভূত হয় প্রকটতর রূপে। রবীন্দ্রনাথ অনেক সময় এই কৌশলেই ছন্দকে তালে তালে নাচাতেন। যেমন—

আজি নির্মলকায় শান্ত উষায় নির্জন নদীতীরে।

কিংবা

নির্জন পথে জ্যোৎস্না-আলোতে সন্ন্যাসী একা যাত্রী।

সুকুমার তা না করে পদের (এবং কখনও কখনও পর্বের) আদিতে বসাতেন মিলের মন্দিরা। এই কৌশলে তিনি ছন্দকে

সাজিয়েছেন নানা ভাবে। তারই প্রথম নিদর্শন পেলাম 'বুড়ীর বাড়ি' রচনাটিতে। এরকম পদাদ্য মিলের আর-একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

চট করে মনে পড়ে/মটকার কাছে
মালপোয়া আধখানা/কাল থেকে আছে।
ছুড় ছুড় ছুটে যাই, দূর থেকে দেখি
প্রাণপণে ঠোঁট চাটে কানকাটা নেকী।
গালফোলা মুখে তায় মালপোয়া ঠাসা,
ধুক্ করে নিভে গেল বুকভরা আশা।

—আবোল-তাবোল, ছলোর গান (১৯১৯, শ্রাবণ)

এসব রচনা পড়তে পড়তে মনে হয় সুকুমার যেন ছন্দের পায়ে নূপুর পরিয়ে ও তার দুই হাতে মন্দিরা ধরিয়ে দিয়ে তাকে যেমন তালে তালে নাচিয়েছেন, তেমনি নানা সুরে ঝংকৃতও করেছেন। লক্ষণীয় এসব রচনায় লঘুযতিলোপ সযত্নে বর্জিত হয়েছে। কেননা তাতে ছন্দের তালভঙ্গ হয়। এরকম আর-একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি 'হ য ব র ল' থেকে—

খুসখুসে কাশি/ঘুষঘুষে জ্বর,
ফুসফুসে ছ্যাঁদা/বুড়ো তুই মর।
মাজ্‌রাতে ব্যথা/পাঁজ্‌রাতে বাত,
আজ রাতে বুড়ো/হবি কুপোকাৎ।

এই পঙ্‌ক্তি একপদী। প্রতি পদে দুই পর্ব। এর মিলগুলি পর্বদ্য, পদাদ্য নয়। মিলের অবস্থান সুস্পষ্ট। ব্যাখ্যা নিস্প্রয়োজন। এবার দিচ্ছি একটা পর্বান্ত্য মিলের দৃষ্টান্ত।—

আয় খ্যাপামন ঘুচিয়ে বাঁধন জাগিয়ে নাচন তা ধিন্ ধিন্,
আয় বেয়াড়া সৃষ্টিছাড়া নিয়মহারা হিসাব্‌হীন।
আজগুবি চাল বেঠিক বেতাল মাত্‌বি মাতাল রঙ্গেতে,
আয় রে তবে ভুলের ভবে অসম্ভবের ছন্দেতে।

—আবোল-তাবোল, প্রবেশক

প্রথমেই বলে রাখি 'অসম্ভবের' শব্দটিতে মিলের একটু খুঁত উপেক্ষণীয়। রবীন্দ্ররচনাতেও এরকম খুঁত পাওয়া যায়।

বলা বাহুল্য এটি দলবৃত্ত রীতির দ্বিপদ বন্ধ, কলাবৃত্ত রীতির নয়। এখানে আমাদের বিবেচ্য বিষয় মিল। এই রচনাটির প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিতেই আছে তিনটি করে পর্বান্ত্য মিল। তা ছাড়া পঙ্‌ক্তিপ্রান্ত্য মিল তো আছেই। কবি ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় পর্বাদ্য, পদাদ্যও পর্বাদ্য মিলের নিদর্শন আছে প্রচুর। কিন্তু তাঁর কিংবা আর কারও রচনায় এ জাতীয় মিলের ধারাবাহিক প্রয়োগ দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না। রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো রচনায় প্রথম দুই পর্বের অন্তে ধারাবাহিক মিল দেখা যায়। কিন্তু প্রতি পঙ্‌ক্তিতে তিনটি করে পর্বান্ত্য মিলের নিদর্শন তাঁর রচনাতেও পাইনি। বস্তুত উল্লিখিত তিন বকম মিলের খেলায় সুকুমাবেব জুড়ি নেই।

ববীন্দ্রছন্দেব অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য তার সুরপরায়ণতা (melody) আব সুকুমার-রচিত ছন্দেব প্রধান বৈশিষ্ট্য তার তালপরায়ণতা (rhythm) এবং বিচিত্র বকমের মিল (rhyme)। অনেক সময় তাঁর মিলেও তাল থাকে। এরকম মিলকে বলা যায় 'স্পন্দিত মিল' (rhythmic rhyme)। উপরের দৃষ্টান্তে যে-দুটি পঙ্‌ক্তিপ্রান্ত্য মিল আছে, সে-দুটিই তিন দলের মিল। কিন্তু এই দুই মিলের তাল একরকম নয়। 'তা ধিন্ ধিন্-হিসাবহীন' আদিলঘু ত্রিদল মিল, আর 'রঙ্গেতে-ছন্দেতে' আদিগুরু ত্রিদল মিল। একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, এই দুই জোড়া শব্দমিলের চেয়ে তালেরই, অর্থাৎ rhyme-এর চেয়ে rhythm-এরই প্রাধান্য, আর তাতেই আমাদের শ্রুতিরুচি বেশি তৃপ্ত হয়। এই তালের প্রসঙ্গটা পরে আবার উত্থাপন করা যাবে।

॥ ৬ ॥

সুকুমারের শুধু ছন্দোরীতি নয়, তাঁর ছন্দোরূপ রচনাতেও যথেষ্ট দক্ষতা ও স্বাতন্ত্র্যের ছাপ আছে। এখানে তারও সংক্ষিপ্ত পরিচয়

দেওয়া দরকার। একটা একপদী পঙ্‌ক্তির দৃষ্টান্ত দিচ্ছি তাঁর 'একুশে আইন' রচনাটি থেকে।—

যেসব লোকে পদ্য লেখে
তাদের ধরে খাঁচায় রেখে
কানের কাছে নানান সুরে,
নামতা শোনায় এক শো উড়ে,
সামনে রেখে মুদীর খাতা
হিসেব কষায় একুশ পাতা।

এরকম ছয়-ছয়টি একপদী পঙ্‌ক্তিকে একত্র সমন্বিত করা কম দক্ষতার পরিচায়ক নয়। অনুরূপ দৃষ্টান্ত আর কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না।

রামগরুড়ের ছানা
হাসতে তাদের মানা,
হাসির কথা শুনলে বলে "হাসব না-না, না-না।"

এর প্রথমেই আছে চার-দুই মাত্রার দুটি অপূর্ণ একপদী পঙ্‌ক্তি। আর তার পরে আছে চার-চার মাত্রার একটি পূর্ণ পদ ও চার-দুই মাত্রার একটি অপূর্ণ পদ নিয়ে গড়া একটি অপূর্ণ দ্বিপদী পঙ্‌ক্তি। এ-রকম পঙ্‌ক্তি-সমাবেশও সুলভ নয়। উপরের দুটি দৃষ্টান্তই দলবৃত্ত রীতিতে রচিত। এবার দিচ্ছি কলাবৃত্ত রীতির দৃষ্টান্ত—

হুঁকোমুখো হেঁকে কয়   আরে দূর, তা তো নয়
দেখ্‌ছ না কি রকম চিন্তা ?
মাছি-মারা ফন্দি এ   যত ভাবি মন দিয়ে,
ভেবে ভেবে কেটে যায় দিনটা।

—হুঁকোমুখো হ্যাংলা (১৯১৭, চৈত্র)

এটা হচ্ছে ৮+৮+১২ মাত্রার কলাবৃত্ত ত্রিপদী বন্ধ। ভাবতে বিস্ময় লাগে, এটা হচ্ছে মূলত

'পততি পতত্রে বিচলতিপত্রে শঙ্কিত ভবদুপযানম্‌'

ইত্যাদি ৮+৮+১২ মাত্রার জয়দেবী ত্রিপদীর বাংলা প্রতিরূপ। রবীন্দ্ররচনাতেও এর প্রতিরূপ পাওয়া যায়। কিন্তু খুব কম। যেমন—

পল্লীর পথে মেয়ে ঘাট থেকে আসে নেয়ে,
ভিজে চুল লুণ্ঠিত পিঠে।
উত্তর বায়ুভরে বক্ষে কাঁপন ধরে,
রোদ্দুর লাগে তাই মিঠে।

—চিত্র-বিচিত্র, শীত

এটার তৃতীয় পদে দুই মাত্রা কম আছে। উক্ত জয়দেবী ত্রিপদীর পূর্ণ প্রতিরূপও আছে রবীন্দ্ররচনায়।

এস পুঁথি পরিচা-রক তদ্ধিতকা-রক
তা-রক তুমি কাণ্ডা-রী,
এস গণিতধুরন্ধর কাব্যপুরন্দর,
ভূ-বিবরণ ভাণ্ডা-রী।

—প্রহাসিনী (সংযোজন), সুসীম চা-চক্র (১৯২৪ শ্রাবণ)

এটা অবশ্য আধা-প্রত্ন পদ্ধতিতে রচিত। তাই চা, কা, তা, ডা, ডা এবং ভূ এই ছয়টি দীর্ঘস্বরান্ত মুক্তদল দ্বিমাত্রক রূপে উচ্চারিত হয়। আর পঙ্‌ক্তির অন্তিম দল তো আমাদের উচ্চারণে স্বতঃই দীর্ঘতা লাভ করে।

সুকুমারের রচনায় এই জয়দেবী ত্রিপদীর চেয়ে দীর্ঘ রূপেরও নিদর্শন আছে।

কহ ভাই কহ রে— অ্যাঁকাচোরা শহরে—
বদ্যিরা কেন কেউ আলুভাতে খায় না।
লেখা আছে কাগজে— আলু খেলে মগজে—
ঘিলু যায় ভেস্তিয়ে বুদ্ধি গজায় না।

আবোল-তাবোল, আহ্লাদী (পাদপূরক)

এই দৃষ্টান্তের প্রতি পঙ্‌ক্তিতে আছে আট মাত্রার চার পদ। প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ পদের অন্তে আছে একটি করে অব্যক্ত মাত্রা।

অর্থাৎ এই দুই পঙ্‌ক্তিই চৌপদী। পূর্বোক্ত জয়দেবী ত্রিপদী পঙ্‌ক্তির তৃতীয় পদে আছে আট+চার মাত্রা। তাই ত্রিপদী পঙ্‌ক্তিকে অপূর্ণ চৌপদী বলেও মনে করা যায়। ওই অপূর্ণ চৌপদীর অন্তে আর চার যোগ করলেই তা হবে পূর্ণ চৌপদী। তারই নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে উদ্ধৃত দৃষ্টান্তটিতে।

এ-রকম চৌপদীর নিদর্শন রবীন্দ্ররচনাতেও পাওয়া যায়—

১। ওগো বধূ সুন্দরী, তুমি মধু-মঞ্জরী,
পুলকিত চম্পার লহ অভিনন্দন।
পর্ণের পাত্রে— ফাল্গুন রাত্রে
মুকুলিত মল্লিকা— মাল্যের বন্ধন।

গীতবিতান (বসন্ত), 'ওগো বধূ' (১৯২৪, মার্চ)

২। লিখেছিনু কবিতা সুরে তালে শোভিতা
এই দেশ সেরা দেশ বাঁচতে ও মরতে—,
ভেবেছিনু তখুনি— এ কি মিছে বকুনি—,
আজ তার মর্মটা পেরেছি যে ধরতে—

প্রহাসিনী, ভাই-দ্বিতীয়া (১৯৩৬ ভাই দ্বিতীয়া)

এই দু-রকম উচ্চাঙ্গের ছন্দকে সুকুমার কেমন অনায়াসে ও লঘু চালে আট পৌরে ভাষায় রূপান্তরিত করেছেন, সেটুকুই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এখানেই তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব। সেকালে কেউ ভাবতেও পারত না, তাঁর এসব হালকা রচনার মূলে কত দীর্ঘকালের ঐতিহ্য প্রচ্ছন্ন আছে।

এবার সুকুমারের রচনা থেকে একটা কলাবৃত্ত মহাচৌপদী বন্ধের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

আজি কি উদিল রবি পশ্চিম গগনে—
জাগিল জগৎ আজি' না জানি কি লগনে,
'স্বা-গত' সংগীত গুঞ্জন পবনে—
কর অভিনন্দন/কর অভিনন্দন।

আলা-ভোলা বাবাজীর চেলা আমি শিষ্য—
সৌম্য মুরতি তব অতি সুখদৃশ্য—
মজিয়া হরষরসে আজি গাহে বিশ্ব—,
কর অভিনন্দন, কর অভিনন্দন

চলচিত্ত চঞ্চরী, প্রথম দৃশ্য

এখানে কেবল 'স্বাগত' শব্দের 'স্বা' দলটি প্রত্ন প্রণালীতে দ্বিমাত্রক রূপে উচ্চার্য। সাধরণ চৌপদী বন্ধের প্রতি পদে থাকে মাত্রা। আর এটির প্রতি পদে আছে ষোল মাত্রা। তাই এ রকম চৌপদী বন্ধকে বলি 'মহাচৌপদী' এই ছন্দোবন্ধও প্রাচীন। বৈষ্ণব ব্রজবুলি পদাবলীতে তার নিদর্শন আছে। রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহের পদাবলী'তেও আছে, তাঁর পরবর্তী কালের রচনাতেও আছে। তবে খুব কম। এ-রকম একটা ভারী গুরুগম্ভীর ছন্দোবন্ধকে সুকুমার একটা অনুষ্ঠানের লঘুতা প্রকাশের কাজে লাগিয়েছেন। এই অভাবনীয়তটা বিশেষ উপভোগ্য।

অন্যত্র এই অভাবনীয়তার রস প্রকাশিত হয়েছে বাংলার একটা সংস্কৃত ছন্দ প্রয়োগের দ্বারা—

ত্রিজগৎ যজ্ঞে শাশ্বত স্বাহা—
নন্দিত কলকল ক্রন্দিত হাহা।
স্তম্ভিত সুখদুখ মন্থন মোহে
প্রলয় বিলোড়ন লটপট লোহে।
মৃত্যু ভয়াবহ হম্বা হম্বা,
রৌরব-তরণী তুহুঁ জগদম্বা।

চলচিত্র-চঞ্চরি, তৃতীয় দৃশ্য

এই গো-প্রশস্তিটুকু রচিত হয়েছে বিশুদ্ধ সংস্কৃত ছন্দে। তাই দীর্ঘস্বরগুলো দীর্ঘ (অর্থাৎ দ্বিমাত্রক) রূপেই উচ্চার্য। আর তাতেই উছলে ওঠে এর হাস্যরস। এর প্রতি পঙ্‌ক্তিতে আছে ষোল মাত্রা। সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রে এর নাম 'পজ্ঝটিকা'। এর প্রতি পুর্বে আছ চার কলামাত্রা। দুই পর্বে এক পদ। প্রতি পঙ্‌ক্তিতে দুই

পদ। অর্থাৎ এর পঙ্‌ক্তিগুলি দ্বিপদী। তাই বাংলা পরিভাষায় এই ছন্দোবন্ধকে বলা যায় 'কলাবৃত্ত দ্বিপদী'। এই দ্বিপদী বন্ধ যে সংস্কৃত 'পজ্‌ঝটিকা'র বাংলা প্রতিরূপ, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। এবাব সংস্কৃত 'তোটক' ছন্দের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি সুকুমারের রচনা থেকে—

কত সিন্ধু তরঙ্গিত ছন্দভরে,
কত স্তব্ধ হিমাচল ধ্যান করে।
কত সৌরভ সঞ্চিত পুষ্পদলে,
কত সূর্য বিলুণ্ঠিত পাদতলে,
কত বন্ধন ঝংকৃত ভক্তচিত—
নমি বিশ্ববরাভয় মৃত্যুজিতে।

অন্যান্য কবিতা, বন্দনা

এটা হালকা মেজাজের লেখা নয়। সংস্কৃত সাহিত্যেও এই তোটক ছন্দ সাধারণত প্রযুক্ত হয় দেবতার স্তোত্র-রচনায়। এখানেও তাই হয়েছে। তোটক ছন্দেও পজ্‌ঝটিকার মতো প্রতি পঙ্‌ক্তিতে থাকে যোল মাত্রা। পার্থক্য শুধু এই যে, পজ্‌ঝটিকায় লঘু-গুরুভেদে দলবিন্যাসের কোন বিধিনিষেধ নেই। কিন্তু তোটকের বারোটি দল ও লঘু-লঘু-গুরু ক্রমে চার ভাগে বিন্যস্ত থাকে। তাতেই যোল মাত্রা হয়। এর সঙ্গে তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের

শুভ কর্মপথে ধর নির্ভয় গান,
সব দুর্বল সংশয় হোক অবসান।

কিংবা

মধুগন্ধে ভরা মৃদু স্নিগ্ধ ছায়া নীপ-কুঞ্জতলে
শ্যাম কান্তিময়ী কোন্ স্বপ্নমায়া ফিরে বৃষ্টিজলে।

ইত্যাদি গীতিরচনার ছন্দ। রবীন্দ্ররচনায় দীর্ঘস্বরের দীর্ঘতা সর্বত্র সমানভাবে রক্ষিত হয়নি। কিন্তু তোটকীয় গতিভঙ্গি বা তাল অটুট আছে।

দেখা গেল সুকুমারের ছন্দজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পরিধি যেমন সংকীর্ণ নয়, তেমনি তাঁর ছন্দ-রচনার রূপবৈচিত্র্যও কম নয়।

॥ ৭ ॥

অতঃপর বাংলা ছন্দ-রচনায় সুকুমারের একটা বিশেষ স্বাতন্ত্র্যের কথা বলেই এই আলোচনা শেষ করব। পূর্বে বলেছি সুকুমার-রচিত ছন্দের একটা বড় গুণ তার মিল ও তালের (rhyme ও rhythim) সমন্বয়। কিন্তু এমনও অনেক সময় দেখা যায় যে, তালের প্রভাব মিলের ধ্বনিসাম্যগত ত্রুটিকেও অনায়াসে প্রচ্ছন্ন করে রাখছে। অর্থাৎ মিল রচনায় ত্রুটি থাকলেও তালের প্রভাবে তা কানে ধরা পড়ে না। তাই স্বীকার করতে হয় সুকুমারের রচনায় মিলের তুলনায় তালেরই গুরুত্ব বেশি। শুধু তাই নয়, একটু সতর্কভাবে কান পেতে শুনলেই বোঝা যাবে, সুকুমারের রচনায় মাত্রাবিন্যাসের চেয়েও তার স্পন্দক্রমেরই (মানে তালেরই) গুরুত্ব বেশি। ফলে সুকুমারের কোন-কোন রচনায় ছন্দপর্বে মাত্রাবিন্যাসের ত্রুটিও স্পন্দক্রমের গুণে ধরা পড়ে না। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক—

১। লাথি চারাচর খেয়ে মার্জার ছোটে যার যার ঘরে,
মহা উৎপাত করে হুটপাট্ চলে ফুটপাথ প'রে।
ঝাড়ুবর্দার হারু সর্দার ফেরে ঘরদ্বার ঝেড়ে,
তারি বাল্‌তি এ, দেখে ফাল্ দিয়ে আসে পালটিয়ে তেড়ে।
পায়ে কাল্‌সিটে? কেন বাল্‌তিতে মেরে চাল দিতে গেলে?
বুঝি ঠ্যাং যায়, খোঁড়া ল্যাংচায় দেখে ভ্যাংচায় ছেলে।

খাই খাই, তেজিয়ান (১৯১৮, কার্তিক)

এটিতে পূর্ণ পর্বের দলসংখ্যাগত সমতা নেই, কিন্তু কলাসংখ্যার সমতা আছে। এর পূর্ণ পর্বের দলসংখ্যা কোথাও চার, কোথাও পাঁচ। কিন্তু পূর্ণ পর্বের কলাসংখ্যা সর্বত্রই ছয়। সুতরাং মানতে হবে এটির রচনারীতি কলাবৃত্ত। কিন্তু এটুকুই কি এ ছন্দের আসল পরিচয়? কান বলে প্রতি পর্বের কলাগত সমতা হচ্ছে এর সাধারণ পরিচয়, কিন্তু এর বিশেষ পরিচয় হল প্রতি পর্বের স্পন্দক্রম। প্রতি পর্বের আছে দুটি মুক্তদলে দুই মাত্রা। তার পরে একটি রুদ্ধদল। এটির উপরেই প্রস্বরের ঘা বা উচ্চারণের ঝোঁক। তার পরে একটি

রুদ্ধ দলে বা দুটি মুক্ত দলে দুই মাত্রা। এই রচনাটির পর্বগত স্পন্দ-ক্রমের (rhythm-এর) সাংকেতিক পরিচয় ⏑⏑—।⏑⏑। অর্থাৎ প্রতি পর্বে ধ্বনির ঢেউ দুই মাত্রায় উপরে উঠে উচ্চতম সীমায় পৌঁছয় তৃতীয় দলে, তার পরে আবার নেমেও যায় দুই মাত্রায়। দেখা গেল এই রচনাটিতে ছন্দপর্বের মাত্রা সমতার চেয়ে তার স্পন্দ-ক্রমেই মূল্য বেশি।

এর সঙ্গে তুলনীয় 'হ য ব র ল' বই-এর পূর্বোদ্ধৃত 'খুসখুসে কাশি' ইত্যাদি রচনাটির স্পন্দক্রম। এই রচনাটির মিলস্থাপনের যেমন বৈশিষ্ট্য আছে, তেমনি তার স্পন্দক্রমেরও বৈশিষ্ট্য আছে। 'তেজিয়ান' রচনাটির তুলনায় তার স্পন্দক্রম-বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা কঠিন হবে না। তাই কোনো ব্যাখ্যা না দিয়ে এখানে শুধু তার সাংকেতিক পরিচয়টুকু দেওয়া গেল। ওই রচনাটির প্রথম দুই পর্বের স্পন্দক্রম এই,—⏑⏑, ⏑⏑ | —⏑⏑, —।

এবার আর-একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

২। কেন সব কুকুরগুলো/খমোখা চ্যাঁচায় রাতে?
কেন বল্ দাঁতের পোকা/থাকে না ফোক্লা দাঁতে?
পৃথিবীর চ্যাপ্টা মাথা/কেন সে কাদের দোষে?—
এসো ভাই চিন্তা করি দু জনে ছায়ায় বসে।

নন্দগুপি, অনুসঙ্গ (১৯১৫, কার্তিক)

এর পঙ্‌ক্তিগুলি একপদী। প্রতি পদে দুই পর্ব। প্রতি পর্বে যথাক্রমে তিন-দুই-দুই দলমাত্রার তিন উপপর্ব। একটু হল এই ছন্দোবন্ধের সাধারণ পরিচয়। অনুরূপ দৃষ্টান্ত রবীন্দ্ররচনাতেও আছে—

৩। ভরা থাক স্মৃতিসুধায় বিদায়ের পাত্রখানি,
মিলনের উৎসবে তায় ফিরায়ে দিয়ো আনি।

গীতবিতান (প্রেম), 'ভরা থাক স্মৃতি সুধায়' (১৯২৩)

গানের পরিভাষায় এ-রকম তালকে বলা যায় 'তেওরা তাল'। এই তালের একটা বিশেষ রকম দোলা আছে। এর প্রথম তিন মাত্রা

চলে সমতল গতিতে, তার পরেই ওঠে চার মাত্রার একটা বড় ঢেউ। কারণ আবৃত্তিকালে প্রথম তিন মাত্রার উপরে প্রস্বরের আঘাত পড়ে না, সে আঘাতটা পড়ে পরবর্তী অংশের প্রথম দলের উপরে। তাব পরের তিন মাত্রাও সমতল বলেই গণ্য। এই স্পন্দক্রমের সাংকেতিক রূপ এই ⌣ ⌣ ⌣-⌣⌣⌣। এখানে বলা উচিত যে, কলাবৃত্ত রীতির ছন্দে ধ্বনিব ওঠাপড়া নির্ভর করে রুদ্ধমুক্ত ভেদে দলের প্রসার-অপ্রসারের উপরে। দলবৃত্ত রীতির ছন্দে রুদ্ধদলেব ধ্বনিভর বেশি হলেও তার প্রসার থাকে না। ওই ধ্বনিভরের দ্বারা দলবৃত্তের গতি-প্রকৃতিও অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু তার ওঠাপড়া তার উপরে নির্ভর করে না, নির্ভর করে ছন্দে শব্দসমাবেশের কাযদা ও তাব উচ্চারণের উপরে। এবার সে প্রসঙ্গেই আসা যাক।

একটু মন দিয়ে শুনলেই বোঝা যাবে, উপরের তিন দৃষ্টান্তেই প্রতি পর্বে আছে দুটি বিভাগ, প্রথম বিভাগটি একটু ছোট এবং হালকা, দ্বিতীয় বিভাগটি তার চেয়ে বড় এবং ভারী। তাই আমাদের মুখেও প্রথম বিভাগটি উচ্চারিত হয় বেশ মৃদুভাবে প্রায় অতিপর্বের মতো। দ্বিতীয় বিভাগের উচ্চারণ অপেক্ষাকৃত আয়াসসাধ্য, তাই তার ঝোঁকটা একটু প্রবলভাবেই পড়ে ওই বিভাগের প্রথম দলের উপরে। তাতে প্রতি পর্বের দুই বিভাগে দেখা দেয় নামাওঠার একটা বড় ঢেউ। ছন্দের পরিভাষায় এই বড় ঢেউকে যদি বলি 'স্পন্দ', তবে রুদ্ধমুক্ত বা গুরুলঘুভেদে বলবিন্যাসজাত ছোট-ছোট ঢেউকে বলতে পারি 'উপস্পন্দ'। সুকুমারের রচনায় ছোট বড় দু-রকম স্পন্দের খেলাই দেখা যায়। তিনি তাঁর কোনো-কোনো রচনায় এই বড় ঢেউকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এমন কি প্রয়োজন-বোধে মাত্রাবিন্যাসের নিয়ম লঙ্ঘন করেও পর্বতরঙ্গের মর্যাদা রক্ষা করেছেন। যেমন—

ও পাড়ার, নন্দ গোঁসাই/আমাদের নন্দ খুড়ো,
স্বভাববেতে, সরল সোজা/অমায়িক, শান্ত বুড়ো।

ছিল না তার, অসুখ-বিসুখ/ছিল সে যে, মনের সুখে,
দেখা যেত, সদাই তারে/হুঁকোহাতে, হাস্যমুখে।

আবোল-তাবোল, হাত গণনা (১৯১৮, শ্রাবণ)

এটির প্রতি পঙ্‌ক্তিতে আছে দুই পদ। প্রতি পদে দুই পর্ব। কিন্তু কলাবৃত্ত বা দলবৃত্ত কোনো রীতির হিসাবেই এটির রচনাপ্রণালীর হদিস পাওয়া যায় না। কেন না, এই রচনাটির প্রতি পর্বে মাত্রা-সংখ্যার সমতা রাখা হয়নি। কবির মনে সে ইচ্ছাও ছিল না। তাঁর শুধ লক্ষ্য ছিল প্রতি পদের দুই বিভাগে ধ্বনির নামাওঠা ভঙ্গি বা তাল যেন ঠিক থাকে। এই নামাওঠার তালটুকুই এই রচনাটিব একমাত্র অবলম্বন। এই রচনাটির প্রথম দুই পঙ্‌ক্তি পড়লেই আমাদের কান ও মন এই তালে বাঁধা হয়ে যায়। ফলে কণ্ঠও সে-তালেই চলতে থাকে রচনাটির শেষ পর্যন্ত। ছন্দশাস্ত্রের আইন-কানুন না-মানা এই যে তালসর্বস্ব ছন্দোরীতি তাকেই বলা যায় স্বৈরবৃত্ত। এ-রকম স্বৈরবৃত্ত রীতির ছন্দকে ইংরেজিতে বলা যায় free verse। এটির রীতি স্বৈরবৃত্ত বটে, কিন্তু এটি রচিত হয়েছে আট+আট মাত্রাব দলবৃত্ত দ্বিপদী বন্ধের আদলে। এবার দিচ্ছি স্বৈরবৃত্ত রীতিব একটা চৌপদী বন্ধের দৃষ্টান্ত—

রোদে রাঙা ইঁটের পাঁজা
তার উপরে বস্‌ল রাজা,
ঠোঙাভরা বাদাম ভাজা
খাচ্ছে কিন্তু গিল্‌ছে না।
গায়ে আঁটা গরম জামা
পুড়ে পিঠ হচ্ছে ঝামা,
রাজা বলে "বৃষ্টি নামা,
নইলে কিচ্ছু মিলছে না।"

আবোল-তাবোল "নেড়া বেলতলায়" (১৯১৮ অগ্রহায়ণ)

এটি রচিত হয়েছে ৮+৩+৭ মাত্রার দলবৃত্ত চৌপদী বন্ধের আদলে। এটির প্রথম তিন পদের প্রথম পর্ব উচ্চারিত হয়, বেশ

হালকাভাবে প্রায় অতিপর্বের মতো, অর্থাৎ এটির প্রথমে দলের উপরে উচ্চারণের ঝোঁক পড়ে না। তাছাড়া এই পর্বে থাকে চারটি মুক্তদল, না হয় দুটি মুক্ত ও একটি রুদ্ধদল। ফলে এই পর্বের ধ্বনিভরও হয় খুব কম। লক্ষণীয় 'তার উপরে' পর্বটা উচ্চারিত হয় 'তারুপরে' রূপে। উচ্চারণের প্রথম ঝোঁকটা পড়ে দ্বিতীয় পর্বের প্রথম দলের উপরে। তাছাড়া এই পর্বে একটি করে রুদ্ধদল থাকেই। ফলে এই পর্বের ধ্বনিভরও হয় বেশি। ধ্বনিভরগত এই অসমতার ফলে ধ্বনিপ্রবাহে ঢেউ ওঠে নীচের থেকে উপরের দিকে। এই উর্ধ্বগামী তালই এই রচনাটির প্রধান অবলম্বন। কিন্তু তার প্রধান সৌন্দর্য প্রতি পঙ্‌ক্তির শেষ পদে। এই পদের প্রথম পর্ব কিন্তু অনুরূপ তিন পর্বের মতো দুর্বল নয়, বরং সবচেয়ে প্রবল। পর্বের প্রথমে একটি জোরালো ঝোঁক তো আছেই, তাছাড়া এটিতে আছে দুটি রুদ্ধদলের আসন। এই পর্বের ধ্বনিভরও সবচেয়ে বেশি। এই পদের দ্বিতীয় পর্বটি দুর্বল। তার আদিতে এটুকু ঝোঁক পড়ে বটে, কিন্তু সেটি অপেক্ষাকৃত মৃদু। তার চেয়েও বড় কথা হল এই পর্বে আছে তিন দল, অর্থাৎ এক দলমাত্রার ফাঁক এই ফাঁকটুকু হল ছন্দের রেশ রাখার অবকাশ। দেখা গেল এই পদে ছন্দের ঢেউ নামে উপর থেকে নীচের দিকে অর্থাৎ তার তাল নিম্নগামী। মোট কথা, এর প্রতি পঙ্‌ক্তিতে ছন্দের প্রবাহ তিন তরঙ্গে এগিয়ে চতুর্থ তরঙ্গে একেবারে উত্তাল হয়ে ক্রমে নেমে যায়। সঙ্গে তাঁর ধ্বনিও প্রবলভাবে ঝংকৃত হয়ে ক্রমে মিলিয়ে যায়, কিন্তু কানে রেখে যায় তার রেশ। চতুর্থ পদের এই যে সুদীর্ঘ ধ্বনি-মূর্ছনা (cadence), তাতেই মুগ্ধ হয় রসিক শ্রোতার কান। তার সঙ্গে আছে স্পন্দিত মিলের বাহাদুরি। একেই বলে ওস্তাদের চাল। এই রচনাটির অপূর্ব শিল্পরূপকে আচ্ছন্ন করে রাখে তার বক্তব্যের 'আবোল-তাবোল' প্রকৃতি। তা সত্ত্বেও এই অভিনব ছন্দের তালটুকু আড়লে থেকেই শ্রোতার চিত্তে লাগাতে থাকে ছন্দের দোল। এখানেই তার সার্থকতা।

স্বৈরবৃত্ত রীতির ছন্দ স্বভাবতই বিচিত্র রূপ ধারণ করতে পারে।

আধুনিক কালের কবিদের রচনায় তার নিদর্শন পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের কোনো-কোনো গীতরচনাতেও মাত্রাবিন্যাসের নিয়ম না-মানা শুধ্ তালনির্ভর ছন্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন—

হে ক্ষণিকের অতিথি,
এলে প্রভাতে কারে চাহিয়া
'ঝরা শেফালির' পথ বহিয়া।
'কোন্ অমরার' বিরহিণীরে চাহ নি ফিরে,
'কার বিষাদের' শিশির-নীরে এলে নাহিয়া।
'ওগো অকরুণ' কি মায়া জানো,
মিলনছলে বিরহ আনো।

গীতবিতান, প্রেম, 'হে ক্ষণিকের' (১৩২৫ কার্তিক)

এটির মূল অবলম্বন পঞ্চমাত্রক কলাবৃত্ত পর্ব। অথচ 'ঝরা শেফালির' প্রভৃতি চারটি পর্বে কলাবৃত্তের নিয়ম মানা হয়নি। কেন না, ওই চার পর্বের লির্, রার্, দের্ এবং রুণ্, এই চারটি রুদ্ধদল সংশ্লিষ্ট ও একমাত্রক রূপে উচ্চারিত হয়। অথচ কোন্ ও কার্, এই দুটি রুদ্ধদল কলাবৃত্তের নিয়মে বিশ্লিষ্ট ও দ্বিমাত্রক রূপেই উচ্চারিত হয়! কলাবৃত্ত রীতির ছন্দে রুদ্ধদলের এ-রকম যথেচ্ছ প্রয়োগের আর একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

ঝরা পাতা গো, আমি তোমারি দলে।
অনেক হাসি, 'অনেক অশ্রু'—জলে
ফাগুন দিল 'বিদায়-মন্ত্র' আমার হিয়াতলে।
ঝরা পাতা গো, 'বাসন্তী রঙ' দিয়ে
শেষের বেশে সেজেছ তুমি কি এ।
খেলিলে হোলি ধূলায় ঘাসে ঘাসে
'বসন্তের এই' চরম ইতিহাসে।
তোমারি মতো আমারো উত্তরী
আগুন-রঙে দিও রঙিন করি,

অন্তরবি 'লাগাক পরশ'-মণি
প্রাণের মম শেষের সম্বলে ॥

গীতবিতান, বসন্ত, 'ঝরা পাতা গো' (১৩৩১, ফাল্গুন)

এটিরও মূল অবলম্বন পাঁচ মাত্রার কলাবৃত্ত পর্ব। কিন্তু এর পাঁচটি পর্বে কলাবৃত্তের নিয়ম মানা হয়নি। কেন না, ওই পাঁচ পর্বের মধ্যে চার পর্বে একটি করে রুদ্ধদল বিশ্লিষ্ট ও দ্বিমাত্রক না হয়ে সংশ্লিষ্ট ও একমাত্রক রূপে উচ্চারিত হয়। অশ্রু, মন্ত্র রঙ্ ও পরশ, এই চার শব্দের চারটি রুদ্ধদলই একমাত্রক। আর 'বসন্তের এই' পর্বের দুটি রুদ্ধদল (তের্, এই) উচ্চারিত হয় সংশ্লিষ্ট ও একমাত্রক রূপে।

এ-রকম নিয়ম লঙ্ঘন সত্ত্বেও এই দুটি রচনা আবৃত্তিকালে কানে খট্‌কা লাগে না। অর্থাৎ এসব রচনা নিয়মের স্বীকৃতি না পেলেও কানের স্বীকৃতি পায়। কেননা কান নিয়মে চলে না, কান চলে তালের টানে। এই দুই দৃষ্টান্তেই মাত্রাবিন্যাসের নিয়ম বজায় নেই বটে, কিন্তু পর্ববিন্যাসের তাল অটুট আছে। এ রকম নিয়মভাঙা অথচ কানের ছাড়পত্র-পাওয়া ছন্দকেই বলা যায় স্বৈরবৃত্ত। রবীন্দ্র রচনায় তার দৃষ্টান্ত বেশি নেই। যা আছে তার রীতিপ্রকৃতি সুকুমার-রচিত স্বৈরবৃত্তের সমপর্যায়ভুক্ত নয়। রবীন্দ্রনাথের স্বৈরবৃত্ত কলাবৃত্ত-বর্গীয়, আর সুকুমারের স্বৈরবৃত্ত দলবৃত্তবর্গীয়। এ-বিষয়ে আলোচনার আরও অবকাশ আছে। কিন্তু এখানে নয়।

আর পুঁথি বাড়াব না। সহিষ্ণুতম পাঠকেরও তো ধৈর্যের একটা সীমা আছে। তাছাড়া স্বয়ং সুকুমার রায়ের হিতোপদেশটাও তো ভোলা যায় না।

বেশ বলেছ, ঢের বলেছ, ঐখেনে দাও দাঁড়ি
হাটের মাঝে ভাঙ্‌বে কেন বিদ্যে-বোঝাই হাঁড়ি ?

সুকুমার রায় প্রসঙ্গে

মৃণাল সেন

মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর দশ মাস দশ দিনের মাথায় ১৯২৩ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর যে ক্ষণজন্মা, আপাদমস্তক ঋজু বাঙালী ভদ্রলোক তাঁর কর্মযজ্ঞের মধ্যস্থল থেকে সেদিনই হঠাৎ উঠে চলে গিয়েছিলেন, তাঁরও জন্মশতবর্ষ আজ সমাসন্ন। অবিরাম বহুমুখী প্রবাহে জর্জরিত একটি জাতির জীবনে। শতবর্ষ কালক্রমণ খুব সামান্য কথা নয়। ইতিহাসের এই হিসাবটা অসংখ্য পরস্পর, পরস্পর ম্লানবাহী বিস্ময়কর দুর্ঘটনায় ঠাসা। দেশ কালের এই ঘূর্ণপর্বে নিরন্তর যে ভূমিক্ষয় হয়েছে তার ফলে বহু স্তম্ভ ভূমিলাভ, বহু মহীরুহেরই শিকড় আলগা হয়ে গিয়েছে। অথচ অভাবনীয় ব্যাপার এই সুকুমার রায় বিচ্ছিন্নতাবর্ধক এই প্রজন্ম-প্রজন্মব্যাপী ব্যবধানের মধ্যেও এখনো প্রবলভাবে জীবিত আছেন। তাঁর রচনা, অবিকল্প, অবিকৃত ও অবিকল রয়ে গেছে।

অদ্যাবধি শিশু কিশোর বৃদ্ধ নির্বিশেষে বাঙালীর রক্তাচ্ছন্নে স্পন্দমান, বাংলা সাহিত্যের অন্তসলিলে কেবল প্রবহমান তাই নয়, তিনি তাঁর সমূহ মানসিকতার দিশারী ব্যক্তিত্বের মত অগ্রধারী রয়ে গেছেন। কিন্তু তবু দুঃখের বিষয়, এই অমর প্রতিভাকে এখনও আমরা পুরোপুরি আবিষ্কার করে, তাঁর কূটতত্ত্বের প্রকৃত মূল্যায়ণ করে বাস্তবমুখীন কি—সাহিত্যে কি-জীবনে কোনখানেই সমক্য ব্যবহার করতে শিখিনি। এখনো তিনি আমাদের মুখে মুখে শুধু মজাদার ও প্রবাদসিদ্ধই রয়ে গেলেন—ক্ষেপান্তরে-এযুক্তিবদ্ধ হলেন না। এটাই আমাদেরই অক্ষমতার ও লজ্জার কথা।

সুকুমার রায় জন্মেছিলেন এক ঐতিহ্যবান অভিজাত পরিবারে, জন্মেছিলেন এক বিচিত্র সময়ে। উপেন্দ্রকিশোরের প্রত্যক্ষ উত্তরা-

ধিকার তো ছিলই, তার সঙ্গে মিশেছিল বিজ্ঞান রসসাধনার আরও কয়েকটি অভূতপূর্ব ধারা, বৃহত্তর পারিবারিক সূত্রে। মাতামহী সূত্রে। মাতামহী কাদম্বরী জাহ্নবী ছিলেন সে যুগের ডাক্তার। জগদীশ বসুর ভাগিনেয় কেনোগ্রাফ্ ও কুন্তলীন জ্ঞাত হেমেন্দ্র মোহন বসু ছিলেন তাঁর পিসেমশাই। সাহিত্য রসের বিজ্ঞানের রসায়ন অন্বেব সঙ্গে অঙ্কন। এই ভাবেই স্বতস্ফূর্তি পেয়েছিল তাঁর জীবনে। স্বনিশ্চিত ও মেধাবী এই নির্জীব শিশুজীবন ও কর্মজীবন ছিল অসাধারণ, প্রচলিত ধারার বাইরে। দুটি বিষয়ে অনার্স নিয়ে বি এস সি পাশ কবেছিলেন। কলারশিপ নিয়ে ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন ম্যানচেষ্টার স্কুল অব টেকনোলজি'তে ফটোগ্রাফী ও ব্লক নির্মাণ শিখতে। এই পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিলেন। রয়েল ফটোগ্রাফী সোসাইটিব প্রথম ভারতীয় সদস্য সুকুমার রায় কোন আর্য স্কুলে হাতে ঘড়ি না নিয়ে ছবির জগতে, বিশেষ কবে ছবির ক্ষেত্রে এর নতূন মাত্রা যেমন করেছিলেন। তেমনি সম্পাদনার ক্ষেত্রে 'সন্দেশ' এক সমিতির সংযোজনেব ক্ষেত্র 'ননমেন্স ক্লাব' ও 'মনডে ক্লাব' এর পরিচালনায় তিনি সক্রীয় হয়ে যাবেন। বাঙালীর ভাবালুক ও পল্লব গ্রাহীতাকে খুন করে তিনি নবযুগের চরিত্র গড়াব কাজে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এমন মানবতাবাদী ও উদার মুক্ত চিন্তা মানুষের পক্ষেই সম্ভব ছিল বিজ্ঞানের ভাষায় ভর করে কল্পনার আজব রাজ্যে উড়ে বেড়ানো। বালকের ছদ্মবেশে সাবালক সাজার যোগ্যতা ছিল তাঁর, অধিকার ছিল সহজ সুরে গভীর কথা বলার। দুই শতাব্দীর ল্যাজকুড়ো মিলে উনিশ বিশেষ সেই সংস্কৃতির খিচুড়ি পর্বে, এই সাজে বত্রিশভাজার দেশে, বাঙালীবাবু ভদ্রলোকদের পরাজয়গামী গচ্ছভাবকে সমকালীন সুকুকারই পেয়েছিলেন অসঙ্গতির ধারায় বিপর্যস্ত করে ভূত ছাড়ানোর মন্ত্র পড়তে। নাবালক—সাবালকের মধ্যবর্তী মূঢ়তার সন্তি ভেঙে —নিয়ম—বেনিয়মের চৌহদ্দি ডিঙিয়ে এর বিচিত্র সরল সত্যের জগতে টেনে নিয়ে গেছেন মানুষকে। তিনি শিশু সাহিত্যিকের অন্তরালে ছিলেন প্রকৃত বয়স্ক সাহিত্যিক তাঁর অন্যতরগদ্যের কলমে

তার কথঞ্চিৎ নিদর্শন মিলেছে তাঁর মত শিল্পযোদ্ধা, শিল্পরসিক, শব্দ-তাত্ত্বিক,ও দর্শন ও প্রদর্শনের সার্থক রূপকার এখনও বিরল। উদ্ভট ও অসাধ্য মিল নিয়ে তিনি যেমন শব্দের মিল জংধরার ভাষার দরজা খুলে দিয়েছেন। তেমনি তাঁর উদ্ভট দর্শনে উদ্ভট চিত্রসজমাস সাজিয়ে ননসেন্সের চিকের আড়ালে সাক্ষাৎকার সাজিয়েছেন এমন এক জীবনের যা বা বয়সের এবং চিরকালের মধ্যেই ধ্রুববিন্দুতে পৌঁছাবার হ্রস্বতম ক্ষিপ্রাত পথের হদিশ তাই আমাদের খুঁজতে হবে এই শতবর্ষের আলোয় সুকুমার সাহিত্যে।

কবি সুকুমার

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

সুকুমার রায়ের প্রতিভা ছিল বহুমুখী। শুধু ছড়ায় নয়, সাহিত্যের আরও নানা শাখায় তাঁর প্রতিভা এমন-কিছু ফুল ফুটিয়েছিল, গন্ধের গরিমায় আর বর্ণের বৈভবে যা আজও আমাদের মন কেড়ে নেয়। তিনি লিখেছিলেন 'অতীতের ছবি', পদ্যবন্ধে যেখানে অনতি অতীত কালের স্মরণীয় কয়েকজন বাঙালি মনস্বীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়েছে। লিখেছিলেন হাস্যরসে টইটম্বুর প্রচুর গল্প। লিখেছিলেন বৈচিত্র্যে অভূতপূর্ব আটটি নাটক, যার কয়েকটিতে তিনি ছোটদের জগতের নানা মজার ঘটনা দিয়ে তৈরি করে তুলেছেন বিস্ফোরক সব নাটকীয় মুহূর্ত, আবার কয়েকটিতে—খুবই সরাসরিভাবে—বড়দের জগতের নানা ভণ্ডামির উপরেও আঘাত হানতে ছাড়েননি। লিখেছিলেন 'আজব দেশে অ্যালিস' এর আদলে তাঁর অবিস্মরণীয় 'হযবরল' এবং সেই সঙ্গে এমন আরও অনেক রচনা, যার কিছু-বা কৌতুকের বারুদে ঠাসা, কিছু-বা স্পষ্টতই শিক্ষামূলক, এবং কিছু-বা নানা ব্যাপারে ছোটদের কৌতূহলকে যথাসম্ভব উশকে দিতে চায়।

কিন্তু তাঁর এত রকমের সব রচনার কথা মনে রেখেও যা আমাদের স্বীকার করতে হয়, তা এই যে, সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রে যতই সাফল্য তিনি অর্জন করে থাকুন, সুকুমার রায়ের প্রবাদপ্রতিম প্রসিদ্ধির মূল কারণ তাঁর ছড়া-ই। সেইসব ছড়া, শিক্ষিত বাঙালি সমাজের মুখে মুখে উচ্চারিত হতে-হতে যার অনেক পঙ্‌ক্তি কিংবা পঙ্‌ক্তি-জোড় প্রবচনে পরিণত হয়েছে বললেও বিন্দুমাত্র বাড়িয়ে বলা হয় না। "কিন্তু তারা উচ্চ ঘর/কংসরাজের বংশধর", "ছায়ার সঙ্গে কুস্তি করে গাত্রে হল ব্যথা", "কিন্তু সবার চাইতে ভাল/পাঁউরুটি আর ঝোলাগুড়", "সেই সাপ জ্যান্ত/গোটা দুই আন তো", "প্যাঁচা কয় প্যাঁচানি খাসা তোর চ্যাঁচানি", "শিবঠাকুরের আপন দেশে/আইন-কানুন সর্বনেশে"

"সেই কথাটা বুঝিয়ে দেব পাঁচ মিনিটে দেখে নে", "বামগরুড়ের ছানা/হাসতে তাদের মানা"—কত আর দৃষ্টান্ত দেব, শিক্ষিত বাঙালি মহলে যখন তর্ক অথবা আলোচনা চলে, সাংসারিক সামাজিক ও রাষ্ট্রিক নানা ব্যাপারে, তখন সুকুমার রায়ের এইসব পঙ্‌ক্তি ও পঙ্‌ক্তি জোড়কে প্রায়শ আমরা উচ্চারিত হতে শুনি। এবং এমনভাবে উচ্চারিত হতে শুনি, যেন এইগুলিই সেই চূড়ান্ত মন্তব্য, যার পরে আর বিতর্কের কোনও অবকাশই রইল না। এ-সব ছড়া যখন পড়ি আমরা, তখন শুধুই যে এদের বিষয়বস্তু অথবা তার তাৎপর্য আমাদের আগ্রহ আকর্ষণ করে, তা নয়, এদের গঠন-সৌন্দর্যও আমাদের নজর কেড়ে নেয়। আমরা লক্ষ করি যে, সুকুমার রায়ের কোনও ছড়াতেই কোনও ঢিলেঢালা ব্যাপার নেই, তাদের প্রতিটিরই বাঁধুনি অত্যন্ত আটসাঁট, এবং ছন্দের উপরে তাঁর অসামান্য দখলের ব্যাপারটাও আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যখন আমরা দেখি যে, কোথাও কোনও পঙ্‌ক্তিকে তিনি যৎসামান্যও এলিয়ে পড়তে দেননি। একইসঙ্গে আমরা বুঝতে পারি আর-একটা কথাও। সেটা এই যে, বাঙালির স্বাভাবিক উচ্চারণ প্রকৃতির কথা মনে রেখে, এবং তাকে মান্য করেই, তিনি নির্বাচন করে নিয়েছেন তাঁর শব্দাবলী, লক্ষ রেখেছেন যে, একটি পঙ্‌ক্তি থেকে যখন আর-একটি পঙ্‌ক্তিতে গড়িয়ে যাচ্ছি আমরা, তখন কোনও শব্দই যেন সেই প্রবহমানতায় কোনও বিঘ্ন ঘটাতে না পারে। উপরন্তু আছে পরিপাটি সেইসব অন্ত্যমিল, যার অনেকগুলিই চমকপ্রদ। একদিকে যেমন সুকুমার রায়ের হরেক ছড়ার সৌকর্য তারা আরও খানিকটা বাড়িয়ে দেয়, এবং সে-সব ছড়াকে স্মৃতিতে ধারণ করবার ব্যাপারেও যৎপরোনাস্তি সাহায্য করে আমাদের, অন্য দিকে তেমনি ছড়াগুলিকে আদ্যন্ত একটা শক্ত বাঁধুনির মধ্যে রাখবার ব্যাপারেও তারা কিছু কম সাহায্য করে না।

বলা বাহুল্য, গোত্রবিচারে সুকুমার রায়ের অনেক ছড়াই 'উদ্ভট'। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'ননসেন্স রাইম', ঠিক সেই

জাতীয় 'নিরর্থক' ছড়াও কিছু লিখেছেন তিনি। কিন্তু তাতেই যে তার প্রতিভা সর্বাধিক স্ফূর্তি পেয়েছিল, এমন কথা আমাদের মনে হয় না। বরং যতই তাঁর ছড়ার মধ্যে ঢুকি আমরা, ততই আমাদের মনে হতে থাকে যে, তাদের তাৎপর্য নেহাতই তাৎক্ষণিক অর্থের মধ্যে আবদ্ধ নয়, মনে হতে থাকে যে, তার তলায় রয়ে গিয়েছে দ্বিতীয়, এমনকী, তৃতীয় কোনও অর্থের স্তর, এবং হঠাৎ কখনও—বিদ্যুচ্চমক যেভাবে অন্ধকারকে ছিন্ন করে জাগিয়ে তোলে নানা দৃশ্য, ঠিক সেইভাবেই—অন্তর্নিহিত সেই অর্থগুলি আমাদের কাছে উদভাসিত হয়ে উঠবে।

ছড়ার ছন্দ বলতে সাধারণত দলবৃত্ত ছন্দই আমরা বুঝে থাকি। 'আবোল তাবোল' আর 'খাই খাই'-এর ছড়ায় কিন্তু যেমন দলবৃত্ত, তেমনি 'কলাবৃত্ত' ছন্দের প্রাধান্যও আমরা দেখতে পাই। উপরন্তু, এ দুটি ছন্দের মূল কাঠামোর উপরে লেখক যেভাবে তৈরি করে তোলেন তাঁর ছড়াগুলিকে, প্যাটার্ন বা বন্ধের বৈচিত্র্যও তাতে আমরা কিছু কম দেখি না। বৈচিত্র্য আছে নিসর্গ, মানুষ আর সম্ভব-অসম্ভব অন্য নানা প্রাণীর বর্ণনায়। বৈচিত্র্য আছে বাচনভঙ্গি আর বিষয়বস্তুতেও। কিন্তু সতর্ক পাঠকমাত্রেই টের পেয়ে যান যে, এত যে বৈচিত্র্য, তা কিনা এই ছড়াগুলিকে কখনওই একাকার হয়ে যেতে দেয় না, এবং প্রায় প্রতিটি ছড়াকেই অত্যন্ত স্পষ্ট করে ও পৃথক করে চিনিয়ে দেয় তাঁর অন্য সমস্ত ছড়ার থেকে, এই বৈচিত্র্য সত্ত্বেও একটি সামান্য লক্ষণ রয়েছে এই ছড়াগুলির। সেটা এই যে, এ-সব রচনার প্রায় প্রতিটির ভিতর থেকেই উঁকি মারে এদের নির্মাতার মুখ। সেই নির্মাতার মূল চরিত্রও তাঁর রচনা থেকেই আমরা অনুধাবন করতে পারি। আমরা বুঝে নিতে পারি যে, তিনি এমন একজন মানুষ, যুক্তি আর বুদ্ধির শিকলে আপন হৃদয়াবেগকে যিনি বন্দী রাখারই পক্ষপাতী, অন্তত সেই আবেগকে তাঁর রচনায় যিনি মুক্তি দিতে চান না।

যদি বলি যে, এটাও একটা মস্ত কারণ, যেজন্য ছড়া, শুধু ছড়ারই

একজন শ্রেষ্ঠ নির্মাতা হিসেবে তিনি যৎপরোনাস্তি শ্রদ্ধা আর ভালবাসা পেয়েছেন বাঙালি পাঠকসমাজের, কিন্তু সেই একই পাঠক-সমাজ একজন উল্লেখযোগ্য কবি হিসেবে তাঁকে শনাক্ত করতে পারেনি, তা হলে কি ভুল বলা হবে? কথাটা এইজন্যে বলছি যে, কবিতা যদিও সর্বৈব বুদ্ধিবিবর্জিত ব্যাপার নয়, কিন্তু ভুল করে যাকে আমরা গীতিকবিতা বলতে অভ্যস্ত হয়েছি, বস্তুত ব্যক্তিগত অনুভূতির উচ্চারণ সেই লিরিক কবিতায় যে হৃদয়াবেগের ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি জরুরি, তা তো কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না। অথচ সুকুমার রায় সেই হৃদয়াবেগের ব্যাপারটাকেই তাঁর পরিহাস আর বঙ্গরসের আড়ালে সর্বদা গোপন করে রাখলেন। সেদিক থেকে যখন দেখা হয়, সাধারণ একজন পাঠকের তখন আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, কবি হিসেবে তাঁকে শনাক্ত করতে না-পারার দায় শুধু তাঁর পাঠকেরই নয়, তাঁর কবি-পরিচয়ের বিরুদ্ধতা করেছেন তিনি নিজেও।

বুদ্ধদেব বসুকে ধন্যবাদ, সম্ভবত তিনি প্রথম চেষ্টা করেছিলেন সুকুমার রায়কে তাঁর এই দ্বিতীয় পরিচয়ের ক্ষেত্রে চিনিয়ে দিতে। সুকুমার রায়ের মৃত্যুর (ভাদ্র, ১৩৩০) মাত্র আড়াই বছরের মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছিল বুদ্ধদেবের প্রবন্ধ 'কবি সুকুমার রায়'। এমনিতেই এই রচনা যে খুব সারবান, তা নয়, একে তো যুক্তির চেয়ে উচ্ছ্বাসের মাত্রাই এখানে বেশি প্রবল, উপরন্তু পদ্য আর কবিতার সীমারেখাও খুব স্পষ্ট অথবা বিশ্বাসযোগ্যভাবে এখানে নির্দেশ করা হয়নি। কিন্তু এই প্রবন্ধ যখন পড়ি, তখন একটা কথা আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে। সেটা এই যে, একটা জরুরি ব্যাপার এটাই ছিল প্রথম প্রয়াসে, এবং অন্তত সেই কারণেও এই প্রবন্ধ নিশ্চয় স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তুলনায় বরং বুদ্ধদেবেরই পরিণত বয়সের আর-একটি রচনা—'বাংলা শিশুসাহিত্য'—এক্ষেত্রে অনেক বেশি সাহায্য করে আমাদের। বস্তুত, সেখানেই তিনি আরও স্পষ্ট করে আঙুল তোলেন সেই কবিত্বগুণের দিকে, যে-গুণ না-থাকলে নিশ্চয়ই সুকুমার

বাযের ছডা মাঝে মাঝে পদ্যের সীমানা এত অক্লেশে ছাডিযে যেতে পারত না। কত অক্লেশ ছাডিযে যায, 'আবোল তাবোল'-এরই অনেক ছডা ছডিযে রযেছে তার দৃষ্টান্ত। সুকুমার রায যখন আমাদের ডাক দিযে বলেন "আয যেখানে খ্যাপার গানে নাইকো মানে নাইকো সুর /আয রে যেথায উধাও হাওযায মন ভেসে যায ভেসে যায কোন সুদূর", কিংবা তিনি যখন বলেন, "হেথায গানের ছন্দ ভাল, মেঘ মাখানো আকাশ ভাল, ঢেউ-জাগানো বাতাস ভাল", কিংবা তিনি যখন শোনান 'শিশির ভেজা সদ্য ভোর।"র কথা, তখন নিশ্চয সেই কবিত্বগুণ সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ থাকে না আমাদের। আবার যখন রাত্রির বর্ণনা দিতে গিযে তিনি বলেন :

> "বিদঘুটে রাত্তিরে ঘুটঘুটে ফাঁকা,
> গাছপালা মিশমিশে মখমলে ঢাকা।
> জটবাঁধা ঝুল-কালো বটগাছতলে
> ধকধক জোনাকির চকমকি জ্বলে।
> পুবদিকে মাঝরাতে ছোপ দিযে রাঙা
> রাতকানা চাঁদ ওঠে আধখানা ভাঙা।"

তখন আরও নিঃসংশয হই আমরা, এবং বুঝতে পারি যে, এ-সব পঙ্‌ক্তি কোনও ছডাকারের হাতে—তা তিনি ছডাকার হিসেবে যতই কুশলী হোন না কেন—তৈরি হওযা সম্ভব নয, এই বিস্ময়কর বর্ণনা আসলে অমিত-শক্তিমান এক কবির কলম থেকেই বেরিযে এসেছে। যেমন বেরিযে এসেছে নীচের বর্ণনাটিও :

"সন্ধ্যাসকাল মেঘের মেলা—কূলকিনারা ছাডি রং-বেরঙের পাল তুলে দেয দেশবিদেশে পাডি। মাথায জটা, মেঘের ঘটা আকাশ বেযে ওঠে, জোছনা-রাতে চাঁদের সাথে পাল্লা দিযে ছোটে।" সঞ্চরমাণ মেঘের সঙ্গে চাঁদের লুকোচুরি এই বর্ণনা, যা কিনা প্রথম-শরতের আকাশের ছবিই ফুটিযে তোলে আমাদের চোখের সামনে, এরও কবিত্বগুণে অবশ্যই মুগ্ধ হই আমরা। কিন্তু একেবারে স্তব্ধ হযে

যাই রচনাটি পড়বার পরে, "মেঘ-মুলুকে ঝাপসা রাতে,/রামধনুকের আবছায়াতে" যার সূচনা, এবং যার অন্তে রয়েছে অবিস্মরণীয় সেই পঙ্‌ক্তি দুটি : "ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর, গানের পালা সাঙ্গ মোর।" স্তব্ধ হয়ে যাই, কেননা, কৌতুকাবহ যতই না কেন উক্তিকে তিনি সাজিয়ে দিয়ে থাকুন এই রচনার সূচনা আর সমাপ্তির মধ্যবর্তী অংশে, তার সাহায্যেও সুকুমার রায় এখানে ঢেকে রাখতে পারেননি তাঁর বিষাদভার। সম্প্রতি যখন এই কবিতাটি আবার আদ্যন্ত পড়ি, তখন অনিবার্যভাবেই আমার মনে পড়ে যায় 'লাইমালাইট'-এর সেই চ্যাপলিনকে, প্রাণান্তকর দুর্ঘটনার পরেও যিনি কৌতুকের মোড়কে তাঁর যন্ত্রনাকে গোপন করতে চেয়েছিলেন। মনে পড়ে যায় 'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট' নাটকের প্রচণ্ড ফূর্তিবাজ সেই মার্কু-সিওর কথাও, তরবারির আঘাতটা নিশ্চয় মারাত্মক রকমের নয়, রোমিওর এই আশান্বিত উক্তির উত্তরেও যিনি কৌতুক করতে ছাড়েননি : মরণান্তিক যন্ত্রণার মধ্যেও সহাস্য বলেছিলেন :

"No, 'its not so deep as a well, nor so wide as a church door, but, 'its enough, 'twill serve"

কিন্তু সে-কথা থাক। যেটা আমাদের মূল বক্তব্য, সেটা এই যে, সুকুমার রায়ও তাঁর হৃদয়াবেগকে, তাঁর বিষাদ আর যন্ত্রণাকে, গোপন রাখতেই চেয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে তাঁর ছড়ার ভিতর দিয়েই ক্রমশ আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর কবি-পরিচয়, এর থেকে কী বুঝব আমরা? আমরা কি তা হলে ধরে নেব যে, লিরিক কবিতার জরুরি একটি শর্তকে লঙ্ঘন করেও এই পরিচয়ের ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব? না, তেমন কোনও সিদ্ধান্ত আমরা করব না। পক্ষান্তরে, এটাই আমাদের বুঝে নিতে হবে যে, লিরিক কবিতারও রূপান্তর এই বিশ শতকে কিছু কম ঘটেনি। পালটে গেছে তারও চরিত্র আর শর্তাবলী।

কবিরা সেখানেও আর জোর-গলায় তাঁদের হৃদয়ের কথা বলতে চান না। এই যে পালাবদল, যার ভিতর দিয়ে আধুনিকতার, এবং

নাগরিকতারও নানা লক্ষণ ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে এরও অগ্রপথিক হয়তো রবীন্দ্রনাথই। অন্তত, তাঁর 'ক্ষণিকা'র কবিতা পড়ে যখন জেনে যাই আমরা যে, ব্যথার কথাগুলিকেও তিনি হালকা করেই বলতে চান, এবং নিজেই ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিতে চান তাঁর নিজেরই বক্তব্যের ভারকে, তখন আর এ-ব্যাপারে কোনও সন্দেহ আমাদের থাকে না। আমরা ধরতে পারি যে, কারণটা যা-ই হোক, হৃদয়ানুভূতিকে যথাসম্ভব গোপন রাখবার পক্ষপাতী হয়ে উঠেছেন তিনিও। সুকুমার রায়ও যদি ঠাট্টা আর পরিহাসের মোড়কেই গোপন রাখতে চেয়ে থাকেন তাঁর হৃদয়ানুভূতিকে, তবে আর কেন বিস্মিত হব আমরা? বরং আমরা বুঝে নেব যে, এও আসলে কবি হিসেবে তাঁর আধুনিক ও নাগরিক মনোভাবেরই একটি অভ্রান্ত লক্ষণ।

সুকুমার রায়ের নাট্য ভাবনা

জগন্নাথ ঘোষ

যে কয়েকজন স্বল্পায় অথচ প্রতিভাবান লেখক বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসকে উজ্জ্বলতা দান করে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন, তাঁদের মধ্যে সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৩) অন্যতম। অদ্ভুত রসের কাব্যরচনা করেই তাঁর খ্যাতি। ইংরেজি 'ননসেনস ভার্স' বলতে যে-জাতীয় রচনার সাক্ষাৎ মেলে, সুকুমারের অদ্ভুত রসের কাব্যকে সেই তালিকায় ফেলা যায়। অবশ্য শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন তাঁর একটি প্রবন্ধে সুকুমারের কাব্যকে ছেলেমি রচনা বলে অভিহিত করেছেন। কাব্য রচনা ছাড়াও তিনি নাট্যরচনা ও নাট্যাভিনয়ের প্রতিও ছিলেন সশ্রদ্ধ অনুরাগী। বলা যায় নাটক রচনার পূর্বেই তিনি অভিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন।

সত্যজিৎ রায় ও পার্থ বসু সম্পাদিত, 'সমগ্র শিশু সাহিত্য সুকুমার রায়' গ্রন্থের 'গ্রন্থ পরিচয়' অংশে সুকুমারের নাট্যরচনার উন্মেষকাল সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রদত্ত হয়েছে। এই তথ্য পাঠে জানা যায়, সুকুমার রায় নাটক রচনায় মনোনিবেশ করেন ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়। এই বছরই তিনি রচনা করেন 'রামধন বধ'। নাটকটির পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি। সুকুমারের ভগিনী বিশিষ্টা লেখিকা পুণ্যলতা চক্রবর্তীর স্মৃতিকথা থেকে নাটকটির কাহিনী সংক্ষেপ যেটুকু জানা যায়, তা নিম্নরূপ:

"রাম্‌স্‌ডেন (রামধন) সাহেব মস্ত সাহেব, আসল সাহেবরা তার কাছে কোথায় লাগে। 'নেটিভ নিগার্‌' দেখলেই সে নাক সিঁটকোয়, পাড়ার ছেলেরাও তাকে দেখলেই চেঁচায়—'বন্দেমাতরম্‌'। আর সে তেড়ে মারতে আসে, বিদঘুটে গালাগালি দেয়, পুলিশ ডাকে। এহেন 'সাহেব' কি করে ছেলেদের হাতে জব্দ হল, তারই গল্প। যেমন মজার অভিনয়, তেমনি মজার গল্প।"

পূর্ণ্যলতার সাক্ষ্য থেকে জানা গেল, রামধন চরিত্রটি সুকুমার এঁকেছিলেন এদেশী কিছু মানুষের ইংরেজিয়ানার ভণ্ডামিকে বিদ্রূপ বাণে বিদ্ধ করার অভিপ্রায়ে। এই প্রহসনটি অভিনীতও হয়েছিল। 'রামধন' রচনার পর সুকুমার আরো আটটি প্রহসন রচনা করেন। সেগুলি হল 'ঝালাপালা', লক্ষ্মণের শক্তিশেল'. 'ভাবুকসভা', 'শব্দকল্পদ্রুম', 'চলচ্চিত্তচঞ্চরি'. 'অবাক জলপান'. 'হিংস্টি', ও 'মামাগো'।

সুকুমার রায়ের নাট্যচর্চা শুরু হয় অভিনয়ের মাধ্যমে। তিনি তাঁর ভাইবোনদের জন্মদিন উপলক্ষে ভাইবোনদের নিয়েই অভিনয়ের আসর জমাতেন। তাঁর পিতৃদেব উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর (১৮৬৩-১৯১৫) 'কেনারাম ও বেচারাম' নামের হাসির নাটকটি সুকুমার মঞ্চস্থ করেন। যতদূর জানা যায়, এই তাঁর প্রথম অভিনয় ও প্রযোজনা। সুকুমার সেন তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে সুকুমার রায়ের অভিনয় ও নাট্যরচনার সূত্রপাত সম্বন্ধে যে তথ্য দিয়েছেন, সেটি স্মরণযোগ্য। তিনি লিখেছেন, "সুকুমার রায় ১৯০৬ সালে বি. এস. সি. পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হবার পর পারিবারিক আবেষ্টনের মধ্যে অনেকখানি স্বাধীন আমোদ প্রমোদের সুযোগ পেয়েছিলেন। মনে হয় এই সময়ে তিনি যথেষ্ট এবং স্বচ্ছন্দ ভাবে রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী—বিশেষ করে তাঁর কৌতুকনাট্য ও প্রহসনগুলি—ভালো করে পড়বার অবকাশ পেয়েছিলেন। আগে থেকেই যে সুকুমার রায়ের যাত্রা-থিয়েটার ও অভিনয়ের দিকে বেশ প্রবণতা ছিল তা বোঝা যায় তাঁর একটি বিশেষ প্রচেষ্টা থেকে। কলেজের শিক্ষা শেষ হলে পর তিনি ভাইবোন ও আত্মীয়স্বজন নিয়ে আপনাদের মধ্যে নাট্যাভিনয়ের দ্বারা আমোদ-প্রমোদ করবার প্রবৃত্তি বশে 'ননসেন্স ক্লাব' বলে এক ছেলেমানুষী সংস্থা গড়েছিলেন।"

সুকুমার রায় 'ভাই বন্ধুদের অভিনয়ের জন্য' স্থাপন করেন 'ননসেন্স ক্লাব'। এই ক্লাবটি স্থাপিত হয় ১৯০৬ থেকে ১৯০৮ সালের মধ্যে। প্রবণরঞ্জন রায় তাঁর 'খেয়াল রসের ছবি' শীর্ষক প্রবন্ধে

ননসেন্স ক্লাব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন, সেটি অনুধাবনযোগ্য। তিনি লিখেছেন "নামকরণেই মালুম, সুকুমার বাবুর উদ্দেশ্য ছিল এমন এক আড্ডা, যার সদস্যরা গোমড়া মুখ করে শক্ত বিষয়ে চিন্তা করে ঘুম নষ্ট করবেন না আর সমাজের হিতসাধন করবার নামে নিজেদের সূক্ষ্ম অনুভূতি সব ভোঁতা করে ফেলবেন না। তবে, তার মানে এ নয় যে, আত্ম নিশ্চিত হয়ে পরনিন্দা-পরচর্চা থেকে আমোদ লাভের গ্রাম্য চণ্ডীমণ্ডপী কায়দাটাকে তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন। আসলে তিনি বুদ্ধিচর্চার সংগে সুকুমার বৃত্তি চর্চার ভেদ মানতে চাননি। বলতে চেয়েছিলেন রস সৃষ্টিই যদি সুকুমার বৃত্তির লক্ষ্য হয় তবে হাস্য-রসের মতন স্বাস্থ্যকর রসসৃষ্টি কেন তার অভীষ্ট হবে না।"

ননসেন্স ক্লাবের জন্য সুকুমার রায় রচনা করেন দুটি প্রহসন 'ঝালাপালা' ও লক্ষ্মণের শক্তিশেল'। এই দুটির অভিনয় তারিখ জানা না গেলেও, নিঃসন্দেহে বলা যায় অভিনয় নিশ্চয়ই খুব জমেছিল।

ঝালাপালার রচনাকাল ১৯১১ সাল এবং 'সন্দেশ' পত্রিকায় এটি প্রকাশিত হয় ১৩৩১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যায়। 'ঝালাপালা' তিনটি দৃশ্যে বিভক্ত। এর শুরু ও সমাপ্তিতে রয়েছে জুড়ির গান। এই প্রহসনে ব্যঙ্গের কশাঘাতে জর্জরিত হয়েছে পণ্ডিত, খেঁটুরাম ছুলিরাম। জমিদারের মামা কেদার কেমন কৌশলে অপারদর্শী ঠকদেব শায়েস্তা করল, তারই হাস্যরসাশ্রিত ন্যায়রূপ 'ঝালাপালা'। এতে রবীন্দ্রনাথের হাস্যকৌতুক গ্রন্থের প্রভাব অনিবার্যভাবে লক্ষিত হবে। চরিত্র চিত্রণে সংলাপ রচনায় ও ঘটনার চাতুর্যপূর্ণ উপস্থাপনে ঝালাপালা একটি অনবদ্য প্রহসন। প্রহসনটির সমাপ্তিতে আমরা লক্ষ্য করি ঠকদের পরিণতি বড় করুণভাবে প্রকটিত। আর তার ফলে হাস্যরস নিদারুণভাবে জমজমাট হয়েছে।

'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' চারিটি দৃশ্য সমন্বিত। রামায়ণের বহু পরিচিত কাহিনী এই প্রহসনের মূল বিষয়। কিন্তু এটির আকর্ষণ অন্যত্র।

চরিত্রগুলির উপস্থাপন কৌশল ও সংলাপেইএর শিল্পসিদ্ধি। নাট্যকার পৌরাণিক গাম্ভীর্যের মুখোস খসিয়ে দিয়েছেন চরিত্রগুলির অঙ্গ থেকে। দ্বিতীয় দৃশ্যের রণস্থলে যখন সুগ্রীব রাবণের পরাক্রমে ভীত হয়ে পালায়, তখন রাবণের কণ্ঠে শোনা যায়—"ছি, ছি, ছি—এত গর্ব করে, এত আস্ফালন করে, শেষটায় চম্পট দিলি ? শেম ! শেম ! রাবণের মুখে ইংরেজি শব্দের এই প্রয়োগ বেমানান বলেই হাসির উদ্রেক ঘটায়। তাছাড়া পৌরাণিক চরিত্রগুলির মুখে গান শুনে কার না হাসি পাবে। রাম, লক্ষ্মণ, হনুমান, জাম্বুবান, রাবণ, বিভীষণ, বাণরগণ, যমদূতগণ—সমস্ত চরিত্রগুলিই সুকুমারের কৌতুক রসে জরিত পৌরাণিক জগতের বিবর্ণ পটভূমি পরিত্যাগ করে আমাদের সমকালীন জগতের অধিবাসীতে পরিণত হয়েছে। তৃতীয় দৃশ্যে দেখি, জাম্বুবান হনুমানকে বলছে—"এই কাগজে প্রেসক্রিপশান লিখে দিচ্ছি, এই ওষুধগুলো চট করে নিয়ে আসতে হবে।" হনুমান রাত্রি বেলা ওষুধ আনতে অনিচ্ছুক। তাই বলে—আমি ডাক্তারখানা চিনিনে।' হনুমানের এই বেয়াদপিতে জাম্বুবান কর্কশ কণ্ঠে বলে—"আ মরণ আর কি ! একি কলকাতার শহর পেয়েছিস নাকি যে বাথগেট কোম্পানি তোর জন্যে দোকান খুলে ?"

হনুমান ও জাম্বুবানের এই সংলাপ শোনার পর আর তাঁদের বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মানুষ ছাড়া ভাবা যায় না। পণ্ডিতেরা নাট্যকারকে কালাতিক্রমনের দোষে দোষী করতে পারেন। কিন্তু এই কালাতিক্রমণজনিত অসংগতি থেকেই জন্ম নিয়েছে লক্ষ্মণের শক্তিশেলের হাস্যরস। যা কিছু অবাস্তব অসম্ভব নিয়মবিরুদ্ধ ও অসঙ্গত তাকেই প্রকাশ করতে চান সুকুমার। এখানেই তাঁর শিল্পচাতুর্য। এই প্রসঙ্গে একথাও স্মরণীয় যে, সুকুমার উনবিংশ শতাব্দীর যাত্রা ও থিয়েটারের নিখুঁত খবর রাখতেন। জুড়ির গান, সংলাপে ছড়ার প্রয়োগ এবং রামায়ণ ও মহাভারতের যুদ্ধের হাস্যকর প্রয়াস তিনি অশেষ নিপুণতায় তাঁর নাট্যরচনাতেই স্থান দিয়েছেন। 'লক্ষণের শক্তিশেল' ঝালাপালার সমসাময়িক রচনা। এটির পূর্বনাম ছিল

অদ্ভুত রামায়ণ। সুকুমারের মৃত্যুর পর সন্দেশ পত্রিকায় ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ভাদ্র আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯১১ সালে এই প্রহসনটিকে অদ্ভুত রামায়ণ নামে সুকুমার শান্তি-নিকেতনে পাঠ করে শুনিয়েছিলেন।

'ঝালাপালা ও লক্ষ্মণের শক্তিশেল' রচনার পর সুকুমারের নাট্য রচনার প্রথম পর্ব সমাপ্ত হয়। ১৯১১ সালে তিনি উচ্চশিক্ষার্থে ইংলণ্ড যান। সেখান থেকে ফিরে আসেন দুই বছর পরে। এই সময় থেকে শুরু হয় তাঁর নাট্যরচনার দ্বিতীয় পর্ব। এই পর্বের প্রথম নাটক 'ভাবুকসভা'। ১৩২১ বঙ্গাব্দের আশ্বিনের প্রবাসীপত্রিকায় নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এটি অতঃপর গিরিডিতে পূর্ণিমা সম্মেলনে অভিনীত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই সঙ্গে 'লক্ষ্মণের শক্তিশেলও অভিনীত হয়।

'ভাবুকসভা-য় মাত্র একটি দৃশ্য। এখানে নিদ্রাবিষ্ট ভাবুক দাদাকে লক্ষ করে একদল ছোকরা ভাবুকের পদ্যবুকনি সন্নিবিষ্ট হয়েছে। ভাবুকদাদার ভাবুকতার প্রতি বর্ষিত হয়েছে বিদ্রূপ। ভাবুক ছোকরাদলের বিদ্রূপকে হজম করে যখন ভাবুকদাদা বলেন- -

"সবুর কর স্থিরোভব বাঘ এখন টিপ্পনী,

ভাবের একটা ধাক্কা আসছে, সরে দাঁড়াও এক্ষনি!" তখন 'ভাবের ধাক্কা'র উল্লেখে প্রমাণিত হয় ভাবুকতার ভণ্ডামি। সুকুমার তাঁর সমকালীন তরুণ কবিদের ভাবুকতার ভণ্ডামিকে বিদ্রূপ করার জন্যই ভাবুকসভা রচনা করেছেন। পার্থবসু তাঁর রবীন্দ্রনাথের তরুণ বন্ধু শীর্ষক প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিশ্লেষণে বলেছেন, "মনে হয় আমাদের রবীন্দ্রনাথ নয়, তবে রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন অন্ধ অনুগামী-দের নিয়েই সুকুমারের 'ভাবুকসভা' নাটকটি রচিত হয়েছে। সাধারণত সুকুমার রায় তাঁর পরিপার্শ্ব এবং পরিচিতজনদের নিয়ে কাব্য বিশেষ করে নাট্যরচনায় দক্ষ ছিলেন। এখানেও তিনি তাঁর বন্ধুজনদের দুর্বলতা নিয়েই ব্যঙ্গ করেছেন অবশ্য যাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। 'প্রবাসী'পত্রে সমসাময়িককালে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের

একাধিক প্রবন্ধে এমনকি, অনূদিত রচনায় ভাবের প্রতি অত্যধিক পক্ষপাত দেখিয়েছিলেন। সুকুমার রায়ও ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বন্ধু এবং ভক্ত কিন্তু সেই ভক্তির সঙ্গে থাকত না উচ্ছ্বাস, বরং ছিল বিচার এবং বিশ্লেষণজাত কিঞ্চিৎসংশয়।"

'ভাবুকসভা' কোনো কবিবিশেষকে লক্ষ করে রচিত হলেও ভাবুকদাদার মুখে নিম্নলিখিত 'ভাবের নামতা' শুনলে, তাকে করুণা না করে পারি না।

ভাব এক্কে ভাব, ভাব দুগুণে ধোঁয়া,
তিন ভাবে ডিসপেপ্‌শিয়া—ঢেকুর উঠবে চোঁয়া
ওরে মানিক মানিকরে চুপটি কর খানিকরে।
চারভাবে চতুর্ভুজ ভাবের গাছে চড়—
পাঁচভাবে পঞ্চত্বপাও গাছের থেকে পড়।"

তিন দৃশ্য সমন্বিত 'শব্দকল্পদ্রুম' প্রহসনটি ১৯১৫ সালে। রচনা নাটকটির পাণ্ডুলিপিতে লেখা আছে—

"শ্রীশ্রীশব্দকল্পদ্রুম।"

নোটিস্‌

এই খাতা হারাইলে কাহারও নিস্তার নাই। আদায় না করিয়া ছাড়িব না, না পাইলে গালি দিব।

Copyrights reserved 1915"

১৯১৭ সালে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের জন্ম উৎসবে সুকুমার 'শব্দকল্পদ্রুম' তাঁর নিজস্ব দল নিয়ে অভিনয় করেছিলেন। পার্থ বসু তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে এই বিষয়টি উল্লেখ করে লিখেছেন, "...সুকুমার তাঁর শব্দকল্পদ্রুম নাট্যটি সংগীত-সহযোগে পাঠ করলেন, গানগুলি করেছিলেন সুকুমার রায়ের সহচরেরা। শব্দকল্পদ্রুম-এর সংলাপ গদ্যে ও পদ্যে রচিত। দ্বিতীয় দৃশ্যের ঘটনার নাম দেওয়া হয়েছে 'স্বর্গকাণ্ড'। এই অংশের সংলাপ পদ্যে। শব্দের অভিধানিক অর্থ নিয়ে যারা বিব্রত হয়, তাদের প্রতি বর্ষিত হয়েছে নাট্যকারের করুণা। শব্দের অর্থই যত অনর্থের মূল। প্রহসনের শেষে বিশ্বকর্মার উক্তিতে অর্থের

বিভ্রান্তি দূরীভূত হয়েছে—

"শব্দযজ্ঞ হবিকুণ্ড অফবস্ত ধূম এই মারি শব্দকল্পদ্রুম" স্বর্গকাণ্ডের দেবতাদের চরিত্রগুলি (ইন্দ্র, বৃহস্পতি, নারদ, কার্তিক, অশ্বিনী প্রভৃতি) স্বর্গীয় মহিমায় বঞ্চিত। এছাড়া হরেকানন্দ জগাই পটলা বিশ্বম্ভর প্রভৃতি মর্তবাসীদের নাট্যকার তাঁর অপূর্ব কৌতুকরসের বাণে বিদ্ধ করে চিত্রিত করে হাস্যরসের শ্রোতকে উত্তাল করেছেন।

'চলচ্চিত্তচঞ্চরি' সুকুমার রায়ের জনপ্রিয় ও বহুল অভিনীত প্রহসন। এটি 'শব্দকল্পদ্রুমের সমকালীন রচনা। প্রহসনটি প্রথম মুদ্রিত হয় ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যার বিচিত্রা পত্রিকায়। তখন নাট্যকার মৃত। চলচ্চিত্তচঞ্চরিত প্রধান বিষয় ব্রাহ্মসমাজের নানা দল ও উপদলের মধ্যেকার আদর্শগত সংঘাত। নাটকটিতে বর্ণিত শ্রীখণ্ডবাবুর আশ্রম নাকি শান্তিনিকেতনের আশ্রমকে আক্রমণের উদ্দেশ্য পরি কল্পিত। রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে আক্রমণ করার জন্য সুকুমার চলচ্চিত্তচঞ্চরি লিখেছিলেন না। সে বিষয়ে সন্দেহ থাকলেও একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, ব্রাহ্মসমাজের নানা দল উপদলের মধ্যেকার তর্কাতর্কিকে আঘাত করাই এই নাটকের উদ্দেশ্য। দিলীপকুমার বিশ্বাস রচিত 'সুকুমার রায় ও ব্রাহ্ম সমাজ' শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করলে তা জানা যাবে।

'চলচ্চিত্তচঞ্চরি' চারটি দৃশ্যে বিভক্ত। ভবদুলালের ভাবী গ্রন্থ 'চলচ্চিত্তচঞ্চরি'-র নামে প্রহসনটির নাম। এই সমাপ্তি সংগীত "সংসার কটাহতলে জ্বলেরে জ্বলে!" রবীন্দ্রনাথের 'বাজে বাজে রম্যবীনা বাজে' গানের প্যারডি। নাটকটিতে বর্ণিত 'সাম্য ঘন্ট' ও 'সিদ্ধান্ত বিসূচিকা'র নিবারণকল্পে ভবদুলাল তার 'চলচ্চিত্তচঞ্চরি' সম্পর্কে বলেছিল, "…চলচ্চিত্তচঞ্চরি—লালরঙের মলাট—চামড়া দিয়ে বাঁধানো। তার উপর বড় বড় করে সোনার জলে লেখা—চলচ্চিত্ত-চঞ্চরি—পাবলিশড বাই ভবদুলাল। একুশ টাকা দাম করব।" ভবদুলাল যে কতখানি করুণার পাত্র তা তার এই সংলাপ থেকে স্পষ্ট হয়। রবীন্দ্রনাথ চলচ্চিত্তচঞ্চরি সম্পর্কে কৌতূহলী ছিলেন।

অবাক জলপান রচিত হয় ১৩২৭ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে। প্রহসনটিতে কোন দৃশ্য বিভাজন নেই। অলংকার শাস্ত্রে যাকে বলে শ্লেষ বক্রোক্তি, প্রহসনটি হল তাই। যেমন—

পথিক। মশাই, একটু জলপাই কোথায় বলতে পারেন?

ঝড়িওয়ালা। জলপাই? জলপাই এখন কোথায় পাবেন? এত জলপায়ের সময় নয়। কাচা আম চান দিতে পারি।

পথিক-এর জল চাওয়ার উত্তরে সে কখনও শোনে জলপাইয়ের কথা, নাকের জল চোখের জলের কথা, বা কখনও জলের রাসায়নিক প্রস্তুতির কথা। অবশেষে সে অবশ্য জল পেয়েছিল এবং পানও করেছিল। মামা চরিত্রটির দুর্ভোগে পাঠকের হাসির উদ্রেক হয়। প্রহসনটিতে রবীন্দ্রনাথের হাস্যকৌতুকের প্রয়াস অলক্ষিত হয়! 'অবাক জলপান' বহু অভিনীত একটি জনপ্রিয় প্রহসন।

১৩২৭ বঙ্গাব্দের ভাদ্রে প্রকাশিত 'হিংস্মুটি' প্রহসনটিতে দৃশ্য বিভাজন নেই। এটি অনেকখানি রূপকধর্মী। চরিত্রগুলিব কোনও নাম নেই, শুধু সংখ্যায় চিহ্নিত। প্রহসনটিতে স্বপ্নে দেখার বিরুদ্ধে নাট্যকারের মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। উদ্ভট আজগুবি ও অসম্ভবকে নিয়ে যে স্বপ্ন সেই স্বপ্নের কোনও বাস্তব প্রয়োগ না থাকায় শ্রেয়ঃ। হিংসে চরিত্রটির রূপায়ণে, নানা প্রকারের মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে।

সুকুমারেব সর্বশেষ নাট্যরচনা 'মামাগো!' প্রকাশিত হয় ১৩২৭ বঙ্গাব্দের চৈত্রে। এটি একটিমাত্র দৃশ্যে গ্রথিত এবং ক্ষুদ্রায়তন। ধূমকেতুর আবির্ভাবে পৃথিবী ধ্বংসের ভাবী পরিণতির চিন্তায় কাতর বালক কিভাবে তার মামার দ্বারা সেই কাতরতা দূর করতে পেয়েছিল, তারই এক কৌতুকাশ্রিত বিষয় হল 'মামাগো!' প্রহসনের বিষয়। প্রহসনটি নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু সুকুমারের কৌতুক স্নিগ্ধ মানসিকতার প্রকাশে প্রহসনটির বঞ্চিত নয়।

সুকুমার রায় নাটকগুলি হাস্যরসাশ্রিত। বাংলা নাট্যসাহিত্যে প্রহসনের বড়ো অভাব। যথার্থ হাস্যরস পরিবেশনেও প্রহসন লেখকরা অসময় সার্থক হননি। সেই দিক থেকে বলা যায় রবীন্দ্রনাথের

পর যথার্থ প্রহসনকার হলেন সুকুমার রায়। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে সুকুমার রায়ের নাট্যসমগ্র আলোচিত হয়নি। এ বড়ো ক্ষোভের কথা। অথচ আশ্চর্য তাঁর নাটকে প্রধানত ভাষাকে অবলম্বন করেই হাস্যরস পরিবেশন করেছেন। তাঁর সুযোগ্য পুত্র সত্যজিৎ রায় সমগ্র শিশু সাহিত্য সুকুমার গ্রন্থের ভূমিকায় সেকথা স্বীকার করেছিলেন। বাঙালীর জীবন থেকে হাসি মুখে যাচ্ছে। তার জন্য মানসিক স্বাস্থ্যের স্ফীতি ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। এর একমাত্র প্রতি-বিধান সুকুমার রায়ের নাট্যরচনার প্রতি আরো অধিকভাবে মনো-যোগী আকমণ আরোপ করা। নাট্যকার অভিনেতা ও প্রযোজক সুকুমার রায়ের যথার্থ স্বরূপ আজো উদ্‌ঘাটনের অপেক্ষায়।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়, সুকুমার রায়ের নাটকের সংলাপের ভাষা যেমন শাণিত তেমনি মার্জিত।

এই ভাষার আদর্শ রবীন্দ্রনাথের প্রহসনের সংলাপের ভাষার ইশারা দেয়।

তাঁর ভাষা ব্যঙ্গনিপুনও।

শব্দের অন্তর্ভেদী তাৎপর্যকে তিনি উদ্‌ঘাটন করতে চান।

সেখানেই তাঁর হাস্যরসের স্বরূপ ধরা পড়ে।

আরো একটি লক্ষণীয় বিষয়, তাঁর নাট্যরচনাগুলি স্ত্রীভূমিকাবর্জিত।

পুরুষের আড্ডার আসরে অভিনয়ের উদ্দেশ্যে রচিত বলেই বোধ হয় স্ত্রীভূমিকার কথা তিনি ভাবেননি।

তাছাড়া হয়ত, ধর্ম রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি, বিজ্ঞান ভাবনা, কুসংস্কার, অন্ধ গোঁড়ামি প্রভৃতি পুরুষশাসিত সমাজের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি লোকচক্ষুর সম্মুখে তুলে ধরার জন্য তাঁর নাট্যপ্রয়াস।

তাঁর নাট্যভাবনা যথেষ্ট অনুশীলনের অপেক্ষা রাখে। কেননা তাতে মিশে রয়েছে ছেলেমি রচনার আদর্শ। যে কলমে তিনি 'আবোল তাবোল' লেখেন, সেই কলমেই রচিত হয় তাঁর নাটক।

'আবোল তাবোল'-এর কবিতাগুলিতে যা ইঙ্গিতে ব্যক্ত হয়েছে তাঁর নাটকে তারই বিশ্লেষিত রূপায়ণ।

এই রূপায়ণকর্মে তিনি আন্তরিক।

নাট্যক্রিয়ার উপস্থাপনেও তাঁর আন্তবিকতা অদৃশ্য নয়।

উল্লেখপঞ্জী

১। ছেলেমি রচনা ও সুকুমার রায়/সুকুমার সেন ; দেশ পত্রিকা সুকুমার রায় স্মরণ সংখ্যা, ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬।

২। ববীন্দ্রনাথের তরুণবন্ধু'পার্থ বসু, ঐ

৩। সুকুমার রায় ও ব্রাহ্মসমাজ দিলীপকুমার বিশ্বাস, ঐ

৪। ভূমিকা—সমগ্র শিশু সাহিত্য সুকুমার রায়/সত্যজিৎ রায়/ আনন্দ পাবলিশার্স ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ।

৫। খেয়াল রসের ছবি/প্রণবরঞ্জন রায়, দেশ পত্রিকা সুকুমার রায় স্মরণসংখ্যা ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬।

সুকুমার রায়-এর সাহিত্যিক মানস

তারক ভড়

'ঠাস্ ঠাস্ দ্রুম দ্রাম, শুনে লাগে খটকা— ফুল ফোটে? তাই বল আমি ভাবি—' বস্তুত এ রকম ভাবনাই সুকুমার রায়কে তাঁর স্বল্প নশ্বর জীবন থেকে আজো আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কাছে অমর করে রেখেছে। যে কথা আধুনিক কবিতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি বার বার বলেছি এবং বিভিন্ন লেখাতেও জানিয়েছি—শব্দের ওজন, ভার, গুরুত্ব, প্রয়োগ শব্দের বেজে ওঠার ক্ষমতা ধরতে পারা এবং প্রয়োগ-বৈচিত্র্যে শব্দকে বাজিয়ে তোলার ক্ষমতা—আসল কথা, সংগীতে যেমন তাল-মান-লয়, কবিতার ক্ষেত্রেও শব্দের তাল-মান-লয়কে ধরতে পারা—এক মহৎ কবি-মানসের পরিচায়ক। এই দিকে সুকুমার রায়ের কবি-মানস যে কত বিরাট, ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। হুড়মুড় ধুপ্ধাপ্—ওকি শুনি—' কিন্তু তালের যাদুতে আমাদের কানে এ রকম সব কাটখোট্টা শব্দকে কেমন অবলীলায় ভাসিয়ে জলতরংগের আওয়াজে পৌঁছে দিয়েছেন উনি।

আমরা কথায় কথায় ছন্দের যাদুকর হিসেবে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-র নাম উল্লেখ করি। সত্যেন্দ্রনাথ অবশ্যই ছন্দের কারিগর। কিন্তু— 'বলছিলাম কি, বস্তুপিণ্ড সূক্ষ্ম হতে স্থূলেতে,/ অর্থাৎ কিনা লাগ্ছে ঠেলা পঞ্চভূতের মূলেতে— গোড়ায় তবে দেখতে হবে কোত্থেকে আর কি ক'রে, রস জমে এই প্রপঞ্চময় বিশ্বতরুর শিকড়ে।—(বুঝিয়ে বলা) অথবা 'বিদ্ঘুটে জানোয়ার কিমাকার কিম্ভূত, সারাদিন ধরে তার শুনি শুধু খুঁৎ খুঁৎ। মাঠপারে ঘাটপারে কেঁদে মরে খালি সে, ঘ্যান ঘ্যানে আবদেরে ঘন ঘন নালিশে।'—(কিম্ভূত)—ইত্যাকার অকাব্যিক শব্দের পর পর এতগুলি প্রয়োগে এত সুন্দর ছন্দ সৃষ্টির প্রয়াস, সারা সত্যেন্দ্রনাথে অন্ততঃ আমার চোখে পড়েনি অথচ এ রকম দৃষ্টান্ত সুকুমার রায়ে হর-হমেশা ছড়িয়ে আছে। 'রোদে রাঙা

ইটের পাঁজা তার উপরে বসল রাজা— ঠোঙাভরা বাদামভাজা খাচ্ছে কিন্তু গিলছে না।,—(নেড়া বেলতলায় যায় কবার ?)—কি অদ্ভুত শব্দপ্রয়োগ চাতুর্য, একটু লক্ষ্য করলেই যে কোন মানুষ অবাক হয়ে যেতে বাধ্য। অবশ্য অনেক বুদ্ধিমান বোধ্যাই এখানে কৈফিয়ৎ খাড়া করবেন যে, সুকুমার রায়ের এগুলি 'ছড়া'। ছড়ার শব্দ নিয়ে খেলার যে সুযোগ আছে—কবিতায় প্রতিটি শব্দকে গভীরতর অর্থ দেওয়ার জন্য সে সুযোগের অবকাশ অনেক কম। আমি বলি- -নিশ্চয় কম। তার মানে এই নয় যে, সে সুযোগ একেবারেই নেই! কিন্তু আমরা এই সুযোগকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করি কজন! আসলে যে বোধ ও বোধর ব্যাপকতা কবিকে এখান থেকে সফলতার দিকে হাঁটাবে - সুকুমার রায়-এ তা ছিল অনায়াসলব্ধ। আর আমরা এত আয়েসি যে, সে দিকটা চিন্তা কবার অবকাশও আমাদের মধ্যে প্রকটিত হচ্ছে না। কবিতার কথা বলতে গেলেও সুকুমার রায়কে পিছনে ফেলা সহজ বলে মনে করি না। 'বিদ্‌ঘুটে বাত্তিরে ঘুট্‌ঘুটে ফাঁকা, গাছপালা মিশ্‌মিশে মখ্‌মলে ঢাকা। জটবাঁধা ঝুলকালো বটগাছ তলে, ধক্‌ধক্ জোনাকীর চক্‌মকি জ্বলে, চুপ্‌চাপ্ চারিদিকে ঝোপঝাড়গুলো—' (হুলোর গান) কাব্যগুণ কিছুমাত্র কম মনে করি না। বরং কাব্য তৈরীতে যথেষ্ট মুন্সিয়ানা না থাকলে এ রকম কাব্য রচনা থমকে পড়তে বাধ্য। এমনই যখন দেখি উনি বলেন— বৃদ্ধ বছর উধাও হল ভূতের মুলুক খুজি'—(মনেব মতন) ছড়ার এমন সব বাক্যে কাব্যগুন সম্পন্ন সুষমা তৈরীতে সুকুমার রায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত। অথচ সুকুমার রায়ের লেখায় ছন্দের যাদু এবং কাব্যগুণ নিয়ে আলোচনা খুব একটা চোখে পড়ে না।

এখানে সুকুমার রায়ের জীবন সম্পর্কে একটু আলোচনা প্রাসঙ্গিক মনে করি। ১৮৮৭-র সেই ছেলেটি ১৯১১ সালে রসায়ণ এবং পদার্থ-বিজ্ঞান—ছু'টি বিষয়ে অনার্স নিয়ে সসম্মানে বি.-এস.-সি. পাশ করে বিলেত চলে গেলেন। ওখানে মুদ্রনশিল্পে বিশেষ করে 'হাফ্‌টোন্ ব্লক'-এর বিষয় বেশ পারদর্শী হয়ে উঠলেন এবং এ কাজে খুব গভীর

ভাবে লক্ষ্য করলেন যে সন্নিবেশের কায়দায় সূক্ষ্ম আর মোটা বিন্দুতে কেমন ফুটে উঠছে অবয়ব। বিজ্ঞানের এরকম সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গিকে অনায়াসলব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লেখার কাজে লাগিয়েছেন সুকুমার বায়। এর সঙ্গে 'ফ্যামিলি ট্রাডিশন' তাঁকে লেখার এবং বিধ মননে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। পরিবেশ মানুষকে যে অনেকখানি তৈরী করে দেয়, সুকুমার বায় তার একটি জলজ্যান্ত বড় প্রমান। এখানে অবশ্যই বলে নিতে হয় যে, সুকুমার রায়ের পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায় যাঁর বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় তাঁর লেখায় গানে ছবিতে আর মুদ্রনের কাজে ছড়িয়ে আছে। বিজ্ঞান ও শিল্পের, প্রাচ্য ও প্রাতীচ্যের আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছিল উপেন্দ্রকিশোরেব মধ্যে। বেহালার পাশে পাশে পাখোয়াজ বাজিয়েছেন তিনি, ব্রাহ্ম-সংগীত রচনার সংগে সংগে মুদ্রণেব কাজে মৌলিক গবেষণা চালিয়েছেন, রাত্রে বাড়ির ছাদে বসে দূরবীণ চোখে দিয়ে আকাশের তারা দেখেছেন, অনন্যুকরণীয় সুষমামণ্ডিত সহজ ভাষায় পৌরাণিক কাহিনী ও গ্রাম্য উপকথা নূতন করে লিখেছেন ছোটদের জন্য, আর সেই সংগে খাস বিলিতি কায়দায় তেল-রঙ জল-রঙ ও কালি-কলমে ছবি এঁকেছেন। ইলাস্ট্রেটর হিসেবে উপেন্দ্রকিশোরের কাজে যে দক্ষতা ও রীতিবৈচিত্র দেখা যায় তাব তুলনা ভারতবর্ষে নেই।—এ হেন পিতার সস্নেহ সান্নিধ্যে মানুষ হয়েছিলেন সুকুমার।—(সত্যজিৎ রায়/ভূমিকা—আনন্দ পাবলিসার্সের সমগ্র শিশু সাহিত্য সুকুমার রায়)। এই উদ্ধৃতিটি সুকুমার রায়ের লেখার মানসিকতা তৈরীতে পরিবেশের যথেষ্ট সহায়তা এবং লেখার মানসিক প্রস্তুতি বুঝতে যথেষ্ট সাহায্য করবে মনে করি।

আবার ফিরে আসি সুকুমার রায়ের লেখায়। যেহেতু ছড়ার জগতেই আমরা ওঁকে স্বরাট সম্রাট করে রেখেছি. যেহেতু শতবর্ষের আলোতে সুকুকার রায় আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন অদ্বিতীয় ছড়াকার হিসেবে—ছড়া সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক আরো কিছু আলোচনা প্রয়োজন বোধ করি। আমরা বিদেশী কিছু ছড়ায়, বিশেষ করে লিয়রের লিমেরিকে বেশ কিছু উদ্ভট প্রাণীর আনাগোনা দেখতে পাই। কিন্তু

এইসব প্রাণী সর্বাংশেই উদ্ভট। এমন কি আমাদের চিন্তার জগতেও সে সব প্রাণী কোন বাস্তব 'সেপ্' না নিয়ে এক ভাসা ভাসা উদ্ভট ছবির কল্পনা করায়। অথচ সুকুমার রায়ের হাঁসজারু, বকচ্ছপ, মোরগরু গিবগিটিয়া, সিংহরিণ, হাতিমি ট্যাশগরু, কুমড়োপটাশ, কিম্ভূত, বামগরুড়ের ছানা, হুঁকোমুখো—সবই যেন আমাদের আয়ত্তাধীন। শুধু ছড়াতেই নয়, সুকুমার রায় তাঁর গল্পেও আমদানি করেছেন হ্যাংগোথেরিয়াম, ল্যাগব্যাগর্নিশ, গোম্‌ড়াথেরিয়াম, বেচারাথেরিয়াম, চিল্লানোসোরাস, ল্যাংড়াথেরিয়াম-এর মত সব অদ্ভুত প্রাণী (হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরী)। অথচ গল্পে এইসব প্রাণীকে আমাদের আদৌ অন্য জগতের অচেনা জীব বলে মনে হয়নি। আসল কথা, সত্যকার শক্তিশালী সাহিত্যিকের হাতে এগুলি খুবই বিশ্বাস-যোগ্য হয়ে আমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে। এখানে আমাদের পৌরাণিত দেবতা গণেশ গ্রীক দেবতা জুপিটার—এমনি সব পৌরাণিক অদ্ভুতদর্শণে দেবতাদের শারিরীক গঠনবৈচিত্র্য সুকুমার রায়ের মাথায় প্রবল প্রেরণা জুগিয়েছে মনে করি। আর একাজে তিনি আজও সাবলীল ও সুন্দর হয়ে উঠতে পেরেছেন তাঁর বিজ্ঞানশিক্ষার জন্য। চলতি ব্যাকরণ তিনি না মানলেও অর্থাৎ সন্ধির সূত্র মেনে না চললেও উৎশৃঙ্খল হয়ে উঠতে পারেননি। তাঁকে করতে হয়েছে হাতির সংগে তিমির মিল (তি+তি), এখানে তিনি সিংহের সাথে বানর বা ডাল্লুক না মিলিয়ে হরিণ-ই মিলিয়েছেন (হ+হ)। ফভাবে খুব সুন্দর এবং প্রাঞ্জল সূত্র তিনি মেনে চলেছেন সর্বত্র। অস্বীকার করার উপায় নেই যে কল্পনা শক্তিকে আট-ঘোড়ার রথে চড়িয়ে ছুটিযে নিয়ে যাওয়া নয়, রকেটে চড়িয়ে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা থাকলে তবেই 'হট্টমেলার দেশ'-কে 'গাছ' বানানো সম্ভব।

এ বিষয়ে অবশ্য আরও একটি কথা বলা প্রয়োজন। তিনি যত-গুলি অদ্ভুত প্রানী শব্দে তৈরী করেছেন, রেখার চিহ্নেও ফুটিয়ে তুলেছেন সেগুলিকে। এতেই সুকুমার রায় সৃষ্ট এইসব কিম্ভূত

কিমাকার প্রানীগুলি আরো বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে আমাদের চোখে এবং মনে। আসল কথা, যে কোন কিছুকেই বিশ্বাসযোগ্য করে উপস্থাপনা শিল্পে সবচেয়ে বড় কথা এবং শিল্পীর সবচেয়ে বড় গুণও বটে। স্কুমাব বায়েব মধ্যে এই গুণ আমরা সর্বৈব ভাবেই প্রত্যক্ষ কবি। প্রতিভাধর না হলে মাত্র ৩৫/৩৬ বছবেব জীবনে মানুষের মনে এরকম ছাপ রেখে আজো বেঁচে থাকা একেবারেই অসম্ভব, একথা আমি খুব প্রত্যযেব সাথেই বলতে পারি।

সুকুমার রায়

প্রেমেন্দ্র মিত্র

বাংলা কিশোর ও শিশুসাহিত্যে এক সুন্দব আব আশ্চর্য নাম সুকুমাব বায়।

তিনি নিজেব নামের মধ্যেই অমর হয়ে আছেন মানুষের মনেব মন্দিরে।

একটা আশ্চর্য শক্তির অধিকারী ছিলেন তিনি, তাই তাঁর সাহিত্য আমাদেব কাছে কোনদিনই পুবনো হবে না।

আমরা স্থির নিশ্চিন্ত যে সুকুমার তাঁর ছড়া, গল্প নাটকেব মধ্যে একটা নতুন চিন্তাধারাকে বহন কবে এনেছিলেন যা কাল থেকে কালে অক্ষয় অমর হয়েছে।

আরও উজ্জ্বল হয়ে, বিকশিত হতে দেবি করেনি।

সুকুমার সাহিত্যেব বৈশিষ্ট্য এখানেই।

আজ তাঁব জন্মশতবষ—এই শুভ জন্ম দিনে এ' দেশেব ও সর্ব-কালের কিশোর ও শিশুদেব কাছে তিনি শুধু ছড়াকার হিসাবেই সমাদৃত হবেন না তিনি একজন অনন্য সাধাবণ লেখ৷ ও বেখাব যুগ প্রবর্তক হয়ে রইবেন তাদের মনে।

আমরা যারা এতদিন বাংলা সাহিত্যের কমলবণে শতদল ফোটাতে গিয়েও সুন্দর হতে সুন্দরতম হবার স্বপ্ন দেখেছি—সুকুমার সেই স্বপ্নের রাজার দেশে এক আশ্চর্য যাদুকর।

তিনি এ যুগের শিশু ও কিশোরদের রূপকথার রাজপুত্রের মত এক অপূর্ব মায়াজাল সৃষ্টি করেছেন যার স্বার্থকতায় পরিণত হয়েছেন তিনি স্বয়ং।

আজ তার জন্মদিনে এই কথা ছাড়া আর নতুন কথা কি আর বলতে পারি?

খেয়াল রসের ছবি

প্রণবরঞ্জন রায়

॥ ১ ॥

লিখতে শেখার বহু আগে থেকে মানুষ ছবি আঁকছে। পড়তে শেখার আগে থেকে ছবি দেখছে। বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ, বিবরণের বিশদ বাদ দিয়ে তার উপর রঙিন কল্পনার রসান চড়িয়ে বর্ণনা (বিবরণ + বর্ণ = বর্ণনা), বর্ণনায় কল্পনা-ভাবনার মিশাল দিয়ে কাহিনী, আর পুরা ঘটনা বর্ণনের কালে নীতিকথার যোগাযোগ ঘটিয়ে পুরাণ১ লিপিবদ্ধ করতে পারার অনেক আগে থেকে মানুষ বিম্বের সঙ্গে বিম্ব২ যোগে, রূপকল্পের সঙ্গে রূপকল্প সাজিয়ে দৃশ্যবর্ণনা করেছে ; দৃশ্যকাহিনী নির্মাণ করেছে। মুখে মুখে ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে, দৃশ্যের বর্ণনা করতে করতে, কাহিনী বলতে গিয়ে কথাকার, কক্তা, প্রতিবেদক ছবির পরে ছবি বলেছেন। তা শুনতে শুনতে শ্রোতা মনের চোখে ছবির পরে ছবি দেখেছেন। সে-সব ছবি পাথরে খোদাই করে, এঁকে ধরে রাখার চেষ্টায় সৃষ্ট হয়েছে ভারহুত, সাঁচীর রিলিফ, অজান্তার ছবির মতন সব দৃশ্যকাহিনী।

কিন্তু বিবরণ দেওয়া বর্ণনা করা, কাহিনী বলা ইত্যাদি ছবির, রিলিফ ভাস্কর্যের অন্যতম কাজ হলেও, ভাল শিল্পকর্মের একমাত্র অথবা মূল কাজ কখনও ছিল না। গুহাবাসী প্রাগৈতিহাসিক মানুষ যখন বিম্বের পরে বিম্ব সাজিয়ে বাইসন বা হরিণ শিকারের বর্ণনা সুচতুর-ভাবে দৃশ্যায়িত করেছে, তখন তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, অঙ্কন কর্ম দিয়ে আসল শিকারের এক সমান্তরাল অথচ বিকল্প ক্রিয়া করা। সে বিশ্বাস করত এই সমান্তরাল-বিকল্প ক্রিয়া তার আসল কাজের সহায়তা করবে। এই সমান্তরাল-বিকল্প ক্রিয়াটি কিন্তু গোষ্ঠীর সব মানুষ যৌথভাবে করত না। করত কয়েকজন বিশেষ অধিকারী। আর অন্য সবাই ভয়মিশ্রিত বিস্ময়ে, শ্রদ্ধায় সে-বিশেষ ক্রিয়া-কর্ম অবলোকন করত। শিকারের বর্ণনামূলক দৃশ্য সবাই যেমন সহজ-

বুদ্ধিতে বুঝতে পারত, তেমনই যে-ছবি রহস্যময়ভাবে সত্যকার শিকারের সহায়ক হয়ে ওঠে—প্রাগিতিহাসিক মানুষ তাকে সসম্ভ্রমে উঁচু বেদীতে বসিয়েছে। আগে মানুষ খেলনা বানিয়েছে। পুতুল বানানোর বিশেষ কৌশলকে অধিকারী লোকেরা ধ্যান-ধারণা ভাবনা-কল্পনাকে মূর্ত করার কাজে লাগিয়ে গড়লেন মূর্তি। নির্মিত রূপকল্প পূজ্যবস্তুতে ও রূপান্তরিত হল। খেলার জিনিস সম্ভ্রমের জিনিসে পরিণত হল। দুই-ই শিল্পবস্তু. একটি সহজবোধ্য কাছের জিনিস অপরটি খানিকটা রহস্যময় সম্ভ্রমের বস্তু, দূরের জিনিস।

তবু, সম্ভ্রম-উদ্রেককর শিল্পবস্তু আর কাহিনীসম্ভব কাছের শিল্পবস্তুর বিচ্ছেদ কখনও সম্ভব হয়নি (কথাটা বোধ হয় সম্পূর্ণ ঠিক নয়। আধুনিক কালের সম্পূর্ণভাবে ধর্মসম্পর্কহীন শিল্পকর্মও অত্যন্ত দূরের, সম্ভ্রমের, বিস্ময়ের বস্তু হয়ে গিয়েছে। তবে, সে অন্য আলোচনা, এখানে অবান্তর।) কারণ, পুরাণকাহিনী পূজ্য বিষয়ে সহজভাবে কথা বলে লোককে কাছে টেনে নিয়েছে। একদিকে, সম্মানীয় পূজ্য শিল্পবস্তু যেমন ইঙ্গিতে-সংকেতে গভীরভাবে অনুভব সঞ্চার করেছে, অন্যদিকে তেমনই বর্ণনাত্মক কাহিনী কল্পনাকে উসকে দিয়ে গভীরের ব্যঞ্জনা সঞ্চার করেছে; কেবল ভিন্ন উপায়ে। তবুও, কাহিনী বর্ণনায় বিশদ বিবরণ, আর তার সঙ্গে অবান্তর বিশদ, যত বেশী জায়গা পেয়েছে, গল্পে ঘটনার বিবরণ যত জাঁকিয়ে বসেছে, শিল্পবস্তু ততই তার বিস্ময় আর সম্ভ্রম জাগানোর ক্ষমতা হারিয়েছে। আবার উল্টো দিকে, বর্ণনাত্মক কাহিনী যতই অবান্তর বিশদের বিবরণ বাদ দিয়েছে, যতই তাতে চিহ্ন, সংকেত, ইঙ্গিতের ব্যবহার বেড়েছে, যতই তাতে ভাবনা-কল্পনার রসান চড়েছে, ততই শিল্পবস্তু বিস্ময়ের হয়ে উঠেছে, সম্ভ্রমের দাবীদার হয়েছে। দৃশ্যশিল্পে এই দুই বিপরীতমুখী প্রবণতা চিরকালের।

আজকাল 'ছবি' আর ইলাস্ট্রেশন'-এর যে পার্থক্য করা হয়, তা হালফিলের ব্যাপার। তফাত যেটা আগেও ছিল আর এখনও আছে সেটা মূলগত নয়, গুণগত মাত্র। ছবি যেখানে একান্তভাবে লিখিত

উপর নির্ভরশীল তা' ইলাস্ট্রেশন হলেও নিকৃষ্ট ইলাস্ট্রেশন। সেখানে লিখিত শব্দের সাহায্য ছাড়া ছবির মর্মোদ্ধার করা যায় না। নীচ মানের অন্য ধরনের ইলাস্ট্রেশন আছে যেখানে ছবি বিম্বেব ক্রম সাজিয়ে শুধু ঘটনার বিবরণ দেয মাত্র, তার বেশী কিছু করে না। উৎকৃষ্ট বর্ণনাত্মক ছবি কিন্তু শুধুমাত্র ঘটনার বিবরণ দেয় না। অনুভব সঞ্চার করে। ইঙ্গিতে সংকেতে কল্পনাকে উসকে দেয়। ভাবায়,চিন্তার খোরাক জোগায়।উৎকৃষ্ট বর্ণাত্মক ছবি, লিখিত বা মৌখিক কাহিনীর সাহায্য ছাড়াই কাহিনী বর্ণনা করতে পারে। পারে লিখিত শব্দে বা মুখের বর্ণনায় নতুন অনুভবের মাত্রা যোগ করতে। পারে সম্ভ্রম আদায় করে নিতে। অর্থাৎ ছবির ছবি হয়ে উঠতে গেলেই তার বর্ণনাত্মক সত্তাকে বাদ দিতে হবে এমন কোন কথা নেই।

আদিম-প্রাচীন মৌখিক কাহিনী, আখ্যান, উপাখ্যান, পুরাণ-ভিত্তিক দৃশ্যকাহিনী বা ধর্মসম্বন্ধীয় লিখিত বা মৌখিক পুরাণনির্ভর সব দৃশ্যকাহিনীই দেয়াল বা গুহার গায়ে আঁকা হত অথবা রিলিফ হিসাবে উৎকীর্ণ হত। সাঁচী, ভারহুতের রিলিফ, অজন্তার ভিত্তিচিত্র এ-সবই বৌদ্ধ জাতকের কাহিনীর ভিত্তিতে রচিত। কিন্তু এসব স্বনির্ভব দৃশ্যকাহিনী শুধুমাত্র পুরাঘটনার বিবরণ দেয় না। শুধু পূজ্য বিষয়ের কথা বলে না। ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ বর্ণনার ফাঁকে ইঙ্গিতে-সংকেতে অনুভব সঞ্চার করে। দৃশ্যশিল্পের দুই বিপরীতমুখী প্রবণতা এসে এক জায়গায় মিলে যায়।

ছাপা শুরু হবার আগে পর্যন্ত পুঁথি আর পুস্তক তৈরীহত শুধুপাঠক্ষম বিত্তশালী ক্ষমতাশালী ও পদমর্যাদাসম্পন্ন পাঠকের আদেশে, মুষ্টিমেয় পাঠকের জন্য। এসব পুঁথি-পুস্তক তৈরীর আদিকাল থেকেই সেগুলি নকশাদ্বারা অলঙ্কৃত এবং/অথবা বিম্ব সমাহারে রচিত চিত্রশোভিত হতে দেখা যায় ৪। শুধু নকশা দিয়ে অলঙ্কৃত পুঁথি বা পুস্তক অবশ্য সংখ্যায় ততো বেশী কখনই হত না যত হত নকশা এবং বিম্বদ্বারা অলঙ্কৃত ইলিউমিনেটেড ম্যানুস্ক্রিপ্ট। ইলাস্ট্রেটেড ম্যানুস্ক্রিপ্ট বা বিম্বসমাহারে রচিত চিত্রিত পুঁথি ও পুস্তক আবার দু'ধরনের হত।

অষ্টসহস্রিকা প্রজ্ঞাপাবমিতা-র মতন পালযুগের পুঁথি বা গুজরাতের জৈন কল্পসূত্র-র মতন দর্শন বিষয়ক প্রাচীন পুঁথিতে বিম্বসহকারে যে সব ছবি দেখা যায় তা দূরতম অর্থে মাত্র পুঁথিতে লিখিত বক্তব্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। ছবি স্বাধীন ও স্বনির্ভব। কল্পসূত্রের ছবিব যদিও বা খানিকটা বর্ণনাত্মক ভঙ্গি থেকে থাকে, অষ্টসহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতাতে তো তা'ও না। সেখানে বিম্ব তো ধ্যানের, ধারণার ১র্তরূপ। ম্যানুস্ক্রিপ্টেব ইলাষ্ট্রেশন এখানে বিস্ময় ও সম্ভ্রম উদ্রেককব পূজ্যবস্তু। অন্যদিকে, তুর্কো-আফগান সুলতানী আমলের জৌনপুরের শিল্পীরা যখন চৌরপঞ্চাশিবাব মতন অশাস্ত্রীয় গ্রন্থ সুচিত্রণ কবেছেন, তখন ছবি লিখিত বর্ণনাকে অনুসবণ করলেও লেখা বর্ণনায় নতুন মাত্রা যোগ কবেছে এবং লিখিত বর্ণনাব সাহায্য ছাড়াও কাহিনীব খানিকটা স্বাদ দিতে পেবেছে ও স্বনির্ভব ছবি হিসাবে উপভোগ্য হযেছে। মধ্য যুগেব পাবসীকবা আব মুঘল আমলেব ভাবতীয় চিত্রকববা গ্রন্থচিত্রকে এমন একটা স্বযংসম্পূর্ণতা দিলেন যে দৃশ্যায়িত কাহিনী বা বর্ণনা অনুধাবন করাব জন্য লিখিত কাহিনীব সাহায্য নেবাব কোন প্রয়োজনই বইল না। এক একটি ছবি একটি স্বযংসম্পূর্ণ বর্ণনাত্মক উপাখ্যান হয়ে উঠলো। শুধ ছবিব পর ছবি সাজিয়ে, উপাখ্যনেব পর উপাখ্যান জুড়ে এক একটি আখান মূলক দৃশ্যকাহিনীব গ্রন্থ গ্রথিত হল। নিবক্ষব আকবরের দেখার জন্য রচিত চিত্রমহাভারতেব নামই যে শুধু পরিবর্তিত হয়ে বজমনামা হল তা' নয়, মহাভাবতেব ধর্মীয় অনুষঙ্গ সেখানে গৌণ হয়ে গিয়ে, তার বিপুলবিচিত্র কাহিনীসম্ভাব নতুন এক লৌকিক গবিমা লাভ করল। মুঘল ইহলৌকিকতার প্রভাবে রাজপুত রাজাদের নির্দেশে চিত্রিত গীতগোবিন্দম্-এব ছবিতে অলৌকিক সম্ভ্রম-উদ্রেককর ভক্তি ভাবের উপর লৌকিক প্রেম, কাম, কাব্যরস প্রাধান্য পেল, কাহিনী বর্ণনা তো রইলই।

পারসীক শাহ্নামা, সুলতানী অমলের চৌরপঞ্চাশিকা, মুঘল দরবারে আঁকা হামজানামা, আনওয়ার-এ সুহাহিলি, মেবার অথবা

কাংড়া রাজন্যদের জন্য সৃষ্ট গীতগোবিন্দম্ ইত্যাদি সচিত্রিত পুঁথির ছবির রসগ্রহণের জন্য এসব কাব্য-কাহিনীর প্রাকপরিচয় একান্ত আবশ্যিক নয়, তার কারণ চিত্রিত দৃশ্যকাহিনী চিত্রগুণসমৃদ্ধ হবার কারণে অন্য নিরপেক্ষ ও স্বনির্ভর।

যে-পুঁথি-পুস্তক-গ্রন্থ-কবিতাব ছিল মুষ্টিমেয়র জন্য, ছাপাই এসে সেসবকেই সর্বসাধারণ লভ্য করে তুললো। কি চীন দেশ, কোরিয়া কিংবা জাপান, অর্থাৎ যে-সব দেশে ছাপার উদ্ভাবন ও প্রচলন আগে হয়,এবং মহাদেশীয় ইউরোপে,লিপি ছাপাই শুরু হবার আগেই ছবি ছাপাই আরম্ভ হয়। ছবি-বাহিত বক্তব্য যাতে অধিকাংশ নিরক্ষরসহ বহুলোকের কাছে পৌঁছয় তার জন্য কাঠখোদাই করে ছবি ছাপা শুরু হল। লিপি ছাপা আরম্ভ হবার আগে ছবি ছাপার প্রচলন হবার ফলে, ইয়োরোপে অন্তত, লেখার সঙ্গে ছবি আর লেখা অনুসারী ছবি ছাপাইয়ের আগেই স্বনির্ভর পাতাজোড়া ছবি ছাপাই আরম্ভ হয় এবং পরবর্তী সময়ে লেখা অনুসারী ছবি ছাপাইয়ের পাশাপাশি স্বনির্ভর ছাপাই ছবি রচনা চলতে থাকে।
রিলিফ পদ্ধতিতে খোদাই করা কাঠের ব্লক থেকে ছবি ছাপার রীতি তো থাকলই। ধাতুপাতেব উপর তক্ষণ করে, ধাতুপাতকে অ্যাসিডে খাইয়ে ইনতাল্লিও পদ্ধতিতে ছাপ নেবার পদ্ধতি আবিষ্কার হবার পর লিপি-সহায়তাবিহীন পাতাজোড়া স্বনির্ভর ছাপাই ছবি ক্রমশ হাতে আঁকা ছবির সমান মর্যাদা লাভ করে এবং ধীরে ধীরে সম্মানিত শিল্পে পরিণত হয়। তথাপি, বহুজনের জন্য রচিত হবার কারণে হাতে-তৈরী মাত্রিকা থেকে হাতে-নেওযা ছাপাই ছবি মূলত বর্ণনাধর্মী ও কাহিনীধর্মী হয়েই থেকে যায় (অবশ্য উডকাট, উড এনগ্রেভিং, মেটাল এনগ্রেভিং, এচিং ইত্যাদি মাধ্যমে সব দেশেই, বহু দেব-দেবী ও অন্যান্য পূজ্য বিষয়ের ছবি তৈরী কবা হয়েছে। তবে লোকে সেগুলিকে ছবি হিসাবে না-দেখে পূজ্য বস্তু হিসাবেই গ্রহণ করেছেন।)

. ফোটগ্রাফিক-যান্ত্রিক ছাপাই পদ্ধতি এসে, পুরনো অযান্ত্রিক

ছাপাই পদ্ধতিগুলি বাতিল করলে পরে, হাতে-ছাপা ছবির চরিত্র বদলে যায় ; হাতে আঁকা আর হাতে ছাপা ছবির বিষয়গত ও প্রকাশভঙ্গিগত পার্থক্য আর বিশেষ কিছুই থাকে না। তবে, সে অনেক পরের কথা এবং আমাদের বিবেচ্য বিষয়ও নয়।

নবম শতকের চীনা, দশম শতকের কোরিয়ান, একাদশ শতকের জাপানী, পঞ্চদশ শতকের ইয়োরোপীয় আর উনবিংশ শতকের বাঙালী ছাপাই ছবির শিল্পীরা একটা সহজ সত্য ছাপাইয়ের সেই আদি কালেই উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন ছাপাই-ছবিকে ভাল করতে গেলে ছবিটাকে ছাপার উপযোগী করে ভাবতে হবে, মাধ্যমেই স্বাভাবিকধর্ম অনুযায়ী তৈরী করতে হবে। হাতে আঁকা ছবি করার ভাবনা, তৈরীর কারণ-কৌশল সেখানে অচল। তা'ছাড়া, যে বহুজনের মুখ চেয়ে ছবি ছাপাই প্রচলিত হয়েছিলো, সেই ইতরজন যাতে ছবির স্বাদগ্রহণ থেকে বঞ্চিত না হন, তার জন্য ছবিকে সহজগ্রাহ্য করার দায় স্বেচ্ছায় ঘাড়ে তুলে নিয়েছিলেন ড্যুয়েরের, লুকাচ ক্রানাক, রেমব্রাণ্ট-এর মতন দিকপাল শিল্পীরা। বর্ণনাধর্ম, আখ্যানধর্ম, কাহিনীধর্মের মধ্যেই তাঁরা খুঁজে পেয়েছিলেন সহজগ্রাহ্যতার চাবিকাঠি।

যতদিন কেবল রিলিফ আর ইন্‌তাল্লিও পদ্ধতিতে হাতে ছাপা ছবি তৈরি হত, ততদিন ছাপাই ছবির শিল্পীরা তাঁদের ছবি-পরিকল্পনায় মাধ্যমের গুণাগুণ সম্ভাবনা-সীমাবদ্ধতাকে অগ্রাধিকার দিতেন। ১৭৯৮ সালে লিথোগ্রাফির উদ্ভাবন এবং উনবিংশ শতকের প্রথম তিন দশকের মধ্যে তার সুপ্রতুল প্রচলন, অবস্থাটাকে বদলে দিলো। লিথোগ্রাফি করে যেহেতু যে-কোন মাধ্যমে আঁকা ছবিকে সহজেই ছাপা যায়, মুদ্রকরা সেহেতু ছাপাইয়ের এই নবতম মাধ্যমটিকে অন্য মাধ্যমে আঁকা ছবির কপি করার কাজে লাগালেন। ফলে এ-মাধ্যমের নিজস্ব চরিত্রানুযায়ী ছবি তৈরি হল বড় কম। অবশ্য, ওঁরে ছমিয়ের মতন শিল্পীও ছিলেন, যাঁরা অত সহজে ব্যাপারটা ছেড়ে দিলেন না। গগনেন্দ্রনাথও এই মাধ্যমেই শারীরিক

চরিত্র ও সাধারণগম্যতা সম্বন্ধে এতটাই ওয়াকিবহাল ছিলেন যে, তিনি তাঁর ব্যঙ্গচিত্রের প্রকাশ-মাধ্যম হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন লিথোগ্রাফকে।

উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকেই যান্ত্রিক-ফোটগ্রাফিক পদ্ধতিতে ছবি, নকশা ছাপার চেষ্টা শুরু হয়ে যায়। কি করে যে কোন মাধ্যমে আঁকা ছবি ছাপা যেতে পারে; কিভাবে মূল ছবির আলো-ছায়ার তারতম্য, ম্যাসের ঘনত্ব ও তলবিভাজনকে ছাপা ছবিতে টোনের দ্বারা প্রকাশ করা যায় অর্থাৎ কি কৌশলে টোনের তফাতকে ছাপে ধরা যায়; কি করে যে কোন মাপের ছোট কিংবা বড় নকশা কিংবা ছবিকে ছাপার প্রয়োজনে বড় কিংবা ছোট করে নেওয়া যায়; আর কিভাবে ছাপা ব্যাপারটাকে মাধ্যম নিরপেক্ষ করে তোলা যায়—এসব নিয়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হল গত শতকের শেষ পাদেই। পশ্চিম ইয়োরোপ আর মার্কিন দেশেব বাইরে আর একটি মাত্র দেশে এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা কথঞ্চিৎ অনুরণন সৃষ্টি করেছিল। না, দেশ বললে ভুল হবে, কারণ অনুরণন তুলেছিল একটি বিশাল দেশের একটি মানুষের চেতনায়।

আমাদের পরম সৌভাগ্য, ছবি ও নকশা ইত্যাদি ছাপার ফোটগ্রাফিক-যান্ত্রিক পদ্ধতি-প্রকরণ উদ্ভাবন প্রচেষ্টায় একজন শ্রুতকীর্তি বাঙালীর নাম জড়িত। ঊনবিংশ শতকের কলকাতার ব্রাহ্মসমাজভুক্ত বাঙালীরা যে কিছু কিছু মঙ্গলকর উদ্ভাবনী কাজকর্ম করার চেষ্টা করছিলেন, ছবি ছাপাই নিয়ে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর গবেষণাদি তার আরেকটি নিদর্শন। টোনের তারতম্যকে কি করে ছোট বড় ফুট্‌কি আর ফুট্‌কির সঙ্গে ফুটকির দূরত্ব ইতরবিশেষ করে ছাপাই ছবিতে ধরা যায় উপেন্দ্রকিশোর তাই হাতে-কলমে পরীক্ষা করে দেখিয়ে বিলেতের পেনরোজ অ্যানুয়ালে তাঁর গবেষণাপত্র প্রকাশ করলেন। তবে নিছক গবেষণাই তাঁর লক্ষ্য ছিল না। শিশু ও কিশোরদের শিক্ষাপদ্ধতিকে আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক করে তোলায় ছবির ভূমিকা যে কি অপরিমেয় চিত্রকর উপেন্দ্রকিশোর

সে সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। শিক্ষা প্রসারে ছাপা বইয়ের ভূমিকা কত গুরুত্বপূর্ণ তা ইউ, রায় এণ্ড সন্স নামে প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রকিশোর যত ভাল জানতেন তা তাঁর সমসাময়িক খুব কম লোকই জানতেন। শিক্ষাবিদ্, শিশুসাহিত্যিক, শিল্পী, মুদ্রাকর উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীব ছবি-ছাছাই নিয়ে গবেষণাদির মূল উদ্দেশ্য ছিল—সুলিখিত, সুমুদ্রিত, সচিত্র, আকর্ষণীয় বইয়েব সাহায্যে অপ্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক শিক্ষাব প্রসার ঘটানো। আর সেই উদ্দেশ্য নিয়েই ১৯১৩ সালে তিনি ছোটদের জন্য সন্দেশ পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করেন। পরিকল্পনায় এবং চরিত্রে যে-কোন ভারতীয় ভাষায় অভূতপূর্ব এই সন্দেশ। শিশু-সাহিত্যিক, চিত্র-শিল্পী ও হাস্যরসশিল্পী হিসাবে সুকুমার রায়-এর সাধারণ্যে প্রকাশ এই সন্দেশ-এর পৃষ্ঠায়, পত্রিকার জন্ম বছরেই।

২ ॥

বালক সুকুমার ছেলেবেলায় পিতা উপেন্দ্রকিশোরকে নিশ্চয় ছবি আঁকতে দেখে থাকবেন। পরিবারের অন্যান্যদের মধ্যেও ছবি আঁকার চল ছিল। কিন্তু সুকুমার রায় ছেলেবেলায় নিজে ছবি মকশো করতেন কিনা জানা যায় না। অন্যদিকে, কিশোর বয়স থেকেই সুকুমার যে বিম্ব সৃষ্টিতে যন্ত্রের ভূমিকা সম্বন্ধে আগ্রহী তার সাক্ষ্য মেলে খুড়তুতো বোন লীলা মজুমদারের স্মৃতিচারণে। পিসেমশাই 'কুন্তলীন,-খ্যাত এচ সি বোসের দেখাদেখি সুকুমার ছোটবেলা থেকেই রীতিমত ফটোগ্রাফি চর্চা শুরু করেন। ছাপাখানা দোরগড়ায় থাকায় ছাপাব ক্রিয়াকৌশল তো সুকুমারের যৌবনের আগেই জানা হয়ে গিয়েছিল। প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করার পর রসায়নে আর পদার্থবিদ্যায় ডাবল অনার্স নিয়ে বি এস-সি পড়লেন প্রেসিডেন্সি কলেজে ; কলাবিদ্যা শিক্ষার দিকেই গেলেন না। ১৯০৬ সালে বি এস-সি অনার্স পাস করার ছ' বছর পরে বিলেত গেলেন, জলপানি নিয়েই। কিন্তু না, তত্ত্বগত বিজ্ঞান পড়তে নয়, এমন কি ফলিত রসায়ন বা ফলিত পদার্থবিদ্যা পড়তেও নয়। প্রথমে লণ্ডন

স্কুল অফ ফোটো এনগ্রেভিং অ্যাণ্ড লিথোগ্রাফি ও পরে ম্যান্‌চেস্টার স্কুল অফ টেক্‌নোলজিতে প্রিন্টিং টেক্‌নোলজি শিখলেন। ১৯১৩ সালে রয়েল ফোটগ্রাফিক সোসাইটির ফেলোশিপ নিয়ে দেশে ফিরলেন। অথচ, বিলেত যাবার আগে থেকেই যে তিনি ছবি আঁকতেন তাব সাক্ষ্য-প্রমাণ রযে গেছে ননসেন্স ক্লাবের নিমন্ত্রণ পত্রাদিতে আর ক্লাবের পত্রিকা সাড়ে বত্রিশ ভাজায় (পরিবারের সমবয়স্ক আর সমসাময়িক কলকাতার সমমনস্কদের নিয়ে তাতাবাবু—সুকুমার রায় কলেজ ছাড়ার অল্পকালের মধ্যেই এই ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।) স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, ছবি আঁকা শেখা, তার নিয়মিত চর্চার চেয়ে ছবি ছাপার যান্ত্রিক কলাকৌশল আয়ত্ত করা, ক্যামেরা যন্ত্র দিয়ে ছবি তৈরি করা ইত্যাদিকে সামাজিক ও বৈষয়িক দিক থেকে অধিকতর প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছিলেন সুকুমার রায়।

ছবি ব্যাপারটাকে সাহিত্যকর্মের মতন গুরুত্ব না দিলেও, রীতি-মত চচা ছাড়াই ছবি তিনি এঁকেছিলেন, ছবি তাঁকে আঁকতে হয়েছিল। রাতিমত শিক্ষা আর চর্চা থাকলে যে দুর্বলতাগুলি থাকত না, সেগুলি তাঁর ছবিতে তো চোখে পড়ে। সুকুমার রায়ের অধিকাংশ ছবিই ড্রইং অথবা স্কেচ। ওঁর টানা রেখা খুব সাবলীল না হওয়ায় অনেক সময় ড্রইং দুর্বল বলে মনে হয়। স্বশিক্ষিত হলেও উপেন্দ্রকিশোরের ড্রইং অনেক প্রত্যয়ী। কিন্তু প্রেরণা, ধারণার সচ্ছতা আর উদ্ভাবন শক্তি থাকলে করণকৌশলের ঘাটতি পুষিয়ে গিয়ে প্রাপ্তি অনেক বেশী হতে পারে সুকুমার রায়ের ছবি তার প্রমাণ।

১৯০৬-০৭-এর ননসেন্স ক্লাবের সময় থেকে শুরু করে ১৯২৩-এ মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সুকুমার রায় ছবি এঁকেছেন। কিন্তু ছবির জন্য ছবি কখনও আঁকেননি। লেখার সঙ্গে যাবার জন্য, লিখিত বক্তব্যের চাক্ষুষ রূপ দেবার জন্য লিখিত বক্তব্যকে সাহায্য করার জন্য আর লিপিকে একটু নকশার সাজে সাজাবার জন্যই ছবি এঁকেছেন। অর্থাৎ সাদামাটা ভাষায় যাকে বলে ইলা-

স্ট্রেশন —জ্ঞানত উনি তাই করতে চেয়েছেন। সেটাই স্বাভাবিক। বিম্ব সৃষ্টিতে যন্ত্রের ভূমিকা হাতে-নাতে পরীক্ষা করে দেখতে আগ্রহী, সচিত্র সালঙ্কারা ছাপা সম্বন্ধে উৎসাহী, জনশিক্ষা ও বিশেষ করে কিশোর শিক্ষা প্রসার এবং রুচি গঠনের আগ্রহী সাহিত্যিক যে ছবি আঁকা কাজটাকে ছাপার মাধ্যমে সাহিত্য রুচি প্রসারের সহযোগী কাজ হিসাবে দেখবেন—এ তো স্বাভাবিক। এঁকে তিনি এমন কিছু সৃষ্টি করতে চাননি যা দর্শক ভয়মিশ্রিত বিস্ময়ে দেখে বস্তুটিকে শ্রদ্ধার আসনে বসাবে। ছাপার জন্য সুকুমার ছবি এঁকেছেন যা প্রচুর লোকের হাতে যাবে। যা প্রচুর লোক কাছে নিয়ে দেখবে. সহজে বুঝবে। যার থেকে লোক সহজ আনন্দ পাবে।

কিন্তু সুকুমার রায় কি নিচ্ছক ইলাস্ট্রেটর? তাঁর ছবির রস কি একান্তভাবে ভিত্তি-লেখার উপর নির্ভরশীল? লিখিত টেকস্ট-এর সাহায্য ছাড়া তাঁর ছবির রসগ্রহণ সম্ভব নয়? তথ্যের বিবরণ বা ঘটনার বিবরণ দাখিল করার পরই কি ছবি তার আকর্ষণীয়তা হারায়? না, ছবি নিজগুণে লেখায় নতুন মাত্রা সংযোজন করে? লিখিত টেক্সটের সাহায্য ছাড়াই অনেকটা রসসঞ্চার করে? নিজ-গুণে আকর্ষন করে? ছবি যদি লিখিত টেক্সটের সাহায্য ছাড়া কোন কাহিনী বর্ণনার ভঙ্গি করে—তবে সে ছবি বর্ণনাত্মক বা ন্যারেটিভ। গল্পের ভানটা যদি আরও একটু সরব হয় তবে ইলা-স্ট্রেটিভ মাত্র, কিন্তু ইলাস্ট্রেশন নয়। আসল প্রশ্নটা হল—ছবি তার রসের জন্য কতটা পরিমাণে স্বশরীর-নির্ভর। অন্যনির্ভরতা বেড়ে গেলে ছবি ক্রমশ ছবিত্ব হারায়।

সুকুমার রায়ের ছবির গুণ বিশ্লেষণে তাঁর রসের কারবারের পরিচয়টা আগে নেওয়া দরকার।

॥ ৩ ॥

১৯০৬ থেকে '০৮-এর মধ্যে সমবয়স্ক আত্মীয়স্বজন ও সমমনস্ক বন্ধুদের নিয়ে সুকুমার রায় 'ননসেন্স ক্লাব' নামে একটি আসর গড়ে তোলেন। সারা উনিশ শতক ধরে শিক্ষিত শহুরে বাঙালী ভদ্রলোক

'এসোসিয়েশন' আর 'সোসাইটি' পত্তন করে তা-বড় তা-বড় বিষয় নিয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনা করছে আর সমাজের হিতসাধন করার চিন্তায় বিনিদ্ররজনী কাটিয়েছে। এসবে ভাল কিছু হয়নি যে তা নয়। তবে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য রসকষহীন বাড়াবাড়িও কিছু কম হয়নি। নামকরণেই মালুম, সুকুমারবাবুর উদ্দেশ্য ছিল এমন এক আড্ডা, যার সদস্যরা গোমড়া মুখ করে শক্ত বিষয়ে চিন্তা করে ঘুম নষ্ট করবেন না আর সমাজের হিতসাধন করার নামে নিজেদের সূক্ষ্ম অনুভূতি সব ভোঁতা করে ফেলবেন না। তবে, তার মানে এ নয় যে, আত্মনিশ্চিত হয়ে পরনিন্দা-পরচর্চা থেকে আমোদ লাভের গ্রাম্য চণ্ডীমণ্ডপী কায়দাটাকে তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন। আসলে তিনি বুদ্ধিচর্চার সঙ্গে সুকুমারবৃত্তিচর্চার ভেদ মানতে চাননি। বলতে চেয়েছিলেন, রস সৃষ্টিই যদি সুকুমারবৃত্তির লক্ষ্য হয় তবে হাস্য-রসের মতন স্বাস্থ্যকর রসসৃষ্টি কেন তার অভীষ্ট হবে না। আসরের পত্রিকা সাড়ে বত্রিশ ভাজ ও প্রতিটি রচনা যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিত যে হাস্যরসের উৎস, উপাদান, উপকরণ আমাদের পরিচিত পরিপার্শ্বে ছড়িয়ে আছে, দেখবার চোখ থাকলেই তা দেখা যায়, শোনার কান থাকলে শোনা যায়, একটু খালি দৃষ্টিকোণ পরিবর্তন প্রয়োজন, একটু উৎকর্ণ হওয়া দরকার। আসরের আয়োজিত উৎসবে যাতে সব সদস্যই সপরিবারে অংশ গ্রহণ করে আনন্দ পেতে পারেন সেজন্য সুকুমার রায় লিখলেন লক্ষ্মণের শক্তিশেল আর ঝালাপালা-র মতন সর্বজন উপভোগ্য দুটি নাটক। আসরকে কেন্দ্র করে সাহিত্যিক সুকুমার রায়ের আত্মপ্রকাশ ঘটলো যে হাস্যরসিক সুকুমার রায়কে পেলাম তিনি কালীপ্রসন্ন, ভবানীচরণ বা দীনবন্ধুর উত্তরসূরী নন। তিনি মধুসূদন দত্তেরও উত্তরাধিকারী নন। হয়তো-বা বঙ্কিমচন্দ্র, ত্রৈলোক্যনাথ আর রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্বসূরী। কিন্তু তিনি বিশিষ্ট। ইন্দ্রজিতের শক্তিশেলে লক্ষ্মণের আপাত মৃত্যু, বীর হনুমানের, বিশল্যকরণী আনয়ন ও লক্ষণের পুনঃপ্রাণলাভ—রামায়ণের এই উপাখ্যানের একটি চিরপরিচিত রূপে আমরা অভ্যস্ত। প্রত্যাশিত

ঘটনাক্রমের বিবরণের মধ্য দিয়ে আমরা করুণ রসে সিঞ্চিত হই, হতাশায় বিষাদে নিমগ্ন হই, বীররসে উদ্দীপ্ত হই এবং শেষে আনন্দে উদ্বেলিত হই। রাম, লক্ষ্মণ, হনুমানের প্রতি সম্ভ্রমে মাথা নত করি। লক্ষ্মণের শক্তিশেল নাটকে সুকুমার রায় মূল ঘটনাক্রম একই রাখলেন। কিন্তু পাত্র-পাত্রীরা তাদের চিরাভ্যস্ত প্রত্যাশিত আচার আচাবণ, ব্যবহারের বদলে এমন অসংস্কৃত প্রাকৃতজনোচিত কাজ-কর্ম শুরু করে দিল যা আমাদের চিরাভ্যস্ত চেতনায় আঘাত দিল। তাদের অপ্রত্যাশিত কাণ্ডকারখানা আমাদের অসংগতিপূর্ণ মনে হল কিন্তু সে-আঘাতের পরিমাণ ও মাত্রা এমন হল না যে তা আমাদের গুরুতর দুঃখ ভয় সৃষ্টি করতে পারে বা আমাদের স্বার্থবোধকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে। ফলে, এহেন নিয়মবিরুদ্ধ অসংগতিতে আমরা কৌতুক অনুভব করলাম। আর, অসংগতিপূর্ণ ঘটনার অপ্রত্যাশিত আকস্মিকতায় হাস্যোদ্ভাসিত হলাম।৬

ঝালাপালা নাটকের মূল বিষয় অপারঙ্গমের অনধিকার চর্চা। অনধিকার চর্চা দিয়ে লোক ঠকানোর চেষ্টা। শুধু এটুকু হলে কি হত? আমবা সেই অনধিকারীর উপর চটে যেতাম। বলতাম্, একি অন্যায়, আমাদের মতন নিপাট সৎ মানুষের ক্ষতি কবা হচ্ছে! কিন্তু, ঝালাপালার অনধিকারীরা এতটাই অপটু আর বোকা যে তাদেব দ্বারা কাউকে ঠকানো হয়ে ওঠে না। তাদের প্রাণান্তকর অপারঙ্গম প্রচেষ্টা আমাদের কাছে বোকামি বলে মনে হয়। তারা যে নিজেদের বোকামিটা ধরতে পারছে না দেখে মজা পাই। এই ঠগবাজ বদমাইশদের চেয়ে আমরা ভাল, এই বোকাদের চেয়ে আমরা বুদ্ধিমান ভেবে খানিকটা আত্মতৃপ্তি স্ফীতও হই। কৌতুকে যে হাসি, সে শুধু প্রত্যাশিত স্বাভাবিক ঘটনাপরম্পরার অনতিক্ষতিকারক ছন্দোভঙ্গ দেখেই নয়। অন্যের তুলনায় আমরা উচ্চতর এমন একটা সুখানুভূতি সংগোপনে আমাদের অহংকে তৃপ্ত করে বলেও আমরা খুশীর হাসি হাসি। শুধু পরিহাস, শুধু কৌতুককে সুকুমার রায় ছাড়িয়ে যান বলেই তিনি অনন্য। ঝালাপালার বোকা ঠগবাজরা

কোথায় যেন তাদের লোকঠকানো কাজের উদ্দেশ্য ভুলে কাজে আত্মনিমগ্ন। কাজের ফল যে হাস্যকর হচ্ছে, কিসসু হচ্ছে না, সেসব ভুলে করুণভাবে কাজের চর্চা করে যাচ্ছে। সুকুমার রায়ের কল্পনা যেখানে সেই কারুণ্যকে ছুঁয়ে যায়, সেখানে তাঁর কৌতুকবোধ এক নতুন মাত্রা পায়।৮

লক্ষ্মণের শক্তিশেল ও ঝালাপালা থেকেই সুকুমার রায়ের নিয়মহারা, হিসাবহীন, অসংগতিপূর্ণের কৌতুকাবহতা নিয়ে চর্চা শুরু। এই অসংগতি অনতিক্ষতিকারক ও কথঞ্চিৎ নির্দোষ বলেই কৌতুককর। নিয়মহারা হিসাবহীন ঘটনার ঘটকদের কার্যক্রম হাস্যোদ্রেককর হলেও কেন জানি অনতিকরুণ। কেন যেন মনে হয়, যা পরিচিত. যা নিয়মিত, যা সংগত, যা হিসাবমাফিক তাই যেন মেকী। ননসেন্স ক্লাবের জন্য রচিত এ-ছুটি নাটকের মধ্যেই সুকুমার রায়ের ভবিষ্যৎ জীবনের সব লেখা. সব ছবির সম্ভাবনা যেন বীজের মতন লুকিয়ে ছিল। কেবল যা পাওয়া যায় না তা কিম্ভুতের ধারণা। ননসেন্স ক্লাবের আমন্ত্রণ পত্র নিমন্ত্রণ লিপির জন্য আঁকা ছবিতেই ইলাষ্ট্রেটর হিসাবে সুকুমার রায়ের প্রথম আত্মপ্রকাশ। সেসব ছবিতে পাত্রপাত্রী বেঢপ জামাকাপড় পরে, দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে অতিপ্রকট অঙ্গভঙ্গি করে, নাটুকেপনা করে। কিন্তু তারা এতটা অসচেতনভাবে, আত্মবিস্মৃত হয়ে অতিনাটুকে ভাবভঙ্গি করে যে, নিজেরাই বোঝে না যে তারা কি করছে আর কি তার ফল হচ্ছে। পরবর্তী কালের ছবিতে তো এরই একটা সংহত, ঘন রূপ দেখতে পাই। সুকুমার রায় বিলেত চলে যাওয়ায় ননসেন্স ক্লাবও বন্ধ হয়ে যায়। বহুকাল পরে তা আবার মাণ্ডে ক্লাব বা মণ্ডা ক্লাব নামে পুনরুজ্জীবিত হয়। ততদিনে সুকুমার প্রতিভা পূর্ণ বিকশিত।

সুকুমার রায়ের বিদেশ-প্রবাসের সময়েই উপেন্দ্রকিশোর সন্দেশ প্রকাশ করতে শুরু করেন। সন্দেশ-এর প্রথম বছরের চতুর্থ সংখ্যাতে (শ্রাবণ, ১৩২০) সুকুমার রায়ের একটি ছবি ছাপা হয়। 'ভবম্ হাজাম'। পাগড়ি সরিয়ে রাজার চুল কাটতে গিয়ে, রাজার মাথায়

শিং দেখে হতভম্ব। এক হাতে কাঁচি রইল ধরা, অন্যহাত থেকে চিরুনি গেল খসে। মধ্যযুগ থেকেই ইয়োরোপে পুতুল-নাচ হাসি মস্করার একটা প্রধান মাধ্যম ছিল। রিবল্ডরির জন্য যে-সব পুতুল বানানো হত, তাদের চেহারাও করা হতো হাস্যোদ্রেককর। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিমাপের সমতাহীনতাকে প্রকট করার জন্য গায়ের রঙের উজ্জ্বলতা অনুজ্জ্বলতা, স্ফীতি, ক্ষীণতা ইত্যাদিকে অতিরঞ্জিত করে দেখানো হত। জামা কাপড় হত বেঢপ। অঙ্গভঙ্গির অতি-রঞ্জন তো থাকতই। শুধু 'ভবম হাজাম' নয়, সন্দেশের দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যার 'গুলিখোর' অষ্টম সংখ্যার 'ভাঙ্গা ধনুকের জ্যা ধরে খোকা কাঁদল ভ্যাঁ করে' ইত্যাদি আরও অনেক ছবি যে ইয়োরোপের রিবলড পাপেট প্লে-র চরিত্রায়ণ-অনুপ্রাণিত তার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। মানুষ, পশু, পাখি বিন্যায়নে রিবলড্ পাপেট প্লে-র পুতুলের যে-আদল সন্দেশ-এর জন্য আঁকা প্রথম দিককার ছবিতে দেখা যায়, পরে তা' অনেকটা আত্মস্থ, রূপান্তরিত হয়ে গেলেও একটা বেশ শেষ পর্যন্ত থেকে যায়। আবোল তাবোল-এর 'হেড আফিসের বড়বাবু', 'চোর ধরা বুড়ো' 'ইটের পাঁজার উপর বসা রাজা', 'ডানপিটে ছেলে', 'দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম', 'আহ্লাদী', 'ফসকে গেল' ইত্যাদির চরিত্র রূপায়ণ রীতি থেকে বোঝা যায় যে ইয়োরোপীয় পাপেট প্লে তাঁকে কতটা প্রভাবিত করেছিল। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। একটু মজাদার নাটকীয় ঘটনা বর্ণনের জন্য পাপেট প্লে-র ধরন থেকে ধার করার নজির আগেও আছে। পিটার ব্রুয়েঘেলের মতন অসাধারণ চিত্রকরও প্রভাবিত হয়েছিলেন। সুকুমার রায়ের প্রায় সব ছবিতেই ঘটনা বর্ণনার যে অতিনাটকীয় ধরন দেখা যায় তার উৎস বোধ হয় ঐ রিবল্ড্ পাপেট প্লে।

পরিহাস আর কৌতুকের প্রতি সুকুমার রায়ের আকর্ষণ কোন দিনও কমেনি। তবে, সন্দেশ-এর দ্বিতীয় বর্ষের অষ্টম সংখ্যায় (অগ্রহায়ণ ১৩২১) প্রকাশিত 'খিচুড়ি' কবিতা (পরে আবোল তাবোলে অন্তর্ভুক্ত) ও সেই কবিতা সচিত্রণের জন্য অঙ্কিত হাঁসজারু,

বকচ্ছপ, গিরগিটিয়া, বিছাগল, জিরাফড়িং, মোরগরু, হাতিমি, সিংহরিণ, ইত্যাদি চরিত্রচিত্রণের মধ্য দিয়ে সুকুমার রায়ের কিম্ভুত ও উদ্ভট সম্পর্কিত ধারণা প্রথম প্রকাশ পেলো।

কৌতুককরের মতন কিম্ভুতও নিয়মহারা, হিসাবহীন, অসংগতিপূর্ণ এবং সে-কারণে হাস্যোদ্রেককর? কিন্তু কৌতুককরের সঙ্গে কিম্ভুত বা উদ্ভটের একটা জাতের তফাত আছে।

শিল্প-সাহিত্যে কৌতুক সৃষ্টি করা যায় সাধারণের স্বল্প ব্যতিক্রমকে একটু অতিরঞ্জিত করে চিত্রিত করে। কিন্তু, কিম্ভুত অথবা উদ্ভটকে ধরতে হয় কল্পনা দিয়ে, আর কল্পনার রূপকল্প সৃষ্টি করে। কিম্ভুত বা উদ্ভট তাই কৌতুককরের মতন বাস্তবের ঠিক রূপান্তরিত প্রতিচ্ছবি নয়। বরং অধিকাংশ সময়েই বাস্তবের রূপক। রূপক ধর্ম যেহেতু আদতে শিল্পেরই নিজস্ব ধর্ম, সেহেতু উদ্ভট বা কিম্ভুতের ধারণা কৌতুককরের ধারণার চেয়ে অধিকতর শিল্পসম্মত।৯

॥ ৪ ॥

ঔপনিবেশিক আধিপত্য শুরু হবার আগে পর্যন্ত ভারতের দৃশ্যশিল্পের দীর্ঘ ইতিহাসে এমন কোন নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় না যা থেকে বোঝা যেতে পারে ভারতীয় শিল্পী, কারিগর এবং শিল্প-রসিকরা হাস্যরস নামে একটি রসের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। ভাঁড়ামি ছাড়া, অন্য যে-কোন ধরনের হাস্যরস সৃষ্টির জন্য যে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি আবশ্যক, মনে হয়, সমাজে তার অভাব ছিল। অভাব ছিল এই বিশ্বাসের যে সমালোচনা দিয়ে বিচ্যুতিকে পথে আনা যায়, বিকৃতিকে শোধরানো যায় ও অসংগতি দূর করা যায়। মার্গীয় বা দরবারি শিল্পে মাঝে-সাঝে আর লোকশিল্পে এবং/কিংবা ভয়ঙ্কর রসের সাক্ষাৎ মেলে। ভয়ঙ্কর ও বীভৎস বা রসসৃষ্টিতেও যা নিয়মহারা বা সংগতিহীন তা-ই প্রধান। রূপকল্প নির্মাণে তাই বল্গাছাড়া কল্পনা প্রাধান্য পায়। কিন্তু অতিরঞ্জন এক্ষেত্রে অনীহা কিংবা ভীতি-উৎপাদক। সমালোচনা নয়, প্রতিবাদ অথবা ঘৃণা মুখ্য হয়ে ওঠে বীভৎস ও ভয়ঙ্কর রসে।

ঐতিহাসিক কার্যকারণে, ঔপনিবেশিক পর্বে সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে ভারতীয় মানসে সমালোচনী মনোভাব সৃষ্ট হয়। দৃশ্যশিল্পে এই মনোভঙ্গির প্রথম সার্থক প্রকাশ কালীঘাটের পট। কালীঘাটের পটে সমালোচনা ব্যঙ্গের রূপ পেল—বিম্বের পারস্পরিক উপস্থাপনা গুণে, বিন্যাস গুণে, বর্ণনা গুণে; বিম্বের নিজস্ব রূপের গুণে নয়। বোধহয় বিম্বের ঐ দেশজ চরিত্র বজায় রেখে সেটা সম্ভব ছিল না। অন্য দিকে, ইংরেজ-প্রতিষ্ঠিত আর্ট স্কুলে শিক্ষিত বাবু শিল্পীরা পাঞ্চ পত্রিকার কার্টুন, ক্যারিকেচার দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে, ঊনবিংশ শতকের শেষ দিক থেকে যে-সব সমাজ-সমালোচনামূলক (অধিকাংশ সময়েই রক্ষণশীল মনোভাব থেকে, যে-কোন পরিবর্তনের বিরুদ্ধে) কার্টুন ক্যারিকেচার আঁকতে শুরু করলেন, তার কোনটিই কিন্তু বিম্বের পারস্পরিক উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে ঘটনা বা অবস্থা বর্ণনার বেশী কিছু হল না। কারণ শিল্পীরা কেউই বিম্ব রূপায়ণের ক্ষেত্রে ঊনবিংশ শতকের ইয়োরোপীয় প্রাতিষ্ঠানিক বাস্তবতার সীমা ছাড়িয়ে বিম্বের হাস্যোদ্রেককর রূপান্তর ঘটাতে পারলেন না। গগনেন্দ্রনাথই প্রথম ভারতীয় শিল্পী যিনি বিম্বের বর্ণনাত্মক উপস্থাপনের উপরে নির্ভর না করে, বিম্বের রূপায়ণকে রসপ্রকাশক করে তুললেন। তাঁর আগেকার সমালোচনাধর্মী ছবির তুলনায় অনেক বেশী শিল্পসম্মত হওয়া সত্ত্বেও গগনেন্দ্রনাথের ক্যারিকেচার সরাসরি ব্যঙ্গধর্মী ও শুধুই ব্যঙ্গপ্রবণ হবার কারণে, আগেকার কার্টুনিস্টদের ছবির মতনই একমাত্রিক এবং জটিলতাশূন্য।

সুকুমার রায়ই বোধ হয় প্রথম ভারতীয় হাস্যরস-ব্যাপারী শিল্পী যাঁর সমালোচনা একমাত্রিক নয়। বিদ্রূপ-বান নিক্ষেপ পারঙ্গম তীরন্দাজী হওয়া তাঁর উদ্দেশ্য নয়। জটিলতা তাঁকে কৌতূহলী করে। জটিলতার মধ্যেই তিনি কৌতুকের উপাদান খুঁজে পান। কাঠ-বুড়ো, হেড অফিসের বড়বাবু, খুড়োর কলের খুড়ো, লড়াই-ক্ষ্যাপা পাগলা জগাই, ছায়া-ধরা ব্যবসায়ী, কাজে খাটো বংশীধর, হিজিবিজ্‌বিজ বা হ্যাড়া—যাদের উদ্ভট, অসংগতিপূর্ণ কাণ্ড কারখানার কার্য-কারন

সম্পর্কে যুক্তি দিয়ে বোঝা যায় না, যাদের কাজকর্ম অজ্ঞেয় উদ্ভট নিয়মে পরিচালিত হয় বলে, আমাদের মতন নিয়মের রাজত্বে বসবাসকারীদের হাস্যোদ্রেক করে—ছড়ায় এবং ছবিতে দেখি সুকুমার রায়ের সহানুভূতি যেন সেই সব আত্মমগ্ন ব্যতিক্রমীদের দিকেই। কখন-কখন এও মনে হয়, যাকে আমরা স্বাভাবিক নিয়মমাফিক, যুক্তিসংগত বলি, সুকুমার যেন প্রকারান্তরে তাকেই ব্যঙ্গ করেছেন। অবশ্য একান্ত অনুচ্চ কণ্ঠ সে ব্যঙ্গ। ব্যক্তিকেন্দ্রিক ব্যতিক্রম, ব্যাষ্টির না-পসন্দ। কিন্তু যতক্ষণ সেই ব্যতিক্রম ব্যষ্টির পক্ষে ক্ষতিকারক নয়, ততক্ষণ ব্যষ্টিমনের কাছে ব্যতিক্রমী কাণ্ডকারখানা হাস্যোদ্রেককর। শুধু তাই নয়, ব্যষ্টিমন মজা পাবার জন্য ব্যতিক্রমী ব্যক্তিকে নিষ্ঠুরভাবে খুঁচিয়ে হাসির ব্যবস্থা করে নেয়। সুকুমার রায়ের ছবির ব্যতিক্রমী চরিত্রায়ণ থেকে জানতে কোন কোন সন্দেহের অবকাশই থাকে না যে তার সহানুভূতি কোন দিকে। ব্যতিক্রমী চরিত্রদের উদ্ভট কর্মকাণ্ড হাসোদ্রেককর অবশ্যই, কিন্তু তাদের নিঃসঙ্গ অসহায় অবস্থা কি করুণ নয়? তাদের নিঃস্বার্থ আত্মনিমগ্ন কার্যক্রম কি শ্রদ্ধা জাগায় না? আবার দেখা যাক্ হুকোমুখো হ্যাংলা, রামগড়ুরের ছানা বা ট্যাঁশ গরুকে অথবা ভয় পেয়ো না'র সেই উদ্ভট জন্তুটিকে। এদের প্রত্যেকের চেহারাই বীভৎস, কিম্ভুত এবং ত্রাসজনক। কিন্তু হয় এরা নিজেরাই এত সন্ত্রস্ত অথবা এত সাধারণ এবং ত্রাসজননে অপারঙ্গম যে তাদের চেহারাটাই বিদ্রূপ হয়ে যায়। কি করুণ তারা যাদের আত্মপরিচয়টা তাদের অস্তিত্বকে বিদ্রূপ করে। তারা কি অন্য কেউ? না, তারা আমাদেরই রূপক? আমরা যাঁদের কার্টুনিস্ট বা ক্যারিকেচারিস্ট বলে থাকি তাঁরা সাধারণত এমন জটিল প্রশ্ন উত্থাপন করেন না। তাঁরা সাধারণত সহজ সমাধানেরই এক একটা দৃশ্যমান রূপ উপস্থাপন করেন। তাঁদের সরাসরি সমাধানই দর্শক হিসাবে আমরা গ্রহণ করে থাকি। 'ধন্দ নিয়ে কারবার শিল্পীরই।১০ একই দৃশ্যে অভিজ্ঞতার বহুসম্ভাবনাকে ইঙ্গিতে সংকেতে যিনি আভাসিত

করেন তিনি শিল্পী। ইলাস্ট্রেশন, কার্টুন, ক্যারিকেচার তিনি যাই করুন না কেন, তিনি শিল্পীই।

ফ্রানসিসিকো গোইয়ার ছবির কথা যদি মনে নাও রাখি, শুধু যদি তাঁর কার্টুন আর ক্যারিকেচার-এর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি তা হলে দেখব, নেপোলিয়নীয় যুদ্ধের পটভূমি শুধু পটভূমিই। মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের পাশবিক ক্রূরতা ভীরু বশ্যতা ইত্যাদিই তাঁর ডার্ক ম্যাকাবর হিউমর-এর লক্ষ্য। ওঁরে দ্যমিয়ে ফরাসী দেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থা নিয়ে যখন তাঁর ব্যঙ্গাত্মক ছবি এঁকেছেন তখন বিচারালয়, বাদী, ফরিয়াদী, উকিল মোক্তার, বিচারপতিকে চাপিয়ে উঠেছে তঞ্চকতা, শঠতা, প্রবঞ্চকতা, দম্ভ, গর্ব ও মানুষের অসহায় আত্মসমর্পণ বিষয়ে তাঁর তীর্যক শ্লেষ। তবে, সুকুমার রায় প্রসঙ্গে গোইয়া বা দ্যমিয়ে ঠিক প্রাসঙ্গিক নয়। তাঁর ছবিতে সময়ে অসময়ে কিঞ্চিদধিক শ্লেষ থাকলেও, ব্যঙ্গ ঠিক তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নয়। তিনি ঠিক সমাজসমালোচকও নন। তাঁর ছবিতে সমালোচ্য ব্যক্তিবর্গের সামাজিক পরিচয় শনাক্ত করা যায় না। সমালোচ্য ব্যক্তিকে দেখা যায় মাত্র; তাও সুস্পষ্টভাবে নয়। তাঁর সমালোচ্য কিছু কাজকর্ম, কিছু চিন্তাভাবনা, কিছু ব্যবহার। এ-ব্যাপারে তাঁর পূর্বসূরী লুইস ক্যায়ল ও এডওয়ার্ড লিয়র। আগেই দেখেছি ভারতীয় শিল্পকলায় হাস্য-রস সৃষ্টির কোন ঐতিহ্য ছিল না। ঊনবিংশ শতক থেকে যে ব্যঙ্গ-প্রধান হাস্যরস সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে তাতে বিম্বর রূপের ভূমিকা প্রায় কিছুই ছিল না। গগনেন্দ্রনাথ যখন যথাযথ বিম্ব-রূপ নির্মাণ করার চেষ্টা করেছেন তখনও তাঁকে ফিরতে হয়েছে গোইয়া আর দ্যমিয়ের দিকে। তাঁর অভীষ্ট ছিল ব্যঙ্গ সৃষ্টি। সুকুমার রায় তো সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন কৌতুক। কৌতুক হাস্যই তাঁর লক্ষ্য। লুইস ক্যারলের এলিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড কিংবা থ্রু দি লুকিং গ্লাস তাঁকে প্রভাবিত করতে পারত। সেখানেও অপাপবিদ্ধ সরল দর্শক অপারবিস্ময়ে নিয়মহারা অসংগতিপূর্ণ জগতে বিচরণ করে যে আনন্দ লাভ করে, নিয়মবদ্ধ যুক্তিসিদ্ধ জগতে সে আনন্দ দুর্লভ। কিন্তু

সুকুমার রায় তো বিষাদ-সন্ধানী। অপাপবিদ্ধ সরলকে তো কঠিন ক্রুর একুশে আইনের জগৎ নিয়মহারা বাঁধনহীন জগতে অবাধে বিচরণ করতে দিতে নারাজ। অতএব, বিষাদই অপাপবিদ্ধের ভবিতব্য। হরিষে-বিষাদের অনবদ্য এক শিল্পভাষা সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন, লিমেরিকের স্রষ্টা এডওয়ার্ড লিয়র তাঁর ইলাস্ট্রেশনে। উত্তরসূরী সুকুমার রায়ের মতনই, লিয়রের বিচরণ কৌতুক থেকে কিম্ভুতের মধ্যে। তার পূর্বসূরী এবং উত্তরসূরীর মধ্যে তফাত খানিকটা আছে। লিয়র ছিলেন সুদক্ষ পেশাদারী চিত্রকর। সুকুমার রায় তা নন। লিয়রের কৌতুক অনেক সময়েই বেশ ক্রূর। সুকুমার রায়ের কৌতুক প্রায় কখনই ক্রুর নয়।

কথা হল, ছবি আঁকিয়ে সুকুমার রায় কি শুধুই লেখক সুকুমার রায়কে অনুসরণ করে গেছেন? না, তাঁর ছবি নিজ গুনে আকর্ষক। এটা অনস্বীকার্য যে সুকুমার রায় ছবি এঁকেছেন লেখা পড়ার সঙ্গে ছবি দেখার জন্য। তাঁর ঘটনা বর্ণনামূলক অনেক ছবির সম্পুর্ণ রস লেখার সঙ্গে ছাড়া পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু যেখানে খেয়ালী কল্পনা তাঁর বিম্ব নির্মাণ করেছে, যেখানে তিনি আজগুবি রূপকল্প সৃষ্টি করেছেন সেখানে তাঁর ছবি লেখার সহায়ক মাত্র নয়; নিজ গুণে ছবি। সে ছবি লেখাকে নতুন মাত্রা দেয়। আনুষ্ঠানিক ছবি যেমন অতিরিক্ত বিবরণমূলক হলে ইলাস্ট্রেশনে পরিণত হয়, তেমনই আবার ইলাস্ট্রেশন বিবরণী-বিশদহীন হয়ে কল্পনার যাদুস্পর্শে ছবি হয়ে ওঠে। ইলাস্ট্রেটর সুকুমার রায়ের খেয়ালরসসিক্ত উদ্ভটকল্পনার রূপকল্প তার নিদর্শন। বুদ্ধদেব বসু আমাদের দেখিয়েছেন কি করে সুকুমার রায় শব্দের যাদু দিয়ে হাসির ছড়ায় কল্পনার সঞ্চার করে, ছড়াকে কবিতায় পরিণত করেন। ঠিক সে ভাবেই ইলাস্ট্রেটর সুকুমার রায় উদ্ভট রূপকল্পের সংকেতে হাসির ছদ্মবেশে বিষাদকে স্পর্শ করেন। তিনি যদি শিল্পী না হন, তবে কে শিল্পী?

টীকা, নির্দেশ ও গ্রন্থপঞ্জী

*এই প্রবন্ধ রচনায় শ্রীযুক্তা নলিনী দাশ ও শ্রীসত্যজিৎ রায়-এর সাহায্য কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

১। হাঙ্গেরীয় দার্শনিক গেয়র্গি লুকাচ তাঁর ১৯৩৬-এ লেখা প্রবন্ধ 'ন্যারেট অর ডেস্‌ক্রাইব'-এ (লুকাচ, রাইটার এণ্ড ক্রিটিক, মার্লিন, লণ্ডন, ১৯৭০), বর্ণনা এবং বিবরণ এই দুই ভাগের মধ্যেই জগৎ জীবন, ভাবনার সব মানুষ সৃষ্ট প্রতিফলনকে ধরতে চেয়েছিলেন। প্রায় এক ধরনের দু'-ভাগে বিভাজন কাঠামো দাঁড় করিয়েছিলেন ভামহ (কাব্যালঙ্কার ১, ২৬), দণ্ডী (কাব্যাদর্শ ১, ২, ৫), বাণভট্ট (হর্ষচরিত, কাদম্বরী) ও অমরসিংহ (অমরকোষ ১)। এঁদের মতে কাব্যে, নাট্যে প্রবন্ধে ঘটনার প্রতিফলন ঘটে হয় কথা, না হয় আখ্যান-এর মধ্য দিয়ে। কিন্তু এই দ্বি-শ্রেণীক বিভাজন রীতি যথেষ্ট বলে মনে হয় না।

২। ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ, ব্যোম পঞ্চভূতের যে-কোন একটির অথবা যে-কোন দুই বা ততোধিকের সমাহারে গঠিত কোন বস্তু অথবা অবস্থার—মানুষ-সৃষ্ট রূপ অর্থে হিন্দীতে বিম্ব শব্দটি বহুল প্রচলিত। শব্দটি তৎসম হবার কারণে বাংলায়ও চলতে পারে। ইংরিজিতে 'ইমেজ' শব্দটির অভিধার্থ যা, 'বিম্ব'-র মানেও তাই। ইংরিজি 'ইমেজ' শব্দের দ্বিতীয় একটি অভিধার্থ আছে, যাতে ইমেজ-এর অর্থ দাঁড়ায় 'আইকন' বা প্রতিমা। সে অর্থ আমাদের লক্ষ্য নয়। আবার, 'ইমেজ'-এর একটি ব্যঞ্জনার্থ আছে। এজরা পাউণ্ড প্রমুখ ইমেজিস্ট কবিরা এই ব্যঞ্জনার্থে ইমেজ কথাটি ব্যবহার করতেন। এ-বিশেষ অর্থে মানুষের সৃষ্ট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ কোন জাগতিক বস্তুর প্রতিরূপ মাত্র নয়। বস্তুর রূপকে অবলম্বন করে নির্বস্তুক ধ্যান-ধারণা ভাবনা-কল্পনা যে সৃষ্ট রূপে প্রকাশ পায় তা-ই 'ইমেজ'। ব্যঞ্জনার্থে প্রযোজ্য ইমেজ শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে তৎসম যৌগিক শব্দ রূপকল্প বেশ লাগসই।

৩। বরোদা থেকে প্রকাশিত, অধুনালুপ্ত বৃশ্চিক পত্রিকার দি সোস্যাল কনটেক্সট অফ আর্ট শিরোনামের গীতা কাপুর সম্পাদিত বিশেষ সংখ্যায় (১৯৭৩) 'দ্য সিস্টেম অফ কমোডিটি প্রোডাকশন' নামে মৎপ্রণীত প্রবন্ধে এটা বলার চেষ্টা হয়েছিল যে শিল্পবস্তু গ্রহীতার তিন ধরনের প্রয়োজন মেটায়। তিনটি আলাদা আলাদা কারণে শিল্পবস্তুর চাহিদা তৈরী হয়: (ক) আধিভৌতিক ক্রিয়া-কর্মের যন্ত্র হিসাবে এবং/বা পূজ্যবস্তু হিসাবে, (খ) সংযোগক্ষম মাধ্যম হিসাবে এবং/বা (গ) অলঙ্কার হিসাবে গুণগুলি অল্পবিস্তর মিশে থাকে। প্রবন্ধ প্রকাশের

বেশ কিছুকাল পরে, অকাল-প্রয়াত জর্মন সমালোচক ভালটের বেন্‌জামিন-এর কিছু লেখার একটি ইংরিজি সঙ্কলন, ইলিউমিনেশনস, কেপ, লণ্ডন, ১৯৭০-এ 'দ্য ওয়ার্ক অফ আর্ট ইন দি এজ্ অফ মেকানিক্যাল রিপ্রোডাকসনস' নামে একটি প্রবন্ধ চোখে পড়ে। সেখানে বেঞ্জামিন বলেছেন, দু জাতের শিল্পবস্তু দু' ভাবে দর্শকের চাহিদা মেটায় পূজ্য বস্তু হিসেবে এবং দর্শনীয় বা দর্শনেন্দ্রিয় তৃপ্তকর বস্তু হিসাবে। বেঞ্জামিনের প্রথম জাতটি ঠিক আছে। দ্বিতীয় জাতটি বর্ণসঙ্কর।

৪ গ্রন্থচিত্রণ, চিত্রিত পুঁথি, চিত্র মুদ্রণের ইতিহাস ও কলাকৌশল নিয়ে ইংরিজি ভাষায় লেখা ও অনূদিত বহু প্রামাণ্য বই পাওয়া যায়। ডেভিড ব্লাণ্ড, এ হিস্ট্রি অফ বুক ইলাস্ট্রেশন, লণ্ডন, ১৯৫৮—তার মধ্যে এমনই একটি বই যা বিশেষজ্ঞদের জন্য নয়, কিন্তু সব সাধারণস্বীকৃত তথ্য-প্রমাণাদি বইটিতে সুন্দর-ভাবে সাজানো আছে। এই সচিত্র বইটি নয়নসুখকরও বটে। প্রতিবেশী দেশ সহ ভারতবর্ষে গ্রন্থচিত্রণ, চিত্রিত পুঁথি ও চিত্র মুদ্রণের প্রামাণ্যইতিহাস-এর জন্য জেরেমিয়া পি লসটি, দি আর্ট অফ বুক ইন ইন্‌ডিয়া, ব্রিটিশ লাইব্রেরী, লন্ডন, ১৯৮২ (ইংল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত ভারত-মেলা উপলক্ষে প্রকাশিত) দ্রষ্টব্য।

৫। সুকুমার রায়ের জীবনী সংক্রান্ত তথ্যাদির জন্য, সুকুমার রায়: সমগ্র শিশু সাহিত্য, আনন্দ, কলকাতা ১৩৮৩-র অন্তর্ভুক্ত সত্যজিৎ রায়ের 'ভূমিকা' ও সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৭৬ দ্রষ্টব্য।

৬। হাসির কারণ বহুবিধ। কৌতুকবোধ তার অন্যতম। শিল্পসাহিত্যে হাস্যরসের উৎস প্রধানত কৌতুক। কৌতুকের উপকরণ, উপাদান কি? এবং কৌতুক কেন হাস্যোদ্রেককর তার ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথের 'কৌতুকহাস্য' এবং কৌতুকহাস্যের মাত্রা' নামে দুটি সরস রচনায় যেমন পাওয়া যায়, তেমনটি আর কোথাও পাওয়া যায় না। প্রবন্ধদ্বয়ের জন্য পঞ্চভূত (১৩০৪), রবীন্দ্র রচনাবলী (বিশ্বভারতী সংস্করণ,) দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

৭। উনিশ শতকের ফরাসী কবি শার্ল ব্যোদলেয়ার তাঁর ১৮৫৫-এ লেখা একটি প্রবন্ধে হাসির উৎস ও কারণ এবং শিল্প-সাহিত্যে হাস্যরস নিয়ে বিচার বিবেচনা করেছিলেন। সেই প্রবন্ধেই এবম্বিধ অভিমত পাওয়া যায়। পিটার ক্যুয়েনেল (সম্পাদিত), শার্ল ব্যোদলেয়ার—এসেন্স অফ লাফ্‌টার, মেরিডিয়ান, নিউ ইয়র্ক, ১৯৫৬।

৮। 'বাংলা শিশুসাহিত্য' নামে ১৯৫২-তে লেখা তাঁর অসাধারণ প্রবন্ধটিতে বুদ্ধদেব বসু, সুকুমার রায়ের লেখার এদিকটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। বুদ্ধদেব বসু প্রবন্ধ সংকলন, দে'জ কলকাতা, ১৯৮২

৯। 'গ্রো টস্ক' বা বিভূত কিংবা উদ্ভট যে 'হিউমার' বা কৌতুকের চেয়ে উঁচু দরের শিল্প এ-বিষয়ে শার্ল বোদলেয়ারের কোন সন্দেহই ছিল না। বোদলেয়ার, তদেব।

১০। কবি, সমালোচক উইলিয়ম এম্প্‌সনের মতে এমবিগুইটি বা দ্বন্দ্ব শিল্পের প্রাণ। উইলিয়ম এম্প্‌সনের সেভেন টাইপস্ অফ এমবিগুইটি, ফনটানা পেপারব্যাক, লণ্ডন ১৯৬৭, দ্রষ্টব্য।

১১। এডওয়ার্ড লিয়র-এর লিমেরিকের অধিকাংশ ভাল সংস্করণেই তাঁর নিজকৃত সচিত্রণী-চিত্র স্থান পায়। লিয়র সম্পর্কে আলোচনা হয়েছেও বিস্তর। তবে জন লেহ্‌ম্যান এডওয়ার্ড লিয়র এণ্ড হিজ ওয়র্লড, টেমস্ এণ্ড হাডসন, নরউইচ, ১৯৭৭, নামে বইটি অনবদ্য। বইটির ছবি দেখলে বোঝা যায় সুকুমার রায় লিয়রের কাছে কতটা ঋণী।

১২। বুদ্ধদেব বসু—তদেব।

সুকুমার রায় ও আবোল তাবোল

সুধেন্দু রায়

সুকুমার রায় বাংলা সাহিত্যে এসেছিলেন— আবোল তাবোল মত্ত মাদল বাজিয়ে। বিস্ময়কর আবির্ভাব।

এক অসম্ভবের ছন্দে তাঁর খাম-খেয়ালী খেয়াল খুশীর গান শোনাবার জন্য তিনি পেয়েছিলেন এক স্বল্পায়ু জীবন। মাত্র ছত্রিশ বছর (১৮৮৭—১৯২৩)।

ভাবতে অবাক লাগে এই সীমিত সময়ের মধ্যে তিনি কি ভাবে তাঁর বহুমুখী প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটালেন। যেন ছত্রিশ বছরে ছত্রিশ রাগিনীর বিস্তার। ছন্দের তরঙ্গমালায় অসাধারণ রঙ্গে কৌতুক। কবিতার সঙ্গে তাল রেখে অননুকরণীয় তুলির টানে ছবির চমক। ক্ষণজন্মা শক্তিধর পুরুষ, অনন্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন বলেই বোধ হয়, অল্প সময়ের মধ্যে জীবনের নানাদিক ফুটিয়ে তোলা সম্ভবপর হয়েছিল।

সুকুমার রায় জন্মসূত্রে অর্জন করেছিলেন পারিবারিক ঐতিহ্য ও আভিজাত্য এবং শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির এক সুষ্ঠ পরিবেশ। যেটা পরবর্তী জীবনে কাজে এসেছে বহুতর ভাবে। তিনি নিজেও ছিলেন বিজ্ঞানের কৃতি ছাত্র। বি. এস. সি. পাশ করেছিলেন রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞানে ডবল অনার্স নিয়ে। জলপানি পেয়ে লণ্ডনে গিয়েছিলেন চিত্র ও মুদ্রন শিল্পের বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষা লাভ করতে। সসম্মানে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দেশে ফিরেছিলেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর সাধারণ মানুষের মনোরঞ্জনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বৈজ্ঞানিক সাধনায় লিপ্ত হয়ে জগৎ জোড়া খ্যাতি লাভ করতে পারতেন। সে পথে না হেঁটে তিনি মানুষকে আনন্দ দান করার ব্রত গ্রহণ করলেন। সেই ব্রত পালনে অনুসৃত হলো তাঁর অভিনব বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। আমরা পেলাম হাস্য কৌতুকের

নতুনরূপ। শ্লেষহীন ব্যঙ্গ। যার সর্বাঙ্গীন সার্থকথা প্রকাশ পেল 'আবোল তাবোল' কাব্যগ্রন্থে সুকুমার রায়ের আসন্ন জন্মশতবার্ষিকী উৎসব পালন উপলক্ষ্যে তাঁব প্রতিভার বিভিন্ন দিক নিয়ে ইতিমধ্যে বহু সুচিন্তিত আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে এবং আরো হবে। হয়ত কোনও নবদিগন্ত আবিষ্কৃত হতে পারে। তবু 'আবোল তাবোল' বইটি চিবস্মবণীয় হয়ে থাকবে। তার একমাত্র কারণ আবোল তাবোল তাঁকে যশস্বী করেছে। বাঙালীর ঘরে ঘবে পৌঁছে দিয়েছে তাঁর নাম। আমার এ বক্তব্য প্রমাণের জন্য দিস্তা দিস্তা দলিল দস্তাবেজ পেশ করার প্রয়োজন হয় না —আবোল তাবোল বইটিই যথেষ্ট।

অল্প-বিস্তর শিক্ষিত বাংলা ভাষা ভাষীর ঘরে আর কোনও বই পাওয়া না গেলেও খুঁজলে আবোল তাবোল বইটি অবশ্যই পাওয়া যাবে। বস্তুত সুকুমার রায়ের সঙ্গে সর্বস্তরের বাঙালীর পরিচয় ঘটেছে আবোল তাবোল গ্রন্থের মারফৎ। স্বভূমে কিংবা বিভূঁয়ে যেখানেই বাঙালী আছেন তাঁদের কোনও না কোনও পুরুষের সঙ্গে এই বইটিব আত্মিক যোগাযোগ ঘটেছে। ঘটেছে আত্মীয়তার নিবিড় বন্ধন। ব্যক্তিতাও অভিজ্ঞতায় বলতে পাবি আমরা তিন পুরুষ ধরে এর প্রতিটি পাতা থেকে আনন্দ উপভোগ কবে আসছি। আমার স্বর্গতঃ পিতা-মাতা, আমি, আমার ভাইবোন, আমাব পুত্র-কন্যা, সকলেরই কাছে ঘটেছে সমান সমাদর। এমন ভাবে চিবন্তন সমাদর লাভের সৌভাগ্য খুব কম গ্রন্থের ভাগ্যেই ঘটে। গ্রন্থের শুরুতেই তিনি সকলকেই সাদরে ডেকেছেন—

আযরে পাগল আবোল তাবোল
মত্ত মাদল বাজিয়ে আয়।

তারপরেই বলেছেন—

আয় খ্যাপা-মন ঘুচিয়ে বাঁধন
জাগিয়ে নাচন তাধিন ধিন্,
আয় বেয়াড়া সৃষ্টিছাড়া
নিয়মহারা হিসাবহীন।

আজগুবি চাল্ বেঠিক বেতাল
মাতবি মাতাল রঙ্গেতে—
আয়রে তবে ভুলের ভবে
অসম্ভবের ছন্দেতে।

তাঁর এই আহ্বানের মধ্যে কোনও বয়েসের সীমারেখা নির্দেশিত হয়নি। তাই আবোল তাবোলের ছড়া ছেলে ভুলানো ছড়ার মধ্যেই আবদ্ধ থাকেনি ছড়িয়ে পড়েছে সব বয়েসের মনের ভেতরে। বাংলা ভাষা যাদের মাতৃভাষা তাদের মনের মাটিতে আবোল তাবোল সযত্নে প্রোথিত। তার ক্রিয়াশীল শিকড় এতো গভীরে পৌঁছে গেছে যে বাঙালী মাত্র সুকুমার রায় থেকে দু একটি উদ্ধৃতি অনায়াসে উচ্চারণে সক্ষম।

আবোল তাবোল বইটির পুনঃপুনঃ উল্লেখ করার একমাত্র কারণ, এতে রচিত ও চিত্রিত চরিত্রের মধ্যে আমরা যেন আমাদেরই ঘুরে ফিরে দেখতে পাই। অনুপ্রাসে, ধ্বনিঝংকারে, যমকে গাঁথা শব্দ মালার শরীর ভেদ করে বেরিয়ে আসছেন আমাদের অতি পরিচিত প্রিয়-অপ্রিয় কেউ। হেড অফিসের বড়বাবু, চণ্ডীদাসের খুড়ো গঙ্গারাম কিংবা বাবুরাম সাপুড়ে যেন আমাদের বহুকালের পরিচিত। আমাদের জীবনের অসংগতিও নানা প্রতিফলন রূপায়িত হয়েছে ব্যঙ্গে, কৌতুকে, হাস্যরসে। হাসিরও রূপান্তর ঘটেছে বিচিত্র ভাবে। কখনও মর্জাবসী, কখনও মেজাজী, কখনও মৃদু মোলায়েম। শ্লেষহীন ব্যঙ্গের প্রকৃষ্ট নমুনা—

মাসিগো মাসি, পাচ্ছে হাসি
নিম গাছেতে হচ্ছে শিম—
হাতীর মাথায় ব্যাঙের ছাতা
কাগের বাসায় বগের ডিম।

'ননসেন্স ভার্স' এর সঠিক বাংলা কি হওয়া উচিত সে বিতর্কে অবতীর্ণ না হয়ে বলা যায় নির্বোধের ভাঁড়ামী বা সঙের সস্তা ধরনের

অঙ্গভঙ্গী কিংবা উদ্ভট নামের সমাবেশে চমক জাগানোর প্রয়াস নয়। এটি একটি নিছক খেয়াল রসের খেলা যা নিয়মহারা, হিসেবহীন। এই নিয়মহারা ব্যাকরণ মানে না। নিজে থেকেই তৈরী করে নতুন ধরনের জীবজন্তু। হাঁসজারু বকচ্ছপ, হাতিমির। সুকুমার রায়ের আগে লুইস ক্যারল ও এডওয়ার্ড লিয়ার কিছু আজগুবি প্রাণী সৃষ্টি করলেও তারা কেউ আমাদের আপন হতে পারল না। চিরকালই রয়ে গেল বহুযোজন ব্যবধানে দূরবর্তী পর। সুকুমার রায়ের সৃষ্টি করা প্রাণীরা খুব সহজেই পৌঁছে গেল বাঙালী গৃহের অভ্যন্তরে। বাংলার ঘরে ঘরে আপন হয়ে গেল—হুঁকোমুখো হ্যাংলা—কুমড়ো-পটাশ, ট্যাশ গরু—রামগরুড়ের ছানা। তাদের বসবাস রূপকথার রাজ্যে নয়। আমাদেরই আপে পাশে। 'প্যাঁচা কয় প্যাঁচানি/খাসা তোর চ্যাঁচানি' পড়েই আমাদের চিনে কষ্ট হয়না দেশ জোড়া প্যাঁচা আর প্যাঁচানিকে। এবং আমরা সহজ ভাবেই চিনতে পারি—'পান্তু ভূতের জ্যান্ত ছানা/করছে—খেলা জোছনাতে।'

সুকুমার রায় কতখানি সমাজ সচেতন ছিলেন সে কথা ভালো-ভাবে বোঝা যায় 'একুশে আইন' পড়লেই—

শিব ঠাকুরের আপন দেশে
আইন কানুন সর্বনেশে।

এবং সেই আইন কানুন কত কঠোর ছিল তা জানাতে গিয়ে লিখেছিলেন—

চলতে গিয়ে কেউ যদি চায়
এদিক ওদিক ডাইনে বাঁয়
রাজার কাছে খবর ছোটে
পল্টনেরা লাফিয়ে ওঠে
দুপুর রোদে ঘামিয়ে যায়
একুশ হাতা জল গেলায়।

আবোল তাবোল হাসায় এবং ভাবায়।

আপাত দৃষ্টিতে অসরবদ্ধ, এলোমেলো ও অর্থহীন মনে হলেও এর মর্ম এতো বেশী গভীর ও অর্থবহ যে বহুবার মনস্ক পঠনের পরেও থৈ পাওয়া যায় না সঠিক। যতবারই পড়া যায় ততবারই নতুন মনে হয়। এইখানেই সুকুমার রায়ের কৃতিত্ব।

কারণ আবোল তাবোল তাঁর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এটা আমার ব্যক্তিগত ধারনা। মতান্তরের অবকাশ থাকতে পারে অবশ্যই।

সুকুমার রায় ও 'ননসেন্স পদ্য'

গৌতম হাজরা

১৯১৫ সালে সুকুমার রায় 'সন্দেশ' পত্রিকায় 'খিচুড়ি' নামে একটি পদ্য লেখেন। এই পদ্যটি তিনি বিলেত থেকে ফিরে আসার পর রচনা করেন। পদ্যটিতে তিনি কিছু উদ্ভট প্রাণীর আবির্ভাব ঘটান, যা ননসেন্স হিসেবে খ্যাত। যদিও উক্ত পদ্যটিতে লিয়রের ছায়া আছে, তবুও তা সর্বাংশে অনুকরণীয় নয়। লিয়র তাঁর পদ্যে ডং, জাম্বলি, পবল, ক্লাঙ্গলওয়্যাঙ্গল, ব্লাস-ওয়স ইত্যাদি আজগুবি 'প্রাণীর সৃষ্টি করেছিলেন যেমন, তেমনি সুকুমাব রায় উদ্ভট সন্ধির নিয়মে সৃষ্টি করেছিলেন বকচ্ছপ, হাঁসজারু, মোরগরু, গিরগিটিয়া, সিংহরিণ ইত্যাদি প্রাণী। তিনি তাঁর পদ্যে শুধু প্রাণীদের নাম করণেই শেষ করেছিলেন তা নয়, উদ্ভট প্রাণীদের চেহারাটাও এঁকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। ভাষাণ কারসাজিতে প্রাণী সৃষ্টিতে 'খিচুড়ি' পদ্যটি কেমন রূপ পেয়েছিল নিয়ে দেওয়া গেল :

'হাঁস ছিল, সজারু, (ব্যাকরণ মানি না),
হয়ে গেল 'হাঁসজারু' কেমনে তা জানিনা।
বক কহে কচ্ছপে—'বাহবা কি ফুর্তি !
অতিখাসা আমানের বকচ্ছপ মূর্তি।'
টিয়ামুখো গিরগিটি মনে ভারি শঙ্কা
পোকা ছেড়ে শেষে কিগো খাবে কাঁচা লঙ্কা ?
ছাগলের পেটে ছিল না জানি কি ফন্দি,
চাপিল বিছার ঘাড়ে, ধড়ে মুড়ো সন্ধি !' ইত্যাদি···

এই হ'লো সুকুমার রায়ের ননসেন্স পদ্য বা ছেলেভুলালো ছড়া। 'খিচুড়ি থেকে আরম্ভ করে 'সন্দেশে' প্রকাশিত ননসেন্স পদ্যগুলি তিনি 'আবোল তাবোল' নাম দিয়ে গ্রন্থাকারে সংকলন করেন। এখানে আর একটি লক্ষণীয় এই আবোল তাবোল নামটি।· এটিও

ননসেন্স পদ্যর যথার্থ বাংলা প্রতিশব্দ। 'আবোল তাবোলে'র পদ্য-গুলির মধ্যে এমন দু'একটি রচনা আছে যার মর্ম বেশ গভীর অথচ বাইরের খোলস অত্যন্ত হাল্কা। শ্রেষ্ঠ উদাহরণ 'রামগরুড়ের ছানা'—

'রামগরুড়ের ছানা হাসতে তাদের মানা,
হাসির কথা শুনলে বলে,
'হাস্‌ব না-না, না-না।
সদাই মরে ত্রাসে ঐ বুঝি কেউ হাসে!
এক চোখে তাই মিটমিটিয়ে
তাকায় আশে পাশে।'

এছাড়া হালকা রসের কিছু পদ্য আছে যাকে সরস রচনা বলা যায়। যেমন:

'আয় তোর মুণ্ডুটা দেখি, আয় দেখি 'ফুটোস্কোপ' দিয়ে
দেখি কত ভেজালের মেকি আছে তোর মগজের ঘিয়ে।
কোনদিকে বুদ্ধিটা খোলে, কোন দিকে থেকে যায় চাপা;
কতখানি ভস্‌ভস্‌ ঘিলু, কতখানি ঠক্‌ঠকে কাঁপা।

(বিজ্ঞানশিক্ষা আবোল তাবোল)

অথবা,

"এক যে রাজা"—"থাম না দাদা,
রাজা নয় সে, রাজ পেয়াদা।"
"তার যে মাতুল"—"মাতুল কি সে?
সবাই জানে সে তার পিসে।"

(গল্প বলা / আবোল তাবোল)

অথবা,

ট্যাঁশ গরু গরু নয়, আসলেতে পাখি সে;
যার খুশি দেখে এস হারুদের আফিসে।
চোখ দুটি ঢুলুঢুলু, মুখখানা মস্ত,
ফিট্‌ফাট্ কালোচুলে টেরিকাটা চোস্ত।'

(ট্যাঁশ গরু / আবোল তাবোল)

১৩২৪ সালে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'সন্দেশে' প্রকাশিত "আবোল-তাবোল পদ্যটি ছেলেমি রসিকতার আর একটি নিদর্শন। পরে এই পদ্যটি "অন্যান্য কবিতায়" সংযোজিত হয়। পদ্যটি যথাক্রমে :

"এক যে ছিল রাজা—(থুড়ি,
রাজা নয় সে ডাইনি বুড়ি)!
তার যে ছিল ময়ূর-(না না,
ময়ূর কিসের? ছাগল ছানা)।
উঠোনে তার থাকত পোঁতা—
(বাড়িই নেই, তার উঠান কোথা)?
শুনেছি তার পিসতুতো ভাই—
-(ভাই নয়ত, মামা-গোঁসাই)।'...

পদ্য ছাড়াও সুকুমার রায়ের কিছু কিছু গল্পেও ননসেন্সের মেজাজটি পাওয়া যায়।

বাংলা পদ্যে ননসেন্সের ক্ষেত্রে যদিও লুইস ক্যারল বা এডওয়ার্ড লিয়রের মেজাজ পরিলক্ষিত হয় তবুও একথা নিঃসন্দেহে স্বীকার করা যায় সুকুমার রায়ের ননসেন্স তাঁর নিজস্ব। তার কল্পনার মনোরাজ্যে ছোটবড় সকলের অবস্থান। তাইতো আমাদের আকাঙ্খা পূরণ হয় যখন দেখি 'আকাশেতে ঝুল ঝোলে, কাঠে তাই গর্ত'—এমন অভিনব তত্ত্বে যিনি বিশ্বাসী, তাঁর প্রতি সমাজ কটাক্ষ করলেও, কাব্য তাকে স্থান না দিয়ে উপায় নেই। আসলে, সুকুমার রায়ের ননসেন্স অনেকখানি সুকুমারেরই সৃষ্টি।

সাহায্যকারী গ্রন্থ॥

১। সমগ্র শিশু সাহিত্য সুকুমার রায়। সম্পাদক—সত্যজিৎ রায় ও পার্থ বসু॥ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ।
২। দেশ॥ সুকুমার রায় স্মরণ সংখ্যা। ৬ অক্টোবর, ১৯৮৬।

সন্দেশ-সম্পাদক সুকুমার রায়

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

"এই সন্দেশ তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন হইয়া থাকুক। এখন হইতে যাঁহারা এই কাগজ চালাইবেন তাঁহারা যেন তাঁহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া, ইহাকে উপযুক্তরূপে পরিচালিত করিতে পারেন, ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করি।"

'সন্দেশ' পত্রিকায় তৃতীয় বর্ষ দশম সংখ্যায় (মাঘ, ১৩২২) 'স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোর' নামে লেখকের-স্বাক্ষরবিহীন যে-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়, তার শেষ কটি পঙ্‌ক্তিতে ব্যক্ত হ'য়েছিল এই আকাঙ্ক্ষা। লক্ষণীয় যে, এরপর কারা এই কাগজ চালাবেন, সে-কথার উল্লেখ নেই এখানে। অথচ, আমরা জানি, উপেন্দ্রকিশোর প্রতিষ্ঠিত 'সন্দেশ' পত্রিকা প্রথম পর্যায়ে চলেছিল তের বছর। উপেন্দ্রকিশোরের মৃত্যু হয় ৪ পৌষ, ১৩২২। আর 'সন্দেশ'-এর প্রথম সংখ্যা বেরোয় বৈশাখ, ১৩২০ তে। অর্থাৎ, তাঁর সম্পাদনায় 'সন্দেশ' বেরিয়েছিল তিন বছর ন' মাস।

তাঁর মৃত্যুর ঠিক পরের সংখ্যা থেকে কাগজের সম্পাদক হিসেবে কার নাম ছাপা হয়েছিল, তা যদি জানতে চান আজকের কোনও উৎসাহী পাঠক, সহজে থই পাবেন না। 'সন্দেশ'-এর অস্বাক্ষরিত অজস্র রচনা থেকে প্রতিটি লেখকের নাম শনাক্তকরণ যেমন কঠিন কাজ, এ-কাজও তার থেকে কম দুঃসাধ্য নয়।

প্রথমত, পুরনো 'সন্দেশ' আদ্যোপান্ত হাতে পাওয়াই দুষ্কর। যদি-বা বাঁধানো সেট পাওয়া যায়, মলাট অদৃশ্য। এমন-কি, বঙ্গীয় পরিষদ-এর মতো বিশিষ্ট পাঠাগারের গ্রন্থসূচী থেকেও বিভ্রান্তি বৃদ্ধিরই সম্ভাবনা। তাঁদের সূচীতে দেখানো রয়েছে প্রথম আট বছরের সম্পাদকরূপে উপেন্দ্রকিশোরের নাম, নবম বর্ষের সম্পাদক-রূপে সুকুমার রায়। পরবর্তী সময়ের জন্য—সুকুমার রায় ও সুবিনয়

রায়। স্বয়ং লীলা মজুমদার তাঁর 'উপেন্দ্রকিশোর' (নিউস্ক্রিপ্‌ট, বৈশাখ ১৯৮৫) গ্রন্থে লিখছেন : "যে মানুষটা চিরকাল নিজেই সব কাজ করে এসেছেন, তিনি এবার 'সন্দেশে'র ভার দিলেন সুকুমার সুবিনয়ের উপরে। তাঁরাও যোগ্যভাবে কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন।" (পৃঃ ৮৫)। এ-লেখা থেকেও মনে হতে পারে যে, 'সন্দেশ' পত্রিকার উপেন্দ্রকিশোর-পরবর্তী পর্যায়ের যুগ্মসম্পাদক বুঝি সুকুমার রায় ও সুবিনয় রায়।

অথচ এর সমর্থন মেলে না 'সন্দেশ'-এর পরবর্তী কালের কয়েকটি বিজ্ঞপ্তিতে। দশম বর্ষ অষ্টম সংখ্যায় (অগ্রহায়ণ, ১৩২৯) দেখা যাবে একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হচ্ছে : "গত দুই বৎসর ধরিয়া 'সন্দেশের' সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুকুমার রায় গুরুতর রোগে শয্যাগত থাকায়, সন্দেশের কাজ সাক্ষাৎভাবে দেখা অনেক সময়ই তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় না। এজন্য 'সন্দেশের' পরিচালনা কার্যে মাঝে মাঝে নিয়মের ত্রুটি হয়। তাহার জন্য তিনি বিশেষ দুঃখিত আছেন এবং আশা করেন যে, 'সন্দেশের' পাঠক পাঠিকারা এই ত্রুটি মার্জনা করিবেন।"

এখানে কিন্তু 'অন্যতর সম্পাদক বলা হয়নি। দুজনের নাম সম্পাদক-রূপে যদি থাকত, 'অন্যতর সম্পাদক'-রূপে সুকুমার রায়ের নামের উল্লেখ করাটাই হত স্বাভাবিক। আর তাঁর মৃত্যু-সংবাদ বেরুল যে-সংখ্যায়, সেখানেও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের শোকনিবন্ধে লেখা হল :

" 'সন্দেশ' সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুকুমার রায় আমাদের নিরাশ করিয়া শোকাচ্ছন্ন করিয়া গত ১০ সেপ্টেম্বর বেলা ৮-১৫ টার সময় পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন।" সেটা ছিল আশ্বিন, ১৩৩০। একাদশ বর্ষের ষষ্ঠ সংখ্যা।

বাইরে থেকেও উদ্ধার করা যায় দু-একটি স্মৃতিসাক্ষ্য। উপেন্দ্রকিশোরের মৃত্যুর পরবর্তী সন্দেশেই (মাঘ, ১৩২২) 'উপেন্দ্রকিশোর' নামে একটি শোকগর্ভ কবিতা ছাপা হয়েছিল।

লেখক—'পাহাড়িয়া পাখী' ছদ্মনামটি যে গিরিডিবাসী অভ্র-ব্যবসায়ী মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার, এ-কথা আমরা জেনে গেছি তাঁরই দৌহিত্রের রচিত এক স্মৃতিকথার সৌজন্যে। সেই দৌহিত্র, সুনির্মল বসু, ছিলেন তৎকালীন সন্দেশ পত্রিকার গ্রাহক, পরবর্তী কালের 'সন্দেশ' পত্রিকার লেখক। শুধু 'সন্দেশ' পত্রিকার লেখক বললে সুনির্মল বসু সম্পর্কে অবশ্য কমই বলা হয়। যাই হোক, উপেন্দ্রকিশোরের মৃত্যুতে সেই বালক সুনির্মল বসুর তাৎক্ষণিক এক প্রতিক্রিয়ার কথা তিনি নিজেই লিখে গেছেন তাঁর 'জীবন-খাতার কয়েক পাতা'য়ঃ "ইউ. রায়ের মৃত্যুতে আমি বিশেষ বিচলিত হলাম। সন্দেশে তাঁর আর লেখাও পাব না, ছবিও দেখতে পাব না। সব যেন অন্ধকার হয়ে গেল।···বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ বলে, 'আহা, এমন লোকটা মারা গেল। "সন্দেশ" বোধহয় বন্ধ হয়ে যাবে।'

কিন্তু সন্দেশ বন্ধ হোল না—তাঁর বড় ছেলে সুকুমার রায়ের সম্পাদনায় সন্দেশ রীতিমত আসতে লাগল।"

প্রতুলচন্দ্র গুপ্তও তাঁর আত্মস্মৃতি 'দিনগুলি মোর'-এ সন্দেশের গৌরবময় দিনেব সঙ্গে সুকুমার রায়ের সম্পর্কের উল্লেখ করেছেন। "সন্দেশ-এ তখন সুকুমার রায় নেই, তার অবস্থা পড়ে এসেছে। তবু অবনীন্দ্রনাথের 'খাতাঞ্চির খাতা' বারে বারে পড়ে কী আনন্দ পেয়েছি।" (পৃঃ ৫৩)। সন্দেশের গ্রাহক ছিলেন প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, ধাঁধার উত্তরদাতাদের তালিকায় বেরিয়েছে তাঁর নাম, তবু উদ্ধৃত অংশের শেষ বাক্যটি পড়ে মনে হয়, স্মৃতিতে অবিকল ছবি ধরে রাখতে পারেননি তিনি। কেননা, অবনীন্দ্রনাথের 'খাতাঞ্চির খাতা' সন্দেশে প্রকাশকালে তার ইলাসট্রেশন করেছিলেন স্বয়ং সুকুমার রায়। সেটা ছিল তেরশো সাতাশ বঙ্গাব্দ।

আসলে, 'সন্দেশ' পত্রিকার খুঁটিনাটি স্মৃতিতে ধরে রেখেছে এমন আত্মকথা দুর্লভ। যাঁরা 'সন্দেশ' পড়ে বড় হয়েছেন, তাঁরা কেউই তেমন আলাদা করে জানিয়ে যাননি, উপেন্দ্রকিশোরের 'সন্দেশ' সুকুমার রায়ের আমলে কী চেহারা পেয়েছিল, সুকুমার রায়ের মৃত্যু-

পরবর্তী 'সন্দেশ'-ই-বা রূপগত ও গুণগতভাবে কোনও বড় পরিবর্তন ধরে রেখেছে কী-না। কিছুটা ব্যতিক্রম সুনির্মল বসু। তাঁর জীবনস্মৃতিতে উপেন্দ্রকিশোরের পরবর্তী সন্দেশের অনেক ছবি স্পষ্ট করে আঁকা রয়েছে। আর, ব্যতিক্রম স্বয়ং সত্যজিৎ রায়। তিনিই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিখেছেন :

"উপেন্দ্রকিশোর তাঁর ছেলের সাহিত্য-প্রতিভার আভাস পেলেও, তার পূর্ব বিকাশ দেখে যেতে পারেননি। ১৯১৫ সালে বাহান্ন বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তার ফলে স্বভাবতই সন্দেশ সম্পাদনার ভার পড়ে সুকুমারের উপর।" (ভূমিকা। সমগ্র শিশুসাহিত্য : সুকুমার রায়—আনন্দ পাবলিশার্স।) শুধু তাই নয়, বিস্তৃত এই ভূমিকায় সম্পাদক সুকুমার রায় সম্পর্কেও একটি স্পষ্টরেখ ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। "এই সময়কার সন্দেশের যে-কোনো একটি সংখ্যা তুলে নিয়ে তার উপাদান বিশ্লেষণ করলে তা থেকে সার্থক শিশুসাহিত্যের কয়েকটি চিরন্তন সংজ্ঞার নির্দেশ পওয়া যায়। 'স্কুল স্টোরি' বাংলায় সন্দেশের আগেও লেখা হয়েছে, কিন্তু পাগলা দাশু ইত্যাদি গল্পের সুকুমার প্রথম দেখিয়ে দিলেন এসব গল্প কেমন হওয়া উচিত।" তাঁর এই উক্তি, কিংবা "শুধু গল্প কবিতা নয়, নানান বিষয়ে চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ, সারা বিশ্বের খুঁটিনাটি খবর, দেশ বিদেশের উপকথা, স্বরচিত ধাঁধা, হেঁয়ালি ইত্যাদিতে সন্দেশের পাতা ভরে ওঠে।"—এমন উক্তির সারাৎসার ফুটে উঠেছিল তাঁর সাম্প্রতিক একটি ভাষণে, চলতি পর্যায়ের 'সন্দেশ' পত্রিকার রজতজয়ন্তী উৎসবে (নন্দন প্রেক্ষাগৃহ, ১৬ মে ১৯৮৬) যখন তিনি আরও স্পষ্ট করে জানালেন—"বাবার সন্দেশের চেহারাটা ঠাকুর্দার সন্দেশের থেকে অনেক আলাদা হয়ে গেল। শিশুদের পত্রিকা থেকে হঠাৎই কিশোরদের পত্রিকা হয়ে উঠল। এটা যে খারাপ হল তা বলছি না, কিন্তু এটা একটা বড় পরিবর্তন।"

এই উক্তি অবলম্বন করেই আমরা দেখে নিতে চাইব সুকুমার রায়ের সম্পাদিত সন্দেশের চেহারা ও চরিত্র, তার লক্ষ্য ও অর্জন,

পরিবর্তন ও পরিবর্জন। বুঝে নিতে চাইব, আরেক সুকুমার রায়কে, যার চালচিত্রে রয়েছে সন্দেশের কয়েকটি দুর্লভ সংখ্যা।

'ছিল রুমাল, হয়ে গেল একটা বিড়াল।' বলা বাহুল্য, কোনও পত্রিকাতেই রাতারাতি এমন বদল ঘটে না। তবে সে-সময়ের সন্দেশের অব্যবহিত বদলের কিছুটা আভাস দিয়েছেন সুনির্মল বসু : "এখন থেকে সন্দেশে U.R এর ছবি কম দেখি S.R-এর ছবি বেশী দেখা যায়। S.R হচ্ছেন সুকুমার রায়। তাঁর হাতে আঁকা সন্দেশের রঙীন মলাট দেখলাম, একটা রঙীন পর্দা ছিঁড়ে একটি মেয়ের মুখ বার হয়েছে, মুখটি হাসি হাসি।

"আবার দেখলাম একটি বাঘের ছবির মলাট। ভিতরেও তাঁর রঙীন ছবি দেখতে পাই, একটা সেতুর নীচে দিয়ে জলের স্রোত বেগে ছুটে যাচ্ছে,—হনুমান সূর্যকে বগলে চাপতে যাচ্ছে,—বাঘের সঙ্গে বরাহের যুদ্ধ ইত্যাদি।

"প্রতি সংখ্যাতেই ইউ রায়ের অভাব অনুভব করি। তাঁর আঁকা বাল্মীকি, ত্রিপুরবিনাশ, বৃত্রাসুরের হাই, চামুণ্ডা ইত্যাদি মন-মাতানো রঙীন ছবি আর কে আঁকবে?" (জীবন-খাতার কয়েক পাতা, সুনির্মল রচনা-সম্ভার, তৃতীয় খণ্ড, ফরোয়ার্ড পাবলিশিং কনসার্ন, পৃঃ ২৬০-২৬১) আরেক ধরনের বদলের খবর পাই আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশিত 'সমগ্র শিশুসাহিত্য : সুকুমার রায়'-এর গ্রন্থ-পরিচয়ে। সেখানে জানানো হয়েছে : "উপেন্দ্রকিশোরের সম্পাদনাকালে 'সন্দেশ'-এ রায়চৌধুরী পরিবারভুক্ত কোনো লেখকের রচনা নামাঙ্কিত থাকত না। সুকুমার রায়ের সম্পাদনাকালেও সেই নিয়ম কিছুকাল প্রচলিত ছিল, পরে শুধু রায়-পরিবারের, বয়োজ্যেষ্ঠদের নাম বাদে, অধিকাংশ রচনায় লেখকের নাম মুদ্রিত হত না।" এই তথ্য অবশ্য সর্বাংশে গ্রহণ করা কঠিন। উপেন্দ্রকিশোরের আমলে যে নাম ছাপা হত না, সেটা সত্যি। 'আবোল তাবোল'-এর কোনো লেখাই যে সন্দেশে সুকুমার রায়ের স্বনামে বেরোয়নি, এ-কথা ভাবলে আজ বিস্ময় জাগে। কিন্তু নাম

না-ছাপার এই ব্যাপারটা খুব একটা নিয়ম মেনে চলেনি সুকুমার রায়ের আমলে। তাঁর নিজের লেখায় কখনও নাম ছিল না ঠিকই, কিন্তু বয়োজ্যেষ্ঠদের ক্ষেত্রে বা কনিষ্ঠদের ক্ষেত্রে নাম ছাপা সম্পর্কে তেমন কোনও স্থির নিয়মের ব্যাপারে চোখে পড়ে না। উপেন্দ্রকিশোর-এর মৃত্যুর অব্যবহিত পরের সংখ্যাতেই 'রোস্তম্ ও সোরাব'-এর লেখক হিসাবে কুলদারঞ্জন রায়ের নাম ছাপা হয়েছে। চতুর্থ বর্ষেও 'গর্গনের মুণ্ডু' শীর্ষক দু-সংখ্যা জোড়া গ্রীক-উপকথায় প্রথম সংখ্যায় কুলদারঞ্জনের নাম নেই; পরের সংখ্যায় তাঁর নাম ছাপা হয়েছে। চতুর্থ বর্ষেই বেরিয়েছে সুখলতা রাওয়ের 'পড়ার ঠেলা'র (৪/২) সঙ্গে নাম। চতুর্থ বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় 'পাকা রাঁধুনী'র লেখিকা শান্তিলতা চৌধুরীর নাম পাওয়া যাচ্ছে। দ্বাদশ সংখ্যায় স্বনামে ইলা রায়কেও। ষষ্ঠ বর্ষে ঘুরে-ফিরেই ছাপা হয়েছে সুবিনয় রায়ের নাম। পুণ্যলতা চক্রবর্তীর নামও। সুবিমল রায়ের স্বনামেও লেখা ছাপা হয়েছে। একাদশ বর্ষের দ্বিতীয়, তৃতীয় সংখ্যায় চোখে পড়ে সুবিমল রায়ের নাম। সুকুমার রায় তখনও জীবিত।

সুকুমার রায় কখনও তাঁর সম্পাদনাকালে সন্দেশে স্বনামে কিছু লেখেননি এটা সত্যি, লেখেননি উপেন্দ্রকিশোরেব আমলেও। কিন্তু আরেকটি কৌতূহলকর তথ্যও এখানে উল্লেখযোগ্য। তাঁব মৃত্যুর ঠিক অব্যবহিত পূর্বে 'উহ্যনাম পণ্ডিত' ছদ্মনামে সুকুমার রায়ের তিনটি নিবন্ধ সন্দেশে প্রকাশিত হয়েছিল। ননসেন্স ক্লাবের মুখপত্র 'সাড়ে বত্রিশ ভাজা' নামে হাতে-লেখা পত্রিকায় সুকুমার রায় যে-'উহ্যনাম পণ্ডিত' ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন, সেই নামটি কেন হঠাৎ ফিরে এল সন্দেশের তের শ' ত্রিশ সালের শ্রাবণে ও ভাদ্রে, সেটা নিশ্চিত কৌতূহলের বিষয়। এই প্রসঙ্গেই স্মরণীয় যে, 'উহ্যনাম পণ্ডিত' নামে লেখা 'অদ্ভুত জীব' নিবন্ধটি কোনও অজ্ঞাত কারণে আনন্দ পাবলিশার্স-এর 'সমগ্র শিশুসাহিত্য'-এর অন্তর্ভুক্ত হয়নি, গ্রন্থ-পরিচয়েও লেখাটি প্রসঙ্গ অনুল্লিখিত।

আনন্দ পাবলিশার্স-এর সমগ্র শিশুসাহিত্যের গ্রন্থ-পরিচয়ের

আরেকটি তথ্য সম্পাদক সুকুমার রায় সম্পর্কে জানাচ্ছে : "সম্পাদক হিসেবে সুকুমার রায় অন্য লেখকের রচনা যথেষ্ট রকম সংশোধন ও পরিমার্জনা করতেন।" এ-তথ্যের গুরুত্ব অবশ্য উপলব্ধি করা যায়, আবোল-তাবোলের কবিতাগুলির সন্দেশে মুদ্রিত পাঠের সঙ্গে গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত পাঠের পাশাপাশি চেহারাটা মিলিয়ে দেখলে। এর অধিকাংশই তুলে ধরেছেন শঙ্খ ঘোষ তাঁর 'অসম্ভবের ছন্দ' প্রবন্ধে। শুধু তথ্য হিসেবে কৌতূহলকর হবে ভেবে সেই তালিকায় সংযোজন করতে হয়, সন্দেশ মাঘ ১৩২১-এ প্রকাশিত 'খিচুড়ি' কবিতাটি। সন্দেশের পৃষ্ঠায় কিন্তু কবিতাটি ছিল মাত্র বার পঙ্‌ক্তির। 'হাতিমি' ও 'সিংহরিণ' শব্দ দুটি কল্পনা করার ভার সুকুমার রায় ছেড়ে দিয়েছিলেন সন্দেশেও ক্ষুদে পাঠকদের উপর। হাঁসজারু' 'বকচ্ছপ' বা 'গিরগিটিয়া'র ধরনেই শুধুমাত্র ছবি দুটি এঁকে দিয়েছিলেন তিনি, তলায় প্রশ্ন ছিল, "এ দুইটার কি নাম বলত ?"

কিন্তু এই সঙ্গে এ-কথাও বলতে হয় যে, সম্পাদক সুকুমার রায় অন্য লেখকের রচনা ঠিক কী ধরনের সংশোধন ও পরিমার্জনা করতেন, তা জানার কোনও উপায় নেই। লীলা মজুমদার 'আর কোনোখানেতে জানিয়েছেন, "দুটো গল্প লিখে দিলাম, একটা বড়দা নিশ্চয় তখুনি ছেঁড়া কাগজের বাক্সে ফেলে দিয়েছিলেন, অন্যটা একটু সংক্ষিপ্ত করে নিয়ে ছেপেছিলেন" (পৃঃ ৮৮)। আর, সুনির্মল বসুর আত্মজীবনীতে রয়েছে—"লুকিয়ে লেখা পাঠালাম। মাসের পর মাস গত হয়,—প্রতি মাসেই আকুল আগ্রহ,—'সন্দেশ' আসে, কত সুন্দর গল্প কবিতার গাদা—কিন্তু হায় কোথায় সেখানে এই শিশুকবির স্থান!" কিন্তু সন্দেশ-সম্পাদকের সম্পর্কে এ-তথ্যও পৌঁছে দেয় না কোনও বিশেষ বা নির্দিষ্ট জায়গায়।

তবে সন্দেশের যে-গুণ লক্ষ করেছেন বুদ্ধদেব বসু, "সমস্ত বিভিন্ন রচনার মধ্যে এমন একটি সংগতি ছিলো সুরে, এমন একটি অখণ্ডতা ছিলো এই পত্রিকাটির চরিত্রে, যে অনেক সময় পুরো সংখ্যাটা একজনেরই রচনা বলে মনে হ'তো" (সাহিত্যচর্চা, সিগনেট প্রেস,

পৃঃ ৪৮) তা নিশ্চয়ই ফুটিয়ে তোলে আদ্যন্ত পরিমার্জনাকারী, সুরের ঐকতান ঘটানো এক পরিশ্রমী সম্পাদকের মূর্তি। সেই বিশেষ মূর্তিটি যে সুকুমার রায়েরই, সে-কথাও স্পষ্ট করে জানিয়েছেন বুদ্ধদেব বসু তাঁর ওই নিবন্ধের পরবর্তী অংশে।

৩

সুকুমার রায়ের স্বভাবের মধ্যে যে 'বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির গাম্ভীর্য' লক্ষ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তার বিস্তর প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে সন্দেশের পৃষ্ঠায়। ছোটদের শুধু আজগুবি আর অসম্ভবের ছন্দ দিয়েই ভোলাতে আর দোলাতে চাননি তিনি, সব দিক থেকে চৌকশ করে তুলতেও চেয়েছিলেন। 'সন্দেশ' পত্রিকা তাঁর হাতে আসে তৃতীয় বর্ষের দশম সংখ্যা থেকে। দ্বাদশ সংখ্যাতেই ছাপা হয়েছে দুটি নতুন স্বাদের কৌতূহলকর নিবন্ধ। তাব এক 'জেনে রাখ'। প্রচলিত কিছু ভ্রান্ত ধারণাকে দূর করার চেষ্টা ছিল এই বৈজ্ঞানিক তথ্য-নির্ভর নিবন্ধে। এই ফীচারটিকে পরে কেন চালানো হয়নি জানি না, কিন্তু প্রথমবারের লেখাগুলির বস্তুতই কৌতূহল-জাগানো। দু-একটি দৃষ্টান্ত: "আমরা যাকে লেড পেনসিল (লেড মানে সীসা) বলি, তার মধ্যে মোটেই সীসা থাকে না। কয়লা-জাতীয় একরকম জিনিস দিয়ে তার শিষ তৈয়ারী হয়।" কিংবা "অনেকের ধারণা যে উটের কুঁজের মধ্যে জল থাকে। সেটা কিন্তু কেবল চর্বিতে ভরা।" অথবা, "গরু কখনও মাথা নীচু করে কাউকে তাড়া করে না ;—ছবিতে কিন্তু প্রায়ই সেই রকম আঁকা হয়। তাড়া করবার সময় তারা মাথাটিতে উঁচুই রাখে।" সাধারণ-জ্ঞানকে ধনী করার মতো ফীচার এটি।

চতুর্থ বর্ষ পঞ্চম সংখ্যায় (ভাদ্র, ১৩২৩) ছাপা হয়েছিল 'এক হল দুই নামে জ্যোতির্ময়ী দেবীর একটি মজার অঙ্ক-ভিত্তিক গল্প। সেই গল্পের মধ্যে 'ক' 'খ' ইত্যাদি দিয়ে একটা অঙ্ক কষার ব্যাপার ছিল। পাছে সন্দেশের পড়ুয়াপাঠকরা সে-গল্পের রস ও মর্মগ্রহণে বাধা পায়

তাই গল্পটির পাদটীকায় সম্পাদক জুড়ে দিয়েছিলেন : "সন্দেশের পাঠক পাঠিকাগণের মধ্যে যাঁহারা বীজগণিত পড়েছেন, তাঁদের কাছে রাজপুত্রের অঙ্কটা বোঝা শক্ত হবে না। ইংরাজীতে লিখতে গেলে অঙ্কটা লিখতে হবে—

$$a=b \therefore ab=b^2 \therefore ab-a^2=b^2-a^2$$

$$\text{or } a(b-a)=(b+a)(b-a)$$

$$\therefore a=b+a=2a$$"

সম্পাদকের এই বিজ্ঞানী মনই প্রিয়ম্বদা দেবীকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে অষ্ট্রেলিয়ার ওয়েলার ঘোড়া সম্পর্কে আলোচনা, 'কালা' নামে যা কিনা ছাপা হয়েছিল অগ্রহায়ণ ১৩২৩ (চতুর্থ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যায়)। এই সংখ্যা থেকেই সন্দেশে জীব-জগতের বিচিত্র খবর দেখা দিয়েছেন উড়িষ্যাবাসী, বিজ্ঞান-সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু 'মেজ দাদামশাই' ছদ্মনামে। এ-সংখ্যায় তাঁর লেখার নাম—'রাক্ষসে মাকড়সা'; পরের সংখ্যায় তিনি যে শোনাবেন কাঁকড়া বিছে আর তেঁতুল বিছের কথা তাও বলে রেখেছেন তিনি। গল্পের মতো করে বৈজ্ঞানিক বিষয় লিখতেন তিনি।

'রাক্ষুসে মাকড়সা'র কথাতেই মনে পড়ল, চতুর্থ বর্ষের অষ্টম এই সংখ্যার একেবারে প্রথম পৃষ্ঠায় পুরো পাতা জোড়া ছবির কথা। সেই ছবিরও বিষয় 'রাক্ষুসে মাকড়সা'। এর আগে ষষ্ঠ সংখ্যায় (শ্রাবণ, ১৩২৩) একইভাবে প্রথম ছবি হিসেবে মুদ্রিত হয়েছিল 'রাক্ষুসে কাঁকড়া' নামে পুরো পাতা রঙীন ছবি। সেই ছবির সূত্রে ভিতরে ছাপা হয়েছিল তথ্যমূলক এক বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ, 'অদ্ভুত কাঁকড়া'। অনামী লেখকের সেই রচনাটি যে সম্পাদক সুকুমার রায় স্বয়ং লিখে-ছিলেন, এ-তথ্য আজ আর অজানা নয়। শুধু আজও অবাক করে তা হল, এখনকার 'প্রচ্ছদ-কাহিনী'র আদলটুকু সেই তখনকার দিনে কীভাবে শুরু হয়েছিল। এই ছবি-ছাপার ব্যাপারটা শুরু করেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর। 'সন্দেশে' তখন থাকত ভিতরের কোনো গল্পের কিংবা প্রথম ছবির পৃষ্ঠার কবিতার সূত্রে পুরো পাতা ছবি। সুকুমার

রায়ের আমলে প্রথম ছবির লেখাকে বিজ্ঞানধর্মী করে তোলার চেষ্টা দেখা যায়। সব সংখ্যায় না হলেও প্রায়ই।

আর এই বিজ্ঞানমুখী লেখাগুলি যাতে কোনক্রমেই দুষ্পাচ্য, 'গুরুপাক বিবরণ না হয়ে ওঠে তার দিকে কী আশ্চর্য নজর দিতেন সম্পাদক সুকুমার রায়, তা তাঁর রচনাবলীর অন্তর্গত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলীর উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেই ধরা পড়বে। আমাদের মনে পড়তে পারে, মানডে ক্লাবের মুখপত্র সাড়ে বত্রিশ ভাজা হাতে-লেখা পত্রিকায় 'সম্পাদকের দশা' কবিতায় তাঁর সাবধান -বাণী, যেখানে তিনি বলছেন- -

লেখকবৃন্দের প্রতি আছে এক নিবেদন।
না লেখেন কভু যেন গুরুপাক বিবরণ ॥
পেচকের মত সবে হাঁড়িমুখ নিরবধি।
গম্ভীর গম্ভীরতম প্রবন্ধ লিখেন যদি ॥
নিস্ফূর্তি নির্জীব সভা একদম হবে মাটি ॥

এই উপদেশবাণী সন্দেশের প্রতিটি প্রবন্ধে নিজে অনুসরণ করে দেখাতেন সুকুমার রায়। চতুর্থ বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় হাফটোন সম্পর্কে একটি লেখা ছাপা হয়েছে। এই উকুন থেকে হাফটোনে পৌঁছে যান 'মলম'-এ, 'পোলাও' থেকে 'পায়েস'-এ। শুধু কি উকুনের ছবি? এই সংখ্যাতেই একটি ইলাসট্রেশনে বাঘের ছবি এঁকেছিলেন সুকুকার রায়, এই প্রবন্ধে সেই ছবির প্রসঙ্গও আনা হয়েছে আরেকটি বিন্দু-শোভিত ব্লক ছেপে। সঙ্গে মন্তব্য করা হয়েছে: "৪১ পৃষ্ঠায় যে বাঘের ছবি আছে, তারই চোখের কাছের খানিকটা অংশ খুব বড় ক'রে দেখান হয়েছে। সন্দেশের প্রায় সব ছবিতেই আগাগোড়া এইরকম ছোট বড় বিন্দু দেখতে পাবে। কেবল এই রকম বিন্দু বিন্দু ফুটকি দিয়ে সাদা কালো ফলিয়ে যে ছবি তৈরী করা হয়, তাকে বলে "হাফটোন"। সন্দেশের প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয় আমাদের দেশে হাফটোন শিল্পের প্রচলন ক'রে তার অনেকরকম উন্নতি ক'রে গিয়েছেন।"

এইভাবেই 'সন্দেশের ধাঁধার উত্তর থেকে সুকুমার রায় পৌঁছে যান 'ডাকঘরের কথা'য়, মহাভারত থেকে 'ক্লোরোফর্ম-এ, 'ভুঁইফোঁড়া' কেঁচো থেকে টিউবরেলের প্রসঙ্গে, 'রাবণের চিতা' থেকে গিরিডির কয়লাখনিতে।

শুধু চারপাশের প্রকৃতি আর বিজ্ঞানই নয়, সমকালীন পৃথিবীও যাতে সন্দেশের ক্ষুদে পাঠকদের মনের দরজায় এসে ছায়া ফেলে সে-সম্পর্কেও সতর্ক লক্ষ ছিল সুকুমার রায়ের। মার্কিন বিজ্ঞানী গডার্ড যখন রকেট বানালেন, ঠিক তখনি সন্দেশের পাতায় সুকুমার রায় লিখলেন চাঁদমারি (আষাঢ় ১৩২৭), ১৩২৯-এর ভাদ্র সংখ্যায় বেতার নিয়ে 'আকাশবাণীর কল' (তখনও রবীন্দ্রনাথ ,আকাশবাণী' নামটি দেননি), রোটারি মেশিন নিয়ে 'ছাপাখানার কথা' এয়ার-মেইল নিয়ে 'ডাকের কথা'—এমন অসংখ্য সমকালীন বিষয় সন্দেশের পৃষ্ঠায় হাজির করেছেন সুকুমার রায়। উপেন্দ্রকিশোরের সন্দেশের প্রথম সংখ্যায় সেই-যে লেখা হয়েছিল—"আমরা যে সন্দেশ খাই, তাহার দুটি গুণ আছে। উহা খাইতে ভাল লাগে, আর উহাতে শরীরের বল হয়। আমাদের এই যে পত্রিকাখানি 'সন্দেশ' নাম লইয়া সকলের নিকটে উপস্থিত হইতেছে, ইহাতেও যদি এই দুটি গুণ থাকে, অর্থাৎ ইহা পড়িয়া যদি সকলের ভাল লাগে আর কিছু উপকার হয়, তবেই ইহার 'সন্দেশ' নাম সার্থক হইবে"—সন্দেহ নেই, সুকুমার রায় সম্পাদিত 'সন্দেশ' সেই সার্থকতাকে অর্জন করতে ছিল বদ্ধপরিকর।

৪

প্রত্যেক পত্রিকাই তৈরি করে নেয় নিজস্ব একটি লেখকগোষ্ঠী। সুকুমার রায় যখন 'সন্দেশে'র সম্পাদক হলেন, তখন এই পত্রিকার বয়স সাড়ে তিন পেরিয়ে গিয়েছি। প্রথম বর্ষেই লিখেছেন সত্যেন্দ্র-নাথ দত্ত, অবনীন্দ্রঠাকুর, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, কালিদাস রায়, বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রমুখ। দ্বিতীয় বছরে এসেছেন মাত্র প্রমথ চৌধুরী। বোঝায় রায় পরিবারভুক্ত লেখকের রচনাই ভরিয়ে তুলত

এ-কাগজের পৃষ্ঠা। অজস্র স্বাক্ষরহীন রচনা বেরুত। তার মধ্যে সুকুমার রায় একাই ছিলেন আলাদা এক আকর্ষণ। তাঁকে ঘিরেই, সেই অস্বাক্ষরিত রচনা কেন্দ্র করেই যে পাঠকমহলে তৈরি হয়েছিল আলাদা এক কৌতূহল, সে-কথা আমরা জেনেছি বুদ্ধদেব বসুর সৌজন্যে ও সুনির্মল বসুর স্মৃতিকথায়। সুকুমার রায়ও যে সন্দেশের তার কাঁধে নেবার পর নিজের সৃষ্টি দিনে-দিনে বাড়িয়ে চলেছিলেন, তার সাক্ষ্য রয়েছে সত্যজিৎ রায়ের রচনায়, রয়েছে তাঁর সম্পাদিত সন্দেশের পৃষ্ঠায়। এর বইয়ে, তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব রবীন্দ্রনাথের লেখা আদায় করা। একাদশ বর্ষের প্রথম সংখ্যায় ব্লক করে ছাপা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'সময় হারা' কবিতা। সীতা দেবীর 'নিরেট গুরুর কাহিনী' ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছে তাঁর সম্পাদিত সন্দেশে।

অবনীন্দ্রনাথের 'খাতাঞ্চির খাতা'ও। শিবনাথ শাস্ত্রীর কবিতা ছাপা হয়েছে সপ্তম বর্ষের সপ্তম সংখ্যায়। সপ্তম বর্ষেই পাওয়া যাচ্ছে মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম। কিন্তু সব সত্ত্বেও 'সন্দেশ' পারিবারিক পত্রিকার চরিত্রটি কখনও হারায়নি। কুলদারঞ্জন লিখছেন পৌরাণিক কাহিনী, প্রমদারঞ্জন শোনাচ্ছেন বনের খবর, দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু পাঠাচ্ছেন জীব-জগতের বিচিত্র সংবাদ, সুখলতা রায় লিখছেন জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ ও প্রেরণা-জোগানো কবিতা, তথ্য-ভরপুর প্রবন্ধ ও নীতি-প্রচারক গল্প লিখছেন সুবিমল রায় ও সুবিনয় রায়—এ প্রায় সন্দেশের চেনা চরিত্র। উপেন্দ্রকিশোরের পত্র-পত্রিকায় পূর্ব প্রকাশিত ও দুষ্প্রাপ্য কিছু লেখা ধারাবাহিকভাবে বেরুতো সুকুমার রায় সম্পাদিত সন্দেশে, নাম দেওয়া হয়েছিল—'পুরাতন লেখা'। সুকুমার রায়ের আগেও যেমন, সুকুমারের সময়েও তেমনই, 'সন্দেশে'র স্বাক্ষরিত বহু কবিতার মান কখনোই ছুঁতে পারেনি অন্যান্য রচনার গৌরবময় উচ্চতা। বলা বাহুল্য, সুকুমার রায় এ-আলোচনার বাইরে অন্যান্য নামী লেখকদের কথাও ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। কিন্তু সাধারণভাবে এ কথা ভেবে অবাক লাগে যে, যাঁর নিজের কবিতা এমন অভাবনীয়ের রুচিৎ কিরণে দীপ্ত, তাঁর

সম্পাদিত কাগজে কীভাবে মনোনয়নের ছাড়পত্র পেয়ে যায়—

'মধুর প্রভাতে পৃথিবী সাজাতে
বনে ফুটে কত ফুল,
লইবারে মধু আসিয়াছে শুধু
পিপাসিত অলিকুল।

জাতীয় রচনা।

আরেকটি প্রশ্নও সাধারণভাবে জাগতে পারে। তা হল, জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন সম্পর্কে কোনও খবর কেন সন্দেশের পাতায় নেই। লীলা মজুমদার তাঁর 'উপেন্দ্রকিশোর' গ্রন্থে এক ধরনের উত্তর দিয়েছেন, সেটা অবশ্য অন্য দিক থেকে দেখা। তিনি লিখছেন—"দেশসেবার যত রকম কাজ আছে তার মধ্যে দেশের ছেলেমেয়েদের নির্ভীক বলিষ্ঠ সত্যনিষ্ঠ করে মানুষ করে দেওয়া শ্রেষ্ঠ স্থান দাবী করতে পারে। 'সন্দেশে'র মধ্যেও এই রকম একটা আদর্শ স্থাপন করবার চেষ্টা চলত।" (পৃঃ ৮১)। এর পরেই তিনি যা লিখেছেন তার মধ্যেই বরং কিছুটা উত্তর প্রচ্ছন্ন রয়েছে। সন্দেশের উদ্দেশ্য ছিল, তাঁর মতে, "দেশের যা কিছু গৌরবের বিষয় তাই নিয়ে আলোচনা, দেশের যেসব হাস্যকর দুর্বলতা তাই নিয়ে পরিহাস। এ পরিহাসের মধ্যে কোনো ঝাঁঝ ছিল না, কিন্তু যাদের নিয়ে ঠাট্টাটি করা হল, তারা ঠিকই বুঝত।" স্পষ্টতই এখানে তিনি সুকুমার রায়ের কবিতাগুলির উল্লেখ করতে চেয়েছেন। হতেও পারে যে, নিজের লেখার অন্তর্নিহিত ব্যঙ্গ সম্পর্কে সচেতন সুকুমার রায় আলাদা করে রাজনৈতিক প্রসঙ্গে টানতে চাননি কিশোর পাঠক পাঠিকাদের। এই প্রসঙ্গেই আমাদের মনে পড়তে পারে 'কল্লোল' পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যায় বুদ্ধদেব বসুর সেই বিখ্যাত উক্তি, "আবোল তাবোল শিশুপাঠ্য গ্রন্থ হলেও এ থেকে সবচেয়ে বেশি আনন্দ পাবে পরিণত বয়সের লোকরাই। কারণ এর humour এত subtle যে, তা বুঝতে পারার মত রসবোধ খুব অল্প শিশুরই হয়ে থাকে।" (কল্লোল, চৈত্র ১৩৩২)। এ ছাড়া 'প্রস্তুতিপর্ব,

সুকুমার রায়' বিশেষ সংখ্যায় অনুপম মজুমদার-এর 'সময়ের আয়নায় আবোল-তাবোল' প্রবন্ধে যেভাবে সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে মিলিয়ে 'আবোল-তাবোল' এর কবিতার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে, তা আমাদেব পূর্বোক্ত ধারণাকেই সুদৃঢ় করে।

'সন্দেশ' পত্রিকার ভার নেবার পর সুকুমার বায় যে এই পত্রিকার আকর্ষণ—হয়তো একই সঙ্গে যে এই পত্রিকার আকর্ষণ—হয়তো একই সঙ্গে বিক্রিও—বাড়াবার চেষ্টা করেছিলেন তা বোঝা যায়, চতুর্থ বর্ষের চতুর্থ ও পঞ্চম সংখ্যার দুটি বিজ্ঞপ্তি থেকে। চতুর্থ স‌ংখ্যায় লেখা হল—"প্রতি মাসে ১৫ই তারিখের মধ্যে যাঁহারা ধাঁধার ঠিক উত্তর পাঠাইবেন, এখন হইতে তাঁহাদেব নাম সন্দেশে প্রকাশ করা হইবে।"

পরের সংখ্যাতেই দেখছি বিজ্ঞপ্তিটিকে ঈষৎ বদল করা হযেছে ঃ "ভবিষ্যতে, ধাঁধার উত্তর পাঠাইবার সময় গ্রাহক নম্বর দিতে হইবে। গ্রাহক নম্বর না লিখিলে নাম প্রকাশ করা হইবে না।১৫ তারিখের মধ্যে উত্তর পাঠাইতে হইবে।"—এই বিজ্ঞপ্তি ছাপা হযেছিল সে-সংখ্যায় ধাঁধার উত্তরদাতাদের নামের তালিকার তলায। বলা বাহুল্য, সংশোধিত এই বিজ্ঞপ্তির প্রলোভনে গ্রাহক তালিকার কলেবর সাধারণভাবে বৃদ্ধি পাবারই কথা। সন্দেশেব ধাঁধার উত্তর-দাতাদের নামের তালিকার তলায়। বলা বাহুল্য, সংশোধিত এই বিজ্ঞপ্তির প্রলোভনে গ্রাহক তালিকার কলেবর সাধারণভাবে বৃদ্ধি পাবারই কথা। সন্দেশের ধাঁধার পাতার যে আলাদা একটা আকর্ষণও ছিল সে-কথাও এ-প্রসঙ্গে বলা সঙ্গত।

সুবিনয় রায়ের সন্দেশে প্রকাশিত ধাঁধা নিয়ে 'বলো তো' নামের যে বই বেরিয়েছিল, তা আজও ধাঁধার জগতে এক বৈপ্লবিক গ্রন্থ। সুকুমার রায় নিজেও সন্দেশের জন্য নানা ধরনের হেঁয়ালি ও ধাঁধা তৈরি করেছিলেন। এমন কি, ধাঁধার সূত্রে তাঁর দু একটি কবিতাও জড়িত। দশম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় সন্দেশে প্রকাশিত হয়েছিল

সুকুমার রায়ের আঁকায়-লেখায় 'ছবি ও গল্প' (সমগ্র শিশুসাহিত্যের ২৪ পৃষ্ঠায় দেখা যেতে পারে)। প্রবাদ-প্রবচনকে ছড়া-ছবিতে রূপ দেওয়া হয়েছিল সেখানে। যেমন, রাগে আগুন, চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করা, আহ্লাদে আটখানা হওয়া—ইত্যাদির ছবি ছিল। সেবারই আশ্বিনে (দশম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা) বেরুল সমধর্মী একটি ধাঁধা ছবি দেখে বাব করতে হবে মানানসই প্রবাদবাক্য। সেখানে ছিল —বানরের গলায় মুকুতার হার, পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা, গরু মেরে জুতো দান প্রভৃতি বাক্যের অলঙ্করণ, ধাঁধা হিসেবে দেওয়া। এ-ছাড়া প্রবাদবাক্য উল্টে ধাঁধা বানানো (যেমন, ঘবায়ঙ্গা ডারমীকু লেজ—জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ), শব্দ-বদল (মামাকে মাসী করে জাতীয়), শব্দচৌকি টোপোলজির উপর ভিত্তি করে বানানো ধাঁধা, অঙ্কের ধাঁধা অঙ্কের ধাঁধা ইত্যাদি সন্দেশের ধাঁধার পাতার বৈচিত্র্যময়তাব নিদর্শন। 'মজার খেলা' ও হেঁয়ালি বানাতেও সুকুমার রায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত। চতুর্থ বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যায় বেরিয়েছিল পাশাপাশি দুটি ছবি। একদিকে ছাগলের মুণ্ডু, তার উপরে নীচে নীচে দুটি লাইনে লেখা 'তার মনিবটি এক পাগল এক যে ছিল ছাগল'। পরের ছবিটি বিস্তর হিজিবিজি রেখায় লেখা, তার নিচে প্রশ্ন 'এটা পড় দেখি'। কার সাধ্যে সে-লেখা উদ্ধার করে। ১৩২৮-এর ফাল্গুনে প্রকাশিত 'ভুল গল্প' ('পাগলা দাশু'র অন্তর্গত) কিংবা ১৩২৫-এর কার্তিকে প্রকাশিত 'মজার খেলা' বা ১৩২৭-এর 'মামার খেলা' (বিবিধ পর্যায়ে সমগ্র শিশুসাহিত্যে অন্তর্ভুক্ত) পড়লে বোঝা যায় অসাধারণ মজা তৈরির কী দুর্লভ ক্ষমতা ছিল তাঁর। 'ভুল গল্প' তো একটা আলাদা ধারাই তৈরি করেছে বলা যেতে পারে। 'সন্দেশে' প্রকাশিত ধাঁধা হেঁয়ালির সবই যে সম্পূর্ণ মৌলিক চিন্তার ফসল, তা নয়। কিন্তু তাতে ক্ষতি নেই।

আসলে সম্পাদক হিসেবে সুকুমার রায় সাত রাজ্যের মজা এনে হাজির করেছিলেন তাঁর পত্রিকায়। উপেন্দ্রকিশোরের আমলে যা ছিল বিশুদ্ধ শিশুসেব্য, তাঁর আমলে তা যে ক্রমশ আরেকটু বড়ো

বয়সীদের জন্য নিজেকে বদলে নিচ্ছে, বোঝা যায়—প্রতি সংখ্যায় সন্দেশের অল্প-অল্প করে চেহারা-চরিত্রের পরিবর্তনে। তৈরী ঐতিহ্য ভাঙতে হয়নি তাঁকে, কিন্তু ওই কাঠামোর মধ্যেই একটু একটু করে বদলে দিচ্ছিলেন বুদ্ধির স্তর, রসগ্রহণের বয়সের উর্ধ্বসীমা। এই বদলের মূলে, এর পিছনে তাঁর নিজের লেখার অবদানই সব থেকে বেশি। সত্যজিৎ রায় যেমন উল্লেখ করেছেন 'পাগলা দাশু'র দৃষ্টান্ত। শুধু কবিত -গল্পই নয়, জীবনী, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, জীবজগতের কথা, ধাঁধা, দেশ বিদেশের টুকরো খবর সাজিয়ে পরিবেশন, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, আবিষ্কারের গল্প, অভিমানের বৃত্তান্ত, ফীলাব, এ-সমস্ত কিছুর মধ্যেই রয়েছে সেই বদলের সাক্ষ্য, কিশোরদের প্রতি এক গভীর অনুরাগের চিহ্ন। সন্দেশ-সম্পাদক হিসেবে সুকুমার রায়ের চেষ্টা যেমন খেলাচ্ছলে পাঠক পাঠিকাকে শিক্ষিত ও চৌকশ করে তোলার, অন্যদিকে তাদের বন্ধু হবারও। সন্দেশের লেখায় তাই একদিকে শিক্ষা, অন্যদিকে মজা। 'সন্দেশ' যেমন তৈরি করেছে তার পাঠকপাঠিকাকে, 'সন্দেশ' তেমনই তৈরি করেছে তার সম্পাদককেও।

৫

বস্তুত, সন্দেশ পত্রিকার সব ছাপানো বড় কীর্তি লেখক সুকুমার রায়কে প্রস্ফুটিত করে তোলা। প্রথম পর্যায়ের 'সন্দেশ' পত্রিকার সব থেকে বেশী সময়ের জন্য সম্পাদনার ভার নিতে হয়েছিল তাঁকে। আর সেই দায়ভারই তাঁকে বাধ্য করে তুলেছিল আরও বেশী করে কিশোরসাহিত্য রচনা করতে। আমাদের মনে রাখতে হবে, আবোল-তাবোলের সমস্ত কবিতা বেরিয়েছিল 'সন্দেশ' পত্রিকায়। এই পত্রিকাতেই ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল হ য ব র ল। মনে রাখতে হবে যে, সন্দেশে প্রকাশিত সুকুমার রায়ের 'হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরি'ই অনুপ্রাণিত করেছিল সত্যজিৎ রায়কে, তাঁর অদ্বিতীয় শঙ্কু-চরিত্রের আদি কল্পনায়। আর এসব লেখার সবই প্রায় সুকুমার রায়ের আমলে।

চলতি পর্যায়ের 'সন্দেশ' না বেরুলে যেমন আমরা পেতাম না লেখক সত্যজিৎ রায়কে, একইভাবে, প্রথম-পর্যায়ের 'সন্দেশ' সম্পাদনার কাছে জড়িয়ে না পড়লে পুরোপুরি পেতাম না সুকুমার রায়কেও। উপেন্দ্রকিশোরের সম্পাদনাকালে সুকুমার রায়ের রচনার সংখ্যা ও স্ব-সম্পাদিত কাগজে সুকুমার রায়ের রচনার সংখ্যার একটা তুলনামূলক হিসেব নিলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। সুকুমার রায়ের দুরারোগ্য ব্যাধির জন্য 'সন্দেশ' পত্রিকা যে অনিয়মিত হয়ে পড়েছিল এমন-কি বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রমও হয়েছিল, তা আমাদের জানিয়ে দেয় 'সন্দেশে' প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি। এমন একটি বিজ্ঞপ্তির উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। সপ্তম বর্ষের অষ্টম ও নবম সংখ্যা (অগ্রহায়ণ ও পৌষ ১৩২৬) যখন যুগ্ম-সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হল তখনও সম্পাদক এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন : 'মাঘ ফাল্গুনের "সন্দেশ" ছাপা হইতেছে, ২রা বৈশাখ বাহির হইবে। চৈত্রের সংখ্যা ১০ই বৈশাখ বাহির হইবে। তাহার পর, যদি আগামী বৎসর হইতে বেশ নিয়মিত ও সুন্দরভাবে সন্দেশ চালান সম্ভব হয়, তবে ২৫শে বৈশাখ নূতন বৎসরের নূতন সন্দেশ বাহির হইবে। সেরূপ ব্যবস্থা আমাদের পক্ষে সম্ভব না হইলে আগামী বৎসর আর "সন্দেশ" বাহির হইবে না।'

আমাদের সৌভাগ্য, সে আশঙ্কা তখন সত্যি হয়নি। হয়নি তারপরেও বহু বছর। অবশ্য শেষ আড়াই বছর, যখন সুকুমার রায় রোগশয্যায় তখনও, কাজ ছাড়েন নি তিনি। সত্যজিৎ রায়ের লেখা ও আঁকার দিক থেকে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তির প্রায় সবই এই আড়াই বছরে" (ভূমিকা। সমগ্র শিশুসাহিত্য : সুকুমার রায়)। অর্থাৎ 'সন্দেশেরও পৃষ্ঠা তখন ভার উঠেছিল এই শ্রেষ্ঠ কীর্তির ফসলে। মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করেই যে তিনি কাজ করে গেছেন এটা যেমন সত্যি, তেমনি মৃত্যুকে যে আসন্ন জেনেছিলেন সুকুমার রায়, এতেও সন্দেহ নেই। তাঁর শেষ রচনাও বটে, আমরা জেনেছি, কীভাবে মৃত্যু এসে ছায়া ফেলেছিল। তবু কী অদ্ভুত প্রশান্তিময় ওষ্ঠে তিনি উচ্চারণ

করেছেন— ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর
গানের পালা সঙ্গে মোর।

কিন্তু 'সন্দেশের পৃষ্ঠাতেও কি তিনি আরও আগে রেখে যাননি মৃত্যুভাবনারই অন্যতম কিছু স্বাক্ষর? দশম বর্ষের একাদশ সংখ্যায় (ফাল্গুন ১৩২৯) সন্দেশে প্রকাশিত হয়েছিল 'অতীতের ছবি' নামের দীর্ঘ কবিতার যে অংশ, তার মধ্যেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে মৃত্যুভাবনা তা অব্যক্ত থাকে না, যখন এই ধরনের স্বগত জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হই আমরা— "জন্ম লভি জীব জীবন ধরে
কোথায় মিলাশ মরণ পরে?"

মানুষ মিলায়, কিন্তু কীর্তি মিলায় না। সন্দেশের একাদশ বর্ষের ষষ্ঠ সংখ্যায় (আশ্বিন ১৩৩০) ছাপা হল সন্দেশ সম্পাদক সুকুমার রায়ের অকালপ্রস্থানের সংবাদ। তখনও তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ আলোর রাজ্যে ছাড়পত্র পায়নি। তবু সুকুমার রায় থেকে গেলেন। সন্দেশের পৃষ্ঠা থেকে চিরকালের শিশুদের চিত্তে তাঁর স্থায়ী ঠিকানা স্থানান্তরিত হল। আর 'সন্দেশে' তৈরি হল যে-অতুলনীয় শূন্যতা, সেই হাহাকারকে কবিতায় ফুটিয়ে তুলবেন প্রসন্নময়ী দেবী, সুকুমার-শূন্য 'সন্দেশে'রই পৃষ্ঠায়—

সন্দেশের মিষ্ট স্বাদ গিয়েছে চলিয়া,
"সুকুমার" দুটি হাতে
যে মিষ্টান্ন দিত পাতে
আজ তাহা হেলা ভরে গিয়াছে ফেলিয়া।'

'সন্দেশ' অবশ্য এর পরেও তিন বছর চলেছিল। সুকুমার রায়ের পরে সুবিনয় রায় চালিয়েছিলেন সেই 'সন্দেশ'। তারপর বন্ধ। আবার বেরুল ১৩৩৮-এর আশ্বিনে। প্রথম সংখ্যার প্রথম কবিতাটি সেবার লিখলেন সুনির্মল বসু, 'সন্দেশ'ই যাঁকে লেখক হবার প্রেরণা দিয়েছিল—

'সন্দেশ' এলো ফের—মন খুশি খবরে,
সেই চিরপুরাতন—তবু অভিনব রে।

৬

চিরপুরাতন, তবু চির-অভিনয়। পুরানো সন্দেশের যে-কোনও একটি সংখ্যা হাতে নিলে এখনও এই অভিধাতেই চিহ্নিত করতে ইচ্ছে করবে। সময়ের থেকে অনেক এগিয়ে-যাওয়া এই সর্বাঙ্গসুন্দর পত্রিকার সমকক্ষ কোনও শিশু ও কিশোর-পত্রিকা সেকালেও ছিল না, একালেও চোখে পড়ে না। পুরানো 'সন্দেশের, বিশেষত, 'সন্দেশের গৌরবসূর্য যখন মধ্যগগনে, সুকুমার রায় সম্পাদিত সেই আমলের. একটি সংখ্যারও যদি অবিকল পুনর্মুদ্রণ তুলে দেওয়া যায় এ-কালের পাঠকেব হাতে, তাহালে কিছুটা আভাস পাওয়া যেত। বোঝা যেত যে, শিশুসাহিত্যের স্বর্ণযুগের সঙ্গে এই কাগজের নাম এমন অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে গেল কী করে!

তবে দু-একটা জরুরি কাজ অনায়াসেই করা যেতে পারে। যেমন, পুরনো 'সন্দেশের বচনা নিয়ে একটি নতুন এবং সার্থকনামা 'সেরা সন্দেশ' বার করা যায়। সন্দেশে প্রকাশিত অস্বাক্ষরিত রচনাগুলির লেখকের নাম শনাক্তকরণ করার কাজেও অবিলম্বে হাত দেওয়া উচিত। সেই সূত্রে তৈরি করা প্রয়োজন, 'সন্দেশে'র একটি পূর্ণাঙ্গ সূচীপত্রও। এমন মনে করলে খুব ভুল বোধহয় হবে না যে, সুকুমার রায়েরও বহু লেখা এখনও সন্দেশের পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে রয়েছে। 'সন্দেশে প্রকাশিত লেখা কীভাবে পরিবর্জিত-পরিবজিত করে বইতে নিয়েছেন সুকুমার রায়, সে সম্পর্কেও ফ্যাকসিমিল-যুক্ত একটি গ্রন্থ দারুণ কৌতুহলকর হয়ে উঠতে পারে।

ছত্রিশ বছরের স্বল্পায়ু জীবন সুকুমার রায়ের। কিন্তু ছত্রিশ রাগিণীর মতোই বৈচিত্র্যময়। আমাদের দুর্ভাগ্য, তাঁর কোনও পূর্ণাঙ্গ জীবনী আজও প্রকাশিত হয়নি। বেরুলে, তার একটা প্রধান অংশ জুড়ে থাকত নিশ্চিত 'সন্দশে' সম্পাদক হিসেবে সুকুমার রায়ের ভূমিকার কথা। কেন-না, তাঁর জীবনের প্রায় এক চতুর্থাংশ জড়িয়ে রয়েছে 'সন্দেশ' সম্পাদনার কাজে। আর সেই কাজ ছিল বলেই আমরা পেয়েছি অমর সুকুমার রায়কে।

অনন্য সুকুমার

রজতশুভ্র গুপ্ত

একশ বছর আগে সুকুমার রায় জন্মেছিলেন। পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায়। মা, বিধুমুখী দেবী হলেন সে সময়ের ব্রাহ্মসমাজের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। বংশ-তালিকার এই কয়েকটি চরিত্রকে নিয়ে সামান্য ছবি আঁকলেই, সেই ছবি সুকুমার রায়কে এক অনন্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে চিত্রিত করতে পারে।

বাবা লিখে চলেছেন গান। এঁকে চলেছেন ছবি আর মুদ্রণের মৌলিক গবেষণা—এমনি এক অদ্ভুত হাওয়ায় ভেষে বেড়িয়েছে বেহালা ও পাখোয়াজের নিপুন সুর বিন্যাস ; কখনো বা উপেন্দ্র-কিশোর বাড়ীর ছাদে বসে দুরবীন হস্তে তারা দেখায় মত্ত। ঠিক এইরকম পিতার স্নেহ ও প্রতিভার ছায়ায় লালিত হয়েছে সুকুমার বায়ের ছোট্টবেলা। কলকাতায় স্কুল ও কলেজের শিক্ষা নেবার সময় সুকুমার তেমন কোন সাহিত্য সৃষ্টি করেননি। কলেজ ছাড়বাব অল্প পরেই যেন এতদিনের জমে থাকা প্রতিভা বাঁধভাঙা জলের মতোন উপচে পড়ে ও স্বাভাবিক ভাবেই প্লাবিত করে পাঠকদেব। এই সময়ে প্রতিষ্ঠা করলেন 'ননসেন্স ক্লাব'। এই ক্লাবের জন্য লিখলেন দুটি নাটক, 'ঝালাপালা' ও 'লক্ষণের শক্তিশেল'। কি অসাধারণ আপ্লুত হলো রামায়ণের মতো সেই সব চরিত্র,' সাধারণ মজার আড্ডার চরিত্রের সাথে, তার উপলব্ধি ঘটে, 'লক্ষণের শক্তিশেল' পাঠে। সুকুমারের এই রামায়ণে, রাবণ ব্যাটা লম্বা তালগাছে চড়ে। রাম নিঃদ্বিধায় হনুমানকে বলেন, 'যা ব্যাটাকে (রাবণকে) সমুদ্রে ফেলে দিয়ে আয়।' সুগ্রীব রাবণকে ঠ্যাঙাবার জন্য গদা খুঁজতে থাকেন। সুগ্রীব রাবণের

সুগ্রীব বাবণের ভয়ে ভীত হলে এই রাবণ বলতে পারেন, 'ছিঃ ছিঃ ছিঃ এত গর্ব করে এত আস্ফালন করে, শেষটায় চম্পট দিলি! শেম্! শেম্" স্বাভাবিক চেতনায় কিছু চরিত্র ধর্মের 'বিপদ' সঙ্কেত নিয়ে যে দূরত্ব বজায় রাখে, সুকুমার অবলিলায় সেই সব চরিত্রের ওপর থেকে সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়ে তাদের আমাদের অতি কাছের চরিত্র করে তুললেন।

অথচ হাস্যরসের এক বিশেষ মাত্রা দিলেন 'সন্দেশ' পত্রিকায় লেখা হাস্যরচনায়। তবে এই হাসিতে কোন শ্লেষ নেই, ব্যঙ্গ ছিল। ১৯১৪ সালে প্রকাশিত আবোল তাবোল শ্রেণীর প্রথম কবিতা থেকে সুকুমার সাহিত্যে জন্ম নিল উদ্ভট সব প্রাণী। ভাষার মারপ্যাচে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য নতুন নতুন প্রাণী।

"হাস ছিল সজারু, (ব্যাকারণ মানিনা)
হয়ে গেল 'হাসজারু' কেমন তা জানিনা!

এমনি ভাবেই বক ও কচ্ছপের সংমিশ্রণে 'বকচ্ছপ', এমনি ভাবেই 'কুমড়ো পটাশ' সৃষ্টি হয়েছে। এ যেন উন্মুক্ত আকাশের নিচে বাধাহীন আনন্দের ফুলঝুরি। কোন বাঁধা নেই এতে। এসব ছড়া আরও মনগ্রাহী হয়ে উঠতে পেরেছে সুকুমারের স্বহস্তে আঁকা মজার মজার ছবিতে। অথচ আঁকা শেখবার তেমন কোন শিক্ষা তিনি নেননি। অসম্ভব দেখবার শক্তি ও অফুরান কল্পনা শক্তির জোরে সুকুমারের আঁকা যে কোন ছবিই গভীরে চলে আসে। একটা মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে।

সুকুমার মধ্যে মধ্যে তৈরী করেছেন কাল্পনিক প্রাণী। যেমন 'হুঁকোমুখো হ্যাংলা,' ভাবখানি তার মানুষের কিন্তু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বুঝি বিবিধ প্রাণীর সমন্বয়। এই 'হুঁকোমুখোর বাস ছিল বাংলাদেশে এবং—

শ্যামাদাস মামা তার আফিঙের থানাদার
আর তার কেউ নেই এই ছাড়া"

একটু সাবধানী হয়ে পড়লেই মামা, আফিঙ, থানাদার শব্দগুলির অর্থপূর্ণ সহবস্থান ও রূপ ধরা দেয়।

১৯১৫ সালে মাত্র ৫২ বছর বয়সে উপেন্দ্রকিশোরের মৃত্যু হয়। স্বাভাবিক ভাবেই 'সন্দেশ' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন সুকুমার রায়। ঠিক এই সময় প্রতিষ্ঠা হয় "মাণ্ডে ক্লাব"। সুকুমার একে বলতেন 'মণ্ডা সম্মেলন'। বিশিষ্ট সব ব্যক্তিত্বে ভরা ছিল এই ক্লাব।

ক্লাব সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে সুকুমার একবার নিজস্ব ছাপাখানায় পোস্টকার্ড ছাপলেন :

'সম্পাদক বেয়াকুব কোথা যে দিয়েছে ডুব
এদিকেতে হায় হায় ক্লাবটি যে যায় যায়
তাই বলি সোমবারে মদ্‌গৃহে গড়পারে
দিলে মরে পদধূলি ক্লাবটিরে ঠেলে তুলি।
রকমারি পুঁথি যত নিজ নিজ রুচি মতো
আনিবেন সাথে সব কিছু কিছু পাঠ হবে।
—করজোড়ে বার বার নিবেদিছে সুকুমার।'

এমন সুন্দর ভাষা ; এমন নির্মল আর্তি শোনবার পর সভ্যবৃন্দ সমাবেশ যে সার্থক হয়েছিল এ ভাবনা অমূলক নয়।

সন্দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত গল্প "ড্রিঘাংচু" অতি উচ্চমাত্রার দাবী রাখে। এই পত্রিকায় প্রকাশিত এই অনন্য গল্পে সুকুমার এক মন্ত্র রচনা করলেন।

'হলদে সবুজ ওরাং ওটাং
ইট পাটকেল চিৎ পটাং
গন্ধ গোকুল হিজিবিজি
নো এ্যাডমিশন ভেরি বিজি
নন্দী ভৃঙ্গী সারেগামা
নেই মামা তাই কানা মামা'

আগমার্কা ননসেন্সের এর চেয়ে সার্থক উদাহরণ খুঁজে পাওয়া কষ্টকর। সুকুমার এই হাসিকে বলতেন, 'খেয়াল বস' ঠিক এই ধরনের হাস্যরস অল্প বিস্তর সব দেশেই গ্রাম্য ছড়াতে পাওয়া যায়। এমনি এক বহুশ্রুত রচনা—

'আইকম বাইকম তাড়াতাড়ি
যদু মাস্টার শ্বশুর বাড়ি
রেলকম ঝমাঝম
পা পিছলে আলুর দম্‌।'

এই চারটি অতি পরিচিত বাক্যের বিন্যাস পংক্তির লেখকের নাম জানা নেই তবে সুকুমার নন। রসের দিক থেকে নয়, ছন্দে ও শব্দের এমন বুনুনি সুকুমারের রসসৃষ্টিকেই মনে করিয়ে দেয়।

সুকুমার রসিক ছিলেন। এমনকি জীবনে মৃত্যুর ছায়া যখন নেমে আসে তখনও তিনি রসিকতা থেকে দূরে চলে যাননি। জীবনের অন্তিম সময়ে তিনি লিখলেন ঃ

'আদিম কালের চাঁদিম হিম
তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম
ঘনিয়ে এলো ঘুমের ঘোর
গানের পালা সাঙ্গ মোর'

শব্দ নিয়ে এমন খেলা, সুর নিয়ে এত কান্না, ছন্দ নিয়ে যার এত পরীক্ষা তিনি আজ বেঁচে থাকলে মানুষ শব্দটির 'মান' ও 'হুস' শব্দ দুটিকে বাতিল করে কোন কোন শব্দ বেছে নিতেন? সুকুমারের শতবর্ষে তেমনি হাজারো পরীক্ষা আজকের ননসেন্স ক্লাব স্বাগ্রহে নিতে পারেন, সুকুমার রায়ের ছায়ায়।

সুকুমারের চিড়িয়াখানায়

আনন্দ ঘোষ হাজরা

এমন একজন কবি সাহিত্যিকের জন্মশতবার্ষিকী এবার যাঁর বিকল্প এখনও সৃষ্টি হয়নি, কখনও হবে কিনা সন্দেহ। তাঁর উত্তরাধিকার বহন করার যোগ্যতা-সম্পন্ন আমরা এখনও হয়ে উঠতে পারি নি; অবশ্য তাঁর সুযোগ্য পুত্র তাঁর ধারাটিকে দক্ষতার সঙ্গে ধরে রাখতে পেরেছেন। শুধু আশা করতে পারি, একদিন তাঁর উত্তরাধিকারের যোগ্য হয়ে উঠবে বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির জগৎ।

জন্ম ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর, মৃত্যু ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৩। মাত্র ৩৬ বৎসরের জীবন। এবং প্রকৃত সাহিত্যজীবন মাত্র ৭।৮ বছর। এই স্বল্প জীবনের পরিধির দূরত্ব এখন থেকে ৬৪ বছর দূরের হলেও তাঁর ক্রীড়াভঙ্গি নিক্ষিপ্ত মনিমুক্তার ঔজ্জ্বল্য এখনও অম্লান, অম্লান থাকবেও হাজার হাজার বছর ধরে।

আমরা সুকুমারকে জানি ননসেন্স ভার্সের, আবোল তাবোলের রচয়িতা ব'লে, কিংবা হ-য-ব-র-ল বা চলচিত্ত চঞ্চরির রচয়িতা ব'লে, যেগুলির অম্লান স্নিগ্ধ হাস্যরস, কৌতুক এবং উদ্ভট রস আমাদের এখনও সজীব ক'রে রেখেছে। তাঁর এই খেয়ালী উদ্ভট জগতের ভিত্তিতে কিন্তু ছিল এক অত্যন্ত বাস্তব জগৎ, বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডল —যা তাঁর কল্পনাকে টেনে বিস্তৃততর ক'রে তাঁকে পৌঁছে দিয়েছিল অন্য এক রহস্যলোকে। এবং এই ভিত্তির বাস্তব জগতটা ছিল বিশেষভাবে জীবজন্তুর। তাঁর বাবা উপেন্দ্রকিশোর বিজ্ঞান ও সাহিত্যের এক অপূর্ব সমন্বয় ছিলেন। দূরবীন দিয়ে রাত্রে আকাশের তারাও যেমন দেখতেন, যেমন মুদ্রণশিল্পের গবেষণাও করতেন, তেমনি সাহিত্য ও গানের জগতে বিশেষ ক'রে শিশুসাহিত্যে এবং ছবি

আঁকার জগতে তাঁর ছিলো অবাধ এবং সাবলীল গতিবিধ। তাঁর মাতামহী কাদম্বিনী ছিলেন ডাক্তার এবং জগদীশ বসুর ভাগ্নে হেমেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর পিশেমশাই, যিনি ফনোগ্রাফ ও কুন্তলীনের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। সুকুমার রায় এই বৈজ্ঞানিক মানসিকতা উত্তরাধিকার সূত্রেই পেয়েছিলেন। পেয়েছিলেন বৈজ্ঞানিকদের পর্যবেক্ষণশক্তিব ক্ষমতা ও ঔৎসুক্য। এই পর্যবেক্ষণ এবং ঔৎসুক্যই তাঁব পবিচয় ঘটিয়েছিলো পঠন-পাঠনের মাধ্যমেও নানা জীবজন্তুর সঙ্গে যেগুলি ভীষণভাবে বাস্তব। বোধহয়, বাংলাতে সুকুমাব বাযই প্রথম যাঁব কাছে থেকে আমরা জগতের নানা বিচিত্র জীব-জন্তুব কথা জানতে পারি। পুরনো সন্দেশের পাতায় এইসব জীব-জন্তুব কথা প্রকাশিত হতো। এইসব জীবজন্তুর শুধু আকার আয়তন চেহাবাব বর্ণনা দিয়েই ক্ষান্ত হতেন না সুকুমাব। তাঁব বিশেষ লক্ষ্য ছিলো এদেব ব্যবহাব চালচলনেব ওপব। খুব স্বল্প কথায় চমৎকাব ঋজু সহজবোধ্য ভাষায় ছোটদেব উপযোগী ক'রে এইসব জীবজন্তুব কথা লিখতেন তিনি। [আমি জানি না কেন এই বচনাগুলি ছোটদেব, এমন কি স্কুলে কিশোবদেবও, অবশ্যপাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয না!] লক্ষণীয় ব্যাপাব এই যে, যেখানে তিনি এই রকম বৈজ্ঞানিক তথ্য পবিবেশন করছেন সেখানে তিনি বাস্তব থেকে একটুকুও বিচ্যুত হচ্ছেন না এবং তথ্য সম্বলিত এইসব বচনাগুলি কখনই বিরক্তি উৎপাদন তো করেই না. ভাষার প্রসাদগুণে এসব এসব লেখা একবার পড়তে আরম্ভ করলে ছাড়াই যায় না। গরিলা এবং গরিলার লড়াইয়ের বর্ণনা এতো বাস্তব তবু এতো চমৎকার ভাবে বলা যে, বারবার পড়তে ইচ্ছা করে। আর জাহাজের খাবার ঘরে গরিলা বাচ্চার মিষ্টি এবং আচার চুরির বর্ণনা! যেকোনো দুষ্টু মানবশিশুকে মনে পড়ায়।

বেবুনের বর্ণনাটিও এক লাইনে সুন্দরভাবে সেরে দিয়েছেন— "যে সব বানরের মুখ কুকুরের মতো লম্বাটে, যারা চারপায়ে চলে, যাদের ল্যাজ বেঁটে আর গালের মধ্যে থলি আর পিছনের দিকটায়

কাঁচা মাংসেব মতো ঢিপে, তাদের নাম বেবুন।" শুধু গরিলা বা বেবুন নয়, ওরাং-ওটাং, শিম্পাঞ্জী, পেকারী, বীভার, গ্লাটন, ঘোড়া (ঘোড়ার বিবর্তন), **Sabre toothed** টাইগার, টেরোডাক্‌টিল্‌, তিমি, রাজকাঁকড়া, নিড্‌ল্‌ ফিশ্‌, বজ্রমাছ, মাদাগাস্বনরের টিকটিকি—ইত্যাদি নানা বিচিত্র জীবজন্তুর ছড়াছড়ি সুকুমারের লেখায়; হয় তারা এখনও বর্তমান আছে কিংবা তারা হয়তো লোপ পেয়েছে অনেককাল আগে। নানাধরনের কুমীব, মাছ, মাছি—কিছুই বাদ যায়নি তাঁর পর্যবেক্ষণ থেকে। টেরোডাক্‌টিল্‌ শব্দটি এখন আমাদের কাছে খুব পরিচিত—সত্যজিৎ রায়ের বিখ্যাত গল্প 'টেরোডাকটিলের ডিম' গল্পটির কল্যাণে। কিন্তু বোধহয় সত্যজিৎ তাঁর গল্পটির প্রাথমিক উপাদান পেয়েছিলেন তাঁর বাবাব রচনা থেকেই। এই টেরোডাক্‌টিল বা সেকালের বাহুড়ের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সুকুমার বলেছেন—"সেই অতি প্রাচীন যুগের পাথরে এসকল বাহুড়ের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না—যা কিছু পাওয়া যায় সবই আরো 'আধুনিক' বলাতে মনে করিও না যে মাত্র কয়েকশত বা সহস্র বৎসরের কথা বলিতেছি—সে আধুনিক যুগ কয়লক্ষ বৎসর আগেকার তাহা আমি জানি না।" মনে রাখতে হবে সুকুমার এইসব জীবজন্তুর কথা লিখছেন বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে, যখন আমাদের দেশে জীবজন্তু নিয়ে চর্চা শুরুই হয়নি বলতে গেলে। এখনও বাস্তবিক পক্ষে হয়েছে কি? ইউরোপেও তখন পৃথিবীর কোন্‌ যুগে কী প্রাণী বাস করতো সে নিয়ে তর্কবিতর্ক শুরু হয়েছে, বিভিন্ন ফসিল আবিষ্কারেব সূত্রকে অবলম্বন ক'রে। কাজেই সে সময়ে সুকুমারের এ ধরনের ঔৎসুক্য, পঠন-পাঠনের পরিধি আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। এখন বৈজ্ঞানিকেরা পৃথিবীর পঁচিশ কোটি বছরের বয়সকে বিভিন্ন যুগে ভাগ করতে সক্ষম হয়েছেন। কোন্‌ যুগে কী ধরনের প্রাণীরা বাস করতো বা কোন্‌ যুগে কাদের একাধিপত্য ছিলো পৃথিবীতে ফসিল আবিষ্কারের মাধ্যমে এখন বৈজ্ঞানিকেরা সে সম্বন্ধে জানতে পেরেছেন। আমরা এখন জানতে

পেরেছি, সমগ্র মেসোজোয়িক যুগ জুড়ে ছিলো সরীসৃপদের (Reptiles) আধিপত্য। প্রায় ১৮০ মিলিয়ন বছর অর্থাৎ ১৮ কোটি বছর আগে আমরা প্রথম ডাইনোসরদের পূর্বপুরুষ, প্লেসিয়া-সোর, ইকথিয়াসোর, এবং বাদুড়দের পূর্বপুরুষ টেরোডাক্টিলের দেখা পাচ্ছি। সুকুমার রায়ের সময় হয়তো এভাবে নির্দিষ্ট ক'রে বলা যেতো না, সেজন্যই হয়তো তিনি জানতেন না যে কতদিন আগেকার জীব এরা, কিন্তু এদের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে তাঁর কোনো সংশয় ছিলো না। সুকুমার রায়ই প্রথম এদের সম্পর্কে বাঙালী ছেলে-মেয়েদের আগ্রহের, অনুসন্ধিৎসার সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু কেবল সত্যজিৎ ছাড়া আর কারো মনে এই অনুসন্ধিৎসা আজ নেই কেন? বহুল প্রচলিত পত্রিকাগুলিতে, ছোটদের পত্রিকাগুলিতে এদের সম্বন্ধে আর লেখা হয় না কেন তেমনভাবে? আমরা কি সুকুমারের উত্তরাধিকারকে ভুলে যেতে বসেছি? আমাদের জ্ঞান—স্পৃহা বিস্তার লাভ করেছে অবশ্যই, কিন্তু এই বিশেষ দিকটাকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না কেন? এগুলি ভাববার সময় এসেছে। সেই কত বছর আগে সুকুমার বলেছিলেন—"বাঁদরের মুখের চেহারা যে অনেকটা মানুষের মতো তা দেখলেই বোঝা যায়; বিশেষত ওরাং-ওটাং, শিম্পাঞ্জী প্রভৃতি বুদ্ধিমান বাঁদরদের চালচলন আর মুখের ভাব দেখলে মানুষের মতো আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়।" আজ আমরা জানি একই 'হোমিনয়েড' গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত-গিবন, সিমাং, ওরাং-ওটাং, গরিলা, শিম্পাঞ্জী ও মানুষ; গিবন, সিমাং হাইলোবাটিডি সাব-গ্রুপের; ওরাং-ওটাং, গরিলা, শিম্পাঞ্জী পংগিডি সাবগ্রুপের এবং মানুষ হোমিনিডি সাবগ্রুপের অন্তর্ভুক্ত। বাংলায় সুকুমার রায়ই প্রথম বাঙালী ছেলেমেয়েদের দৃষ্টিকে অত্যন্ত সহজবোধ্যভাবে এই দিকে পরিচালিত করেন। এবং বিনয় সহকারে তিনি প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে জানতেন না বললেও, আমরা বিশ্বাস করতে পারি না। কারণ তখনকার দিনে এসব ব্যাপারে যে নতুন নতুন আবিষ্কার হচ্ছিল

ইউরোপে, তা তিনি মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করতেন, জানবার চেষ্টা করতেন এবং আমাদের জানাতেন। কারণ মেসোজোয়িকের পরবর্তীযুগে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের (Mammals) সম্পর্কে তাঁর স্বচ্ছ ধারণা ছিলো। ঘোড়াদের জীবনবৃত্তান্ত বলতে গিয়ে তিনি ঘোড়ার আদিপুরুষ ইয়োহিপ্পাসের উল্লেখ করেছেন—যদিও পরবর্তী বিবর্তনের ধারা—মেসোহিপ্পাস বা মেরিহিপ্পাসের কথা তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন নি।

এইসব আবিষ্কার, পৃথিবীর বয়স, জীবনের বিবর্তন ইত্যাদি সম্পর্কে অধ্যয়ন করতে গিয়েই তিনি অতীত পৃথিবীব ফেলে আসা বিস্ময়কর জগতটির সম্মুখীন হন এবং বহু অধুনালুপ্ত অদ্ভুত প্রাণীদের কথা জানতে পারেন যারা একদিন পৃথিবীর বুকে অত্যন্ত বাস্তবার্থেই বহুযুগ ধবে বসবাস করতো, যখন মানুষের চিহ্নমাত্র ছিলো না পৃথিবীতে। যেমন, আমার ধারণা, তিনি অবশ্যই জানতেন, ইউইনটাথেরিয়ামের কথা, মোয়েরিথেবিয়াবের কথা বা অলটি-ক্যামেলাসের কথা বা এরকম আরো বাস্তব বিচিত্র প্রাণীর আকৃতি ও জীবনযাত্রার কথা। তিনি জানতেন ইউইনটাথেরিযামের বড় বড় ক্যানাইন দাঁত থাকা সত্ত্বেও তারা শক্তীভুক ছিলো, জানতেন তাদের ১২ ফুট লম্বা, ৬ ফুট উঁচু হাতির শরীবের মধ্যে ছোট্ট কুকুরের মতো ব্রেনের কথা। জানতেন অবশ্যই হাতির পূর্বপুরুষ মেথেরিথেরিয়ামেব কথা যাদের শুঁড়টা ছিলো খুব ছোট নাকের কাছটা টাপিরের মতো এবং মাথার দিকটা অনেকটা গণ্ডারের মতো। জানতেন 'না-উট', 'না-জিরাফ'—বিশাল জানোয়ারের কথা—যার নাম ছিলো অলটিক্যামেলাস।

আমাদের পরিচিত জীবজন্তু আদিপুরুষ এইসব বিচিত্র অতীতের মিশ্র জীবজন্তুর জগতের সম্মুখীন হয়ে তাঁর কল্পনারাজ্যের বিস্ময়ান্বিত দরজা এক লহমায় খুলে গেছিল। পৃথিবীর সমগ্র সৃষ্টির জগতটাই যে খেয়াল রসের জগৎ। কে যেন এই সব বিচিত্র প্রাণীদের সৃষ্টি করেছেন, বিলুপ্ত করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন এখনও। বিবর্তনের

বিবিধ ধারায় এই খেয়াল রসের কর্তা কত না পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছেন নানা মিশ্রিত জীবজন্তু সৃষ্টি ক'রে। সুকুমার অনুভব করলেন এই খেয়াল রসের খেলার কথা। শুধু অনুভব করলেন না, অংশগ্রহণ করলেন এই অদ্ভুত খেলায়। অফুরন্ত আনন্দের অংশীদার হলেন তিনি। তাঁর খেয়াল রসের চিড়িয়াখানায় দেখতে পেলাম হ্যাংলাথেরিয়ামকে—যাকে প্রথমে দেখে মনে হয় একটা প্রকাণ্ড, মানুষ, তারপর মনে হয় মানুষ নয় বাঁদর, তারপর মনে হয় মানুষ নয়, বাঁদব নয়—একেবারে নতুন রকমের জন্তু, দেখতে পেলাম গোমরাথেরিযাম, ল্যাগব্যাগনিস, বেচারাথেরিয়াম এবং সরীসৃপ চিল্লানো সেরাসকে। কিংবা দেখতে পেলাম শুয়োরের মতো মুখ অথচ হাতিব চেয়েও বড় জানোয়ার ল্যাংড়াথেরিয়ামকে যে পায়ে কাঁটা ফোটাব যন্ত্রণায় কেঁউ-কেঁউ করে।

দেখতে পেলাম 'না বাদুড়', 'না তিমি'—এরকম একটা অদ্ভুত জন্তুকে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এইসব জন্তুগুলি দেখতে পেয়েছিলেন প্রফেসর হেশোরাম হুঁশিয়াবেব দলবল এবং এই হেশোরাম হুঁশিয়ারই পরবর্তী প্রজন্মের লোকের হাতে আবেকটু সফিস্‌টিকেটেড্ হয়ে প্রফেসর শঙ্কুতে পরিণত হয়ে এখন আমাদের বাংলা সাহিত্যে কিশোরদের সাম্রাজ্যে আসর জাঁকিয়ে বসেছেন। অদ্ভুত মিশ্র প্রাণীদের বাস্তব জগৎ থেকে এইভাবে সুকুমার প্রবেশ কবেছেন তাঁর খেয়ালী রাজ্যে। তাই আবোল তাবোলের প্রথম কবিতা হয়ে যায় 'খিচুড়ি'। সেখানে আমরা হাঁসজারু, বকচ্ছপ, মোরগরু, সিংহরিণ ইত্যাদির সাক্ষাৎ পেলাম। কল্পনার রাজ্যে তাবপর অবশ্যম্ভাবীরূপে চলে আসে আরো নানা ধরণের জানোয়ার --যাদের নাম কুমড়োপটাশ বা কিম্ভুত। কিম্ভুত মিশ্র প্রাণীর এক অদ্ভুত উদাহরণ—কোকিল, ক্যাঙ্গারু, গোসাপ, সিংহ, হাতির এক মিলিত সংস্করণ। কিন্তু সে নিজের সম্বন্ধে মনের দুঃখে বলে ওঠে,—

নই ঘোড়া, নই হাতি, নই সাপ-বিচ্ছু
মৌমাছি প্রজাপতি নই আমি কিচ্ছু।

মাছ ব্যাং গাছপাতা জল মাটি ঢেউ নই
নই জুতা, নই ছাতা, আমি তবে কেউ নই।

এখানেই শেষ নয়। এরকম আরো অনেক আছে। মিশ্র জানোয়ার ট্যাঁশ গরুকে আমরা কি ভুলতে পারবো কখনও? আমরা যদি সুকুমারের মতো প্রাচীন পৃথিবীর অধিবাসী জানোয়ারদের কথা পড়ি, ভাবি তাহলে এইসব মিশ্র জানোয়ারকে আর কাল্পনিক বলে অবাস্তব বা অতিবাস্তব বলে বোধ হয় না। হবে কি করে? ট্যাঁশ গরু তো হারুদের আপিসে গেলেই ছাখা যায়!

শুধু কি এধরনের খিচুড়ি জীবজন্তু? আমাদের পরিচিত জীব-জন্তুরও কি দারুণ ব্যবহার। কল্পনা ও বাস্তবের মধ্যবর্তী রাজ্যে বিচরণ করছে তারা। এরকম ব্যবহার, আচার-আচরণের উল্লেখ হ-য-ব-র-ল-এর ছত্রে ছত্রে ছড়ানো। বিড়াল, কাকেশ্বর-কুচকুচে, ব্যাকরণ-শিং, কুমীর, প্যাঁচা—সব কটি চরিত্রই এমন ব্যবহার করে যা আমাদের প্রায় চেনা মানুষের ব্যবহার অথচ অপরিচিত। বাস্তব অবাস্তবের মধ্যবর্তী জগতের, খেয়াল রসের জগতের, ফ্যান্টাসির জগতের এইসব প্রাণীরা এতদিন পরে আজ আমাদের কাছে অত্যন্ত পরিচিত হয়ে গেছে। আমি অবশ্য সবচেয়ে বেশি পছন্দ করি 'ত্রিঘাংচু' নামক কাকটিকে—যে রাজার সিংহাসনের ডানদিকের থামের ওপর— ব'সে মাথা নিচু ক'রে দক্ষিণ দিকে মুখ ক'রে চোখ পাকিয়ে 'কঃ' ব'লে শব্দ করে। এবং ত্রিঘাংচু ঐ রকম করলে যে মন্ত্রটি আওড়াতে হয় সেটিও আমার কাছে খুব প্রিয়।

সুকুমারের সুবিশাল চিড়িয়াখানায় এক ঝলক দৃষ্টিপাত করা গেল তাঁর চিড়িয়াখানা এতো বড়ো, আর এতো অদ্ভুত, আর এমন সব জীবজন্তু পাখিদের ব্যবহার, যে দেখে, অনুভব ক'রে, শেষ করা যায় না। সেরেনগেটি চিড়িয়াখানার থেকেও সে চিড়িয়াখানা অনেক বড়ো। সমগ্র পৃথিবীর সৃষ্টির ইতিহাসের বিস্ময়, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বিস্ময় সেখানে ছড়ানো, ছিটোনো, সাজানো।

চিরঞ্জীব সুকুমার

বিষ্ণুপদ বেরা

বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বাঙালী সমাজে সুকুমার রায় অপরিচিত এ-কথা বোধ হয় সোনার পাথর বাটীর মতো অকল্পনীয় ব্যাপার। বোদ্ধা পাঠকের দরবারে হয়তো শিল্পী সুকুমার তেমন আলোচিত কিংবা পরিচিত নন, কেননা কার্য করার মত সাহিত্য করার মত সাহিত্য তিনি রচনা করে যান নি। কিন্তু বোধি দৃষ্টির সহায়তায় শিশুমনের খাদ্য যোগানোর ক্ষেত্রে সুকুমার রায়ের কৃতিত্ব সর্ববাদীসম্মত। আমরা যাঁরা শিশুর পিতা বা মাতা তাঁরা তাদের লালন, পালন, স্নেহ যত্নের কোনরূপ ত্রুটি রাখি না। সত্যি, কিন্তু তাদের যে একটা নিজস্ব সত্তা আছে, তাদের ও যে স্বতন্ত্র ভাবজগৎ আছে, তাদের বিশ্বাসের জগতের সঙ্গে আমাদের জগতের যে পার্থক্য রয়েছে তা আমরা বুঝে বুঝতে চাই না। সুকুমার রায় সে অজ্ঞাত জগতের রহস্য উন্মোচন করেছেন তাঁর সুচারু লেখনীতে। শিশু মনোরাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি শিল্পী সুকুমার তাঁদের অন্তলোকের ভাবরাজ্যের উদ্ভট কল্পনার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে। শিশুমন এক বিচিত্র রহস্য ভাণ্ডার। সে মন খুবই বিশ্বাস প্রবণ, যদি ও সেই যুক্তির ধারার সঙ্গে পরিণত মনের যুক্তির কোন সাদৃশ্যই নেই। তাদের যুক্তিধারায় কোন পারস্পর্য নেই, আছে অবিশ্বাস্য আনন্দ। কল্পনা, আবেগ উচ্ছ্বাস এবং নানা রহস্যের দোলায় সে মন সর্বদাই আন্দোলিত ও চঞ্চল। এই লীলাচঞ্চল কল্পনাপ্রবণ মনোরাজ্যেরই দ্বার উদ্‌ঘাটন করেছেন শিল্পী সুকুমার। তাঁর সৃষ্ট কাব্য গল্প নাটকাদিতে যার প্রমাণ রয়েছে ভূরি ভূরি। এঁর রচিত 'আবোল তাবোল', 'খাই খাই', 'অন্যান্য কবিতা', 'পাগলা দাশু,' প্রভৃতি গ্রন্থের অজস্র রচনায় এবং 'ঝালাপালা,' 'অবাক জলপান', মামাগো প্রভৃতি নাটকে সেই বিচিত্র

রূপিনী কল্পনালোকের সন্ধান পাওয়া যায়। সুগভীর পাণ্ডিত্য এবং শিল্পী সুকুমার অবলীলাক্রমে সেই সব বেয়াড়া, সৃষ্টিছাড়া, নিয়মহারা, হিসাবহীন কৈশোরকদের ভাবরাজ্যে ডুব দিয়ে খাঁটি মুক্তোকেই তুলে এনেছেন যা যে কোন শ্রেষ্ঠ শিল্পীব পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। শুধ কি তাই? মায় মুখের ভাষাটুকু পর্যন্ত যথাযথভাবে তুলে ধরেছেন। ভাব, ভাষা ছন্দের অমৃত ঐশ্বর্যে সেই সব সৃষ্টি অপরাজ্যেয সত্তা নিয়ে ও আজ ও আবিকৃত।

আবার এই সুকুমারই সুকৌশলে তাঁর সহজাত প্রতিভাব বলে নানান জীবজন্তু, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, দেশ আবিষ্কারক, নিত্য-নৈমিত্তিক জিনিসপত্রের আবিস্কাব ও উৎস সম্বন্ধে সহজ সরল অনাড়ম্বর ভাষায় কিশোরীদের কৌতূহলের প্রশাসন ঘটিয়ে জ্ঞানরাজ্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত করিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এই শেষোক্ত কারণে সুকুমার স্মরণীয় নন, স্মরণীয় শিশু মনোরাজ্যের বাণীবাহক হিসেবে।

বাংলা সাহিত্যে আজ আর শিশুসাহিত্য উপেক্ষিত নয়, উপেক্ষিত নয় শিশু সমাজ বরং পাশ্চাত্ত্য জগতের সমধর্মী অনেক খ্যাতনামা কবি শিল্পীও আজ শিশু সাহিত্যের পসরা সাজিয়ে আছেন তথাপি ক্রান্তদর্শী অক্লান্তমর্মা সুকুমার বোধ হয় আজ ও একক অপ্রতিহত। তাঁর কালজয়ী প্রতিভার অমর স্মারক লক্ষ লক্ষ ক্ষুদে সুকুমার। আজ বাংলার ঘরে ঘরে বিদ্যমান।

কবিতার হাসি বনাম হাসির কবিতা

মুকুল রায়

কবিতা হাসি হয় না হাসি কবিতা হয়। এ এক অদ্ভুত সমীক্ষা। এর সমাধান নেই অথবা সমাধান আছে, যা আমাদের বোধের সীমানায ধরা যায় না। 'হাসো, কিন্তু বিদ্রূপে নয়।'·· এই সত্যের আলোকে আত্মসমীক্ষায় যখন জীবন রসের সমুদ্র মন্থন করি তখন কখনও পাই অমৃত কখনও গরল। এই অমৃত-গরলের সমন্বয় সাধন করার রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যে উপাদান সংগ্রহ করি তা কখনও তুলি কখনও কলমের প্রান্তে এসে শব্দকে আশ্লিষ্ট করে ভাবের নন্দনায়। জীবন ও সত্যের মাঝখানে যে উপলব্ধির সেতুবন্ধ রচিত হয় তার নান্দনিক ক্রিয়াশিলতাই শিল্পের উৎস সৃষ্টিব বেদী বা ভাবতরঙ্গের বেলাভূমি।

আমাকে ঘুমোতে দাও, আমি তোমাদের একটি সুন্দর স্বপ্ন উপহার দেব। আমাকে হাসতে দাও আমি তোমাদের একটি ফুল উপহার দেব। আমাকে ভালবাসতে দাও আমি তোমাদের একটি মালা উপহার দেব। স্বপ্ন ফুল এবং মালা। স্বপ্ন মালা গাঁথে এবং মালা স্বপ্ন ও ফুলের নিবিড় বন্ধন রচনা করে। বিদ্রূপের হাসি সেটাই বা কেমন আর হাসির বিদ্রূপই বা কেমন। জীবন সত্যের এই সাত্বত প্রশ্নের কোন নৈতিক সমাধান নেই। কেবল ভাবজগতের বিচিত্র সম্ভারে জীবন-উদ্যানে হাসির ফুল ফোটানোয় যেন তার সার্থকতা। এই সার্থকতার বাস্তব রূপকার সুকুমার রায়। তাই তার উদ্যানে হাসির মরশুমী বাহার। কখনও সে নিছক কৌতুক :

কাল হন্ হন্ ছোটে শন শন
ঘোরে বন্ বন্ কাজে ঠন্ ঠন্

কখনও তা বিদ্রূপের কশাঘাতে জর্জরিত অতিত জীবনের নির্যাস :

চুপ কর শোন্ শোন্ বেয়াকুল হোসনে
ঠেকে গেছি বাপরে কি ভয়ানক প্রশ্নে।

'সুকুমারের হাসিতেও শ্লেষ ছিল না, তবে ব্যঙ্গ ছিল প্রয়োজনে প্রাণ খোলা অট্টহাসিতে পেছপা হতেন না তিনি।' সুকুমার রায়ের কাব্যচেতনা সম্পর্কে এটাই যথার্থ মূল্যায়ন।

হাসি ছিল সজারু (ব্যাকরণ মানি না)
হয়ে গেল হাসজারু, কেমনে তা জানি না।

বকচ্ছপ, মোরগরু, গিরগিটিয়া, সিংহরিণ, হাতিমি, ইত্যাদি উদ্ভট প্রাণীদের নিয়ে যে ব্যঙ্গ চিত্র আঁকলেন তা বাংলা সাহিত্যে কেন গোটা বিশ্বসাহিত্যের অনবদ্য। এগুলি নিঃসন্দেহে প্রতীক চিত্রভাষ। এর অন্তরালে রয়ে গেছে জীবনের সেই বিকৃতি সেই অসঙ্গতি। বিশ্বসাহিত্যে লুই ক্যারল বা লিয়ারের রচনার এ ধরনের আজগুবী জানোয়ার সৃষ্টির নজির রয়েছে। তবুও সুকুমার রায় তাঁর স্বকীয়তায় বৈশিষ্ট্য অভিনবত্ব দাবী করতে পারেন। তাঁর সৃষ্ট প্রাণীগুলি কখনও মনে হয় আমাদের কাছাকাছি বাস করছেন।

ট্যাঁশ গরুকে অনায়াসে দেখা যায় বারুদের আপিসে কিম্ভূত সারাদিন ধরে তার শুনি শুধু খুঁৎ খুঁৎ।...মাঠপারে ঘাটপারে কেঁদে মার খালি সে, 'লেখা আছে পুঁথির পাতে, 'নেড়া যায় বেলতলাতে'—নাহি কোন সন্ধ ভাতে—কিন্তু প্রশ্ন করা যায়?... নেড়াকে তো নিত্যি দেখি আপন চোখে পরিষ্কার—আমাদেরি বেলতলা যে নেড়া সেথা খেলতে আসে। 'নারদ-নারদ' 'আহ্লাদী' কুমড়ো পটাশ, এরা কেউই আমাদের চেনা জগতের বাইরে থাকে না। সবই আছে। সবই ঘোরাফেরা করে নিত্যি আমাদের দৃষ্টিপথের সীমানায়। এখানে যে তীব্র শ্লেষের কশাঘাত সমাজের বুকে এসে ধাক্কা মারে তাতে মনে হয় জীবন সংগ্রামের এতবড় যোদ্ধা কবি বিশ্বসাহিত্যে বিরল। একে বন্দনা করে সেই একই কথা বলতে হয়—আমাকে হাসতে দাও আমি তোমাদের ফুল উপহার দেব। ফুলের বৈশিষ্ট্য যেমন শুধু তার গন্ধে নয়। বরং রূপ রস গন্ধের সমাহারে সুকুমার রায়ের বৈশিষ্ট্য—তেমনি শব্দের ব্যঞ্জনায় বা বাকচাতুর্যের বন্দনায় নয় তার অপূর্ব জীবন রসের বিচ্ছুরণায়। শুধু

ভাললাগা নয়, শুধু কৌতুক বা মজা উপভোগ্য নয় তার বাইরে ভাবের গভীর সমুদ্র ডুবুরীর অভীপ্রায় নিমজ্জিত হওয়া।

হাস্যরস আদিম। পৌরানিক সাহিত্যে এমনকি রামায়ণ মহাভারতের মধ্যেও এই রসচর্চার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। হিড়িম্বা ঘটোৎকচ শূর্পনখা প্রমুখ চরিত্রগুলি এরই চিত্রভাষ। মঙ্গল কাব্যে বিশেষ করে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ভাঁড়ু দত্ত বিশ্বসাহিত্যের উল্লেখ্য অবদান। তবে এই রসের প্রকাশ বিভিন্নভাবের হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথেব গোটা সাহিত্যজীবনের ক্লান্তিকর পরিণতিও তাই শেষবয়সে হাস্যরসের বন্ধ্রপথ দিয়ে অভিব্যক্ত হ'তে চেয়েছে। বিশ্বের সেরা শিল্পী বা লেখকদের জীবনেও এই 'বিমোক্ষণের' প্রস্তান দেখা যায়। অনেকটা নাটকের ক্যাথারসিস্ সৃষ্টির মত। সৃষ্টি তত্ত্বের আদিতেও তাই অসঙ্গতির রূপকল্প দেখা যায়। শিব, নারদ প্রমুখ চরিত্রের মধ্যে দিয়ে পৌরাণিক যুগেও একই প্রয়াস দেখা যায়। তাই এই রসসৃষ্টির ফল্গুধারাকে আদি ও অকৃত্রিক অভিধায় চিহ্নিত করা হয়েছে।

ইংরেজী সাহিত্যে হাস্যরসকে উইট, হিউমার ফার্স—এইভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলাসাহিত্যের মঙ্গল কাব্যে এই উইটর প্রাচুর্য চোখে পড়ে। ময়মনসিংহ গীতিকা থেকে শুরু করে হুতোম-আলাল, বঙ্কিম বা ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যেও এই রসের প্রাচূর্য রয়েছে, তবে তার কোনটাই নিছক ফার্সের অভিধায় পড়ে না।

সুকুমার রায় তাঁর রচনাকে নন্‌সেন্স বলে আখ্যাত করলেও তা নন্‌সেন্স বা খেয়ালী মনে বিলাসে পর্যবসিত হয়নি। বরং তাতে জীবনের অশ্রুসিক্ত অমৃত নিস্যন্দি রসের ফল্গুধারার বিমিশ্রণে অপূর্ব এক রূপমাধুর্যের মালা রচিত হ'য়েছে। সে মালার সার্থক মালাকার তিনি। আর যে উদ্যান থেকে পুষ্পগুলি তিনি চয়স করেছেন সে তার সযত্ন লালিত একান্ত আপন জীবন-উদ্যান। সেখানে তিনি নির্জন, অনন্য অসাধারণ। যদিও তিনি এই রসকে বলেছেন 'খেয়াল রস'—তথাপি তার আস্বাদন জীবন সম্বেগে ভরপুর।

হলদে সবুজ ওরাং ওটাং ইট পাটকেল চিৎপটাং
গন্ধ গোকুল হিজিবিজি নো অ্যাড়মিশন ভেরি বিজি⋯
নন্দী ভৃঙ্গী সারেগামা নেই মামা তার কানা মামা
চিনে বাদাম সর্দি কাশি ব্লটিং পেপার বাঘের মাসি
মুশকিল আশান উড়েমালি ধর্মতলা কর্মখালি ··

এই সঙ্গে বাংলার সেই অতিপ্রচলিত কৌতুক রস নিস্যত ছড়ার একটা অপূর্ব ভাকাত সাখুজ্য নজরে পড়ে।

আইকম বাইকম তাড়াতাড়ি
যদু মাষ্টাব শ্বশুর বাড়ি
রেলকম ঝমাঝম পা পিছলে আলুর দম।

সুকুমাব বায়কে যদি কেউ বিদেশী সাহিত্যেব অনুভবী অস্তিত্ব বলে চিহ্নিত করেন তবে নিশ্চয়ই বলতে পারি তাঁর রঙ্গরসের প্রতিধ্বনি তবে অপূর্ব উঠে এর ব্যঞ্জনায় সমৃধ। কেউ যদি মনে করেন সুকুমার রায়ের বঙ্গোক্তি তাঁর সচেতন মানসের উৎসারণা বা চেতনার বিমিশ্র রঙীন প্রতিধ্বনি তবে সেখানেও একই ঘুরে বলতে হয় তিনি ত্রৈলোকনাথের মতো স্বকীয়তায় ভাস্কর। তাঁর চিত্রগুলি অগোছালো শব্দের তুলিতে আঁকা হলেও তা শাশ্বত সুরের অনুরণনে বিধৃত জীবনের অমোঘ নির্বাস। নিছক ননসেন্স রচনাই যদি তাঁর শিল্পকর্মের উদ্দেশ্য হয়ে থাকতো তবে নিশ্চয়ই অতীতের কবিতা কাব্যগুচ্ছ রচনা করতে না। বা 'জীবনের হিসাব' কবিতায় লিখতেন না⋯

বিদ্যে বোঝাই বাবুমশাই চড়ি সখের বোটে
মাঝিরে কন, "বলতে পারিস্ সূর্যি কেন ওঠে?
মুর্খ মাঝি বলে, "মশাই এখন কেন বাবু?
বাঁচাল শেষে আমার কথা হিসেব করো পিছে,
তোমার দেখি জীবনখানা ষোলআনাই মিছে।"

ষোল আনা মিছের জীবন নিয়ে যখন আমাদের আঠারো আনা চড়াই তখন হিসেবের ঘরে ফাঁকিই আমাদের জীবনের একমাত্র সম্বল। এ নৈরাশ্যের পদধ্বনি সময় সচেতন কবিমানসের প্রতিভাষ। একে

অস্বীকার করতে পারি না। শুধু কবিতার সীমানায় বিধৃত নয় তাঁর শিল্পীমানস। কখনও ছবি কখনও নাটক কখনও রচনা কখনও সঙ্গীত। এ যেন সুরের বিচিত্র লহরী। এত সুর এত বৈচিত্র্য তাই তার উদ্যান এতই মনোরম।

কেষ্টা : আই গো আপ, হউ গো ডাউন'—মানে কি ?

পণ্ডিত : আই কিনা চক্ষুঃ, 'গা'···গো গাবৌ···গাবঃ ইত্যমর : আপ-কিনা আপঃ সলিলং বারি অর্থাৎ জল—গরুর চক্ষে জল অর্থাৎ কিনা গরু কাঁদিতেছে—কেন কাঁদিতেছে—না 'উই গো ডাউন'—কিনা-'উই' অর্থাৎ উইপোকা 'গো ডাউন'—অর্থাৎ গুদোমখানা গুদোমঘরে উই ধরে আর কিছু রাখলে না।

(ঝালাপালা)

'লক্ষণের শক্তিশেল', 'অবাক জলপান', 'হিংসুটি' বা চলচিত্ত চঞ্চরি—এর সবগুলিই সুকুমার রায়ের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর। ছোট গল্পের মেজাজেও তিনি জীবন সমীক্ষায় অটল। বলা চলে আন কম্পোমাইজিং। তাঁর আঙ্গিক তাঁর ভঙ্গি কুশলতা চার্লি চাপলিনের কথা মনে করিয়ে দেয়। সভ্যতার যুপকাষ্টে দাঁড়িয়ে বিচারের তথাকথিত প্রহসনকে বিদ্রূপ কবে তাঁর ঐতিহাসিক সেই উক্তির আলোকে তার কলম্বাসের শেষ পংক্তিটি স্মৃতির সঙ্গীতে বেজে বেজে ওঠে, 'দুঃখের বিষয় শেষ জীবনে বলম্বাসের অনেক শত্রু জুটিয়াছিল, তাহারা রাজার কাছে কোনরকম নালিশ করিয়া রাজাকে তাহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তোলে। রাজা কলম্বাসকে সভায় হাজির করিবার জন্য লোক পাঠান—তখন কলম্বাস ৬০ বৎসরের বৃদ্ধ।···

সৌভাগ্যক্রমে বৃদ্ধের দুর্দশা দেখিয়া রাজার মনে কি দয়া হইল, তিনি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু কলম্বাস এ অপমানের কথা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ভুলিতে পারেন নাই। মানুষের

অকৃতজ্ঞতার কথা ভাবিতে ভাবিতে দারিদ্র্য ও অনাদরের মধ্যেই এ কীর্তিমান পুরুষের জীবন শেষ হইল।' 'জলস্তম্ভ' 'বুমেরাং' বা 'ছাপাখানার কথা' 'কাপড়ের কথা'-এর সবগুলিই যেন তথাকথিত সভ্যতার আলোকে জীবন সত্যের চিরন্তন জীবনীয় প্রতিধ্বনি। একে ম্যাটায়ার, উইট বা হিউমার যে অভিধায় চিহ্নিত করিনা এও সেই টুকরো টুকরো হাসির ফুলে গাঁথা একখণ্ড রত্নমালা যা তাঁরই গলায় পরিয়ে দিয়ে শব্দের চেয়েও কঠিন প্রাণন ধারায় অভিষিক্ত একটুকরো নির্মল স্বচ্ছ আকস্মিক ঝিলিকের হাসি।

ছড়ার যাদুকর সুকুমার রায়

আশাপূর্ণা দেবী

আজ থেকে একশো বছর আগে সুকুমার রায় এসেছিলেন এই বাংলার মাটিতে। জন্মসূত্র থেকে তিনি অনন্য অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী।

পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক ও 'সন্দেশ' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন। উপেন্দ্রকিশোরের তিরোভাবের পর সুকুমার রায় সে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

ছড়া তো অনেকেই লেখেন, কিন্তু সেই সব ছড়াতে চিরকাল মনের মধ্যে গেঁথে রাখেন কজনে? সেই সময়ের দুর্লভ মণিসঞ্চয়ণ এক আশ্চর্য সুকুমার রায়। তাঁর ছড়া শুধু কি ছড়াই না তার মধ্যে এক জীবন্ত প্রতিছবি আমরা দেখতে পাই।

তাঁর 'আবোল তাবোল' ছড়ার বইটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আজ প্রায় দু' যুগ ধরেই লোকের মুখে মুখে মনে মনে ছন্দ যেন ছবি হয়ে আছে।

'আবোল তাবোল' এর কোন কোন ছড়া চিরদিনের জন্য অমর হয়ে আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁর একটি ছড়ার নমুনা :—

"বাপরে কী ডানপিটে ছেলে!—
কোনদিন ফাঁসি যাবে নয় যাবে জেলে
একটা সে ভূত সেজে আটা মেখে মুখে
ঠাঁই ঠাঁই শিশি ভাঙে শ্লেট নিয়ে ঠুকে!
অন্যটা হামা নিয়ে আলমারি চড়ে,
কাঠ থেকে রাগা করে দুমদাম পড়ে।
বাপরে কি ডানপিটে ছেলে!—
শিল নোড়া খেতে চায় দুধ ভাত ফেলে!
একটাও দাঁত নেই, জিভ্ দিয়ে ঘষে,
একমনে মোমবাতি দেশলাই চোষে।"

[ডানপিটে / সুকুমার রায়]

এমন সুন্দর করে শিশুদের মনকে হরণ করে নিয়েছে এই ছড়াটি। শিশুদের মুখে এই ছড়ার আবৃত্তি শুনে মনে হয় যেন এক নন্দন কাননের পারিজাত ফুল ফুটেছে।

এমন করে কে ছড়া লিখছেন? এমনভাবে—ভাবতেও অবাক লাগে, সেই—ডানপিটের রকমারী কীর্তিকলাপ। সেই কথা লিখতে গিয়ে ছড়া করে সুকুমার রায় বলেছেন ঃ—

"আরজন ঘরময় নীলকালি গুলে,
কপ্ কপ্ মাছি ধরে মুখে দেয় তুলে!
বাপরে কি ডানপিটে ছেলে!—
খুন হত টমচাচা ওই রুটি খেলে!
সন্দেহ শুঁকে বুড়ো মুখে নাহি তোলে,
বেগে তাই তুই-ভাই ফোঁস ফোঁস ফেলে।
নেড়া চুল খাড়া হযে বাঙা হয বাগে,
বাপ্ বাপ্ বলে চাচা লাফ দিয়ে ভাগে।"

[ডানপিটে / সুকুমার রায়]

সুকুমাব রায়ের 'আবোল তাবোল' ছড়ার বই ছাড়াও 'খাই খাই' ছড়ার বইটিও এক সঙ্গে অপূর্ব —অনবদ্য অসামন্য! এই ছডাতে খাওয়ার জগতের সঙ্গে বিজ্ঞান জগতের এক আশ্চর্য মিল বযেছে। শুধু কি ছড়া তার মধ্যে প্রকৃত শিক্ষা আর জ্ঞানের বিকাশ ঘটেছে।

সে যুগে সুকুমাব জন্মেছিলেন, তখন ছিল ইংরেজীব সভ্যভার শিক্ষায় উদভাসিত। কিন্তু তিনি ছিলেন মনে প্রাণে খাঁটি বাঙালী। বাংলার আকাশ বাতাসে তার ছড়া-কবিতা-গল্প-নাটক বিজ্ঞান চর্চা শিকার কাহিনী ছড়িয়ে আছে দিক দিগন্তে। তিনি সহজ ও সবল সুন্দর ভাবে লিখে গেছেন যা বাংলার শিশু ও কিশোর সাহিত্যে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

সুকুমার রায়—শ্রীচরণেষু

প্রসাদ সেন

উনিশ শতকের রেনেসাঁ বিস্ফোরণের প্রত্যক্ষ ফল উনিশ শতকের শেষভাগে জন্ম নিয়ে বিশ শতকের অনেকগুলো বছরের মুখ দেখেছিলেন এমন যাঁরা। স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের কথা সর্বাগ্রে। কিন্তু সুকুমার রায় সম্ভবতঃ তার পরেই। তবে সুকুমার একেবারে আনকোরা এক হাস্যরসের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজের শুচিতা ইত্যাদি নিয়ে জোর লড়াই হয়েছে সে সময় চপলতা, চটুলতা সমাজে নিষিদ্ধ ছিল। আর এক ট্যাবুর আওতায় ছিল হাসি। অবশ্য এ সব ট্যাবু'র সৃষ্টি করেছিলেন আরও অনেক আগে ব্রাহ্মসমাজেরই আর এক প্রবাদ পুরুষ কেশবচন্দ্র সেন। তাঁর আমলে যে 'সঙ্গত সভা' ছিল এবং পরবর্তীকালে সমাজের ট্যাবু-বেড়াজালকে মুক্ত করতেই যেন সুকুমারের অবিস্মরণীয় আবির্ভাব। পরমহংস রামকৃষ্ণের ভাষায় সেই সব 'গম্ভীরাত্মা' মানুষদের আত্মার গম্ভীরত্ব থেকে উদ্ধার করতে লিখেছিলেন সুকুমার—'রামগরুড়ের ছানা হাসতে তাদের মানা, হাসির কথা শুনলে বলে, হাসব না-না-না।/ সদাই মরে ত্রাসে ঐ বুঝি কেউ হাসে!/ এক চোখে তাই মিট্‌মিটিয়ে তাকায় আশে পাশে।' লুকিয়ে লুকিয়ে কোন ব্রাহ্ম হাসতেন কি-না, সে অবশ্য যানা যায়নি।

সুকুমার রায়-কে নিয়ে অজস্র আলোচনা হয়েছে। তাঁর, কবিতা, গল্প, ছবি সব নিয়ে। জীবনের স্বল্প পরিসরে তার সৃষ্টিকে নিয়ে যতদূর সম্ভব আলোচনা করা যায়। তবু শ্রদ্ধেয়া লীলা মজুমদার একটু খুঁত খুঁত করেছেন 'বড়দার মতো কবিতা গল্প আর লেখা হয়নি। এমননি তাঁর জীবন-দর্শনের একটা নির্ভরযোগ্য সমালোচনাও হয়নি।'

যাঁকে নিয়ে আলোচনারই শেষ নেই, তাঁর সমালোচনা কি করে

হয়? অবশ্য বলতে দ্বিধা নেই, আলোচনার অনেকাংশ জুড়ে থাকে স্তাবকতায়। নিন্দে হয়নি-এমন কথাও বলা যাবে না। তবে নিন্দের সিংহভাগ অপ্রকাশ্যে হয়েছে। অনেক সময় বৃহৎ মানুষের বৃহৎ ইমেজ রক্ষা করবার সাগ্রহ ভূমিকা নিয়েছে পত্র-পত্রিকারা। তবু হয়েছে। সুকুমাব রায়কে খুব চাপা গলায় বলা হয়েছে যে তিনি বোফলেয়র, লিয়রকে অনুসরণ করেছেন। এ নালিশ সুকুমারের ইলাস্ট্রেশন সম্পর্কেও।

কিন্তু এই চাপা নালিকা অসুয়া প্রসূত। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ রেহাই পাননি। আমাদের মত এই ধরণের নবকের কীর্যেদের হাত থেকে। আমাদের বাঙ্গলা সাহিত্য, সংস্কৃত ভাষার চহিতে ইংরেজী ভাষার কাছে বেশি ঋণী। ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাব আমরা আজও অস্বীকার করতে পারছিনা। কিন্তু ভাষান্তর ও স্বকরণ দুটোতো এক নয়। যে প্রতিভার বলে স্বকরণ করতে পেরেছিলেন পূর্বসূরীরা—সেই প্রতিভা আমাদের মত নরকের কীটেদের নেই বলেই এই গাত্রদাহ। আমরা যা হতে চাই, ওঁরা তা হযেছিলেন। তিরিশ শতক থেকে আজ পর্যন্ত আরও অনেক সাহিত্যিক এই অপরাধে অপরাধী হয়েছেন। যেমন হেমেন্দ্রকুমার রায়, শিবরাম চক্রবর্তী এবং সর্বশেষে সত্যজিত রায়। কিন্তু কাদা ছিটিয়েও আমরা তাদের ভাবমূর্তিকে কলঙ্কিত করতে পারলাম কই। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য (লীলাদির ভাষায়) সুকুমার রায়…'মাত্র ৩৬টি বছরের মধ্যে, তিনি চিরন্তন সত্যের একটি অপ্রত্যাশিত আয়তন প্রকাশ করে-ছিলেন। বহু বিখ্যাত লেখকরা যা সারা জীবনেও পারেননি।'

নইলে কার হাত দিয়ে এমন লেখা বের হতে পারে কহ ভাই কহরে—অ্যাঁকাচোরা শহরে—। বদ্যিরা কেন কেউ আলু ভাতে খায় না।/ লেখা আছে কাগজে আলু খেলে মগজে ঘিলু যায় ভেস্তিয়ে বুদ্ধি গজায় না।' মৃত্যুর নোটিশ হাতে নিয়ে কে এমন লিখতে পারেন—'আজকে আমার মনের মাঝে ঠাঁই ধপাধপ তবলা বাজে—/ রাম-খটাখট্ ঘ্যাচাং ঘ্যাঁচ কথায় কাটে কথার প্যাচ্।'

আমাদের মত বিশ্ব নিন্দুকের দলের আর একটা অভিযোগ আছে 'সন্দেশ' সম্পাদক সুকুমারের বিরুদ্ধে। তাঁর উত্তরাধিকার সূত্রে একটা পত্রিকা, ছাপাখানা ও ব্লকের কারখানা ছিল। ফলে তিনি নিজেকে ফুটিয়ে বাহির করতে পেরেছিলেন। এই সুযোগ ও সুবিধে থাকলে আমরাও—এবং ইত্যাদি। ভাগ্যিস এই 'সুযোগ ও সুবিধে' ছিল। নইলে কে কবে পেত এই নতুন আয়তনের লেখা, ছবি। 'প্রতিভা' নামক ধরাছোঁয়ার বাইরের বস্তুটির অস্তিত্বের কথা আমরা চিবিয়ে খেয়ে ফেললেও হজম করতে পারি ন। অথবা সুকুমারের ভাষায় বেলতলায় নেড়ার মত 'খাচ্ছে কিন্তু গিলছে না'। সুকুমার 'সন্দেশ'-এর মাধ্যমে নিজেকে বিকশিত করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে হাজির করেছেন আরও অনেক বিচিত্র লেখককে।

'সন্দেশ' না থাকলে তথাকথিত এই সুযোগ সুবিধা না পেলে—বাঙ্গলা সাহিত্য একটা মস্তবড় জিনিষ থেকে বঞ্চিত হতো। লীলাদির বক্তব্য—সুকুমারের মত আর গল্প কবিতা লেখা হয়নি—খুবই সত্যি কথা।

পত্রিকা হাতে নিয়ে কত লেখক ছিলেন বা আছেন। কই, এ রকম বিকাশ কেন দেখা যায়নি বা যাচ্ছে না? অবশ্য একেবারেই পাওয়া যায় না তা নয়। বছর কয়েক আগে একটি বিজ্ঞাপনভিত্তিক কিশোর মাসিক পত্রিকায় সামান্য একটু ছায়া পেয়েছিলাম।

এক রোবোটের মুখের গান:

'তিনতিরিক্কে আট / রামগরুড়ের হাট / শুকনো মেঘের চাট / কেওড়াতলার ঘাট, / ওহে তিনতিরিক্কে আট···।'

সুকুমার রায়-এর ইলাস্ট্রেশন নিয়েও আমরা চোখ টিপতে ছাড়ি না। তাঁর ছবিতে দুর্বলতা আছে। কিন্তু এই দুর্বলতা সবলতারই নামান্তর। ছড়াতে যে চিত্রকল্প ফুটে ওঠে, তাকে আরও ছড়িয়ে দেবার জন্য, মনের মধ্যে লাইন অথবা হাফটোন ব্লকের ছবি ছাপার মত স্থায়ী কাজ করেছেন। সেই বাল্যকালে আমার বাবা আমাকে এক খণ্ড 'সন্দেশ' কিনে দিয়েছিলেন। আমি আমার সন্তানকে

প্রথম বই উপহার দিয়েছিলাম 'আবোল তাবোল'। আমার সন্তানও তার প্রথম সন্তানকে উপহার দিল 'সুকুমার সমগ্র শিশু সাহিত্য'।

আমাদের তিন পুরুষের অন্তরের অন্তস্থলে সুকুমার-রায়-এর শুধু ছড়া, গল্পই নেই, রয়ে গেছে দুর্বল ড্রইংগুলো পর্যন্ত।

এখানে একটা জ্ঞাত কথারই পুনরাবৃত্তি করছি। শিশু বা কিশোর সাহিত্য যা-ই হোক না কেন—বড়রা আগে পড়ে মুগ্ধ হলেই ছোটরা পড়ে। বড়দের বাক্সবন্দী শিশুমন যখন বেরিয়ে এসে এর রসস্বাদন করে তৃপ্ত হয়, তখনই শিশুদের মহলে এই সাহিত্য ছাড়পত্র পায়।

নিজেকে প্রকাশ করবার জন্য একজন শিল্পী, সাহিত্যিক কত-ভাবেই না চেষ্টা করেন। ভাবা যায় ননসেন্স ক্লাব বা মনডে ক্লাবের আসরের কথা? আজও এমন আসর অনেকগুলোই বসে থাকে।

কিন্তু সেই গুণ কোথায়? কোথায় সেই 'খাই খাই' ভাব? 'খাওয়া গুরুতর হইবার আশঙ্কা আছে'। সব কিছুকে ছাড়িয়ে গেছে আড্ডার আমন্ত্রণ পত্রগুলোর বৈচিত্র্য। হয়তো এককভাবে সুকুমার-ই এই আমন্ত্রণ পত্রগুলোর স্রষ্টা নন, তবু তাঁর প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ প্রভাব থেকেই গিয়েছে।

সম্পাদক শিশির কুমার দত্ত মাঝে মাঝেই ডুব দিতেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে সুকুমারের অভূতপূর্ব নিমন্ত্রণ পত্রটিকে ভোলা যায়? অথবা পরবর্তী আমন্ত্রণ পত্র 'সম্পাদক জীবিত আছেন'-এর কথা?

আমন্ত্রণ পত্রের 'মোচ্ছব' অংশটির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। শব্দচয়ন ও ইংরেজীর ভাষান্তর যে কত রোমাঞ্চকর হতে পারে এটিতে তার একটি মহৎ নিদর্শন আছে:

মোচ্ছব

আগামী রবিবার ২৬শে মে

পূর্ব্বাহ্ন ৯-১৫ ঘটিকায়

শিয়ালদহ ২নং রোয়াকমঞ্চ হইতে
বাষ্পীয় শকট আরোহণপূর্ব্বক
গোবরডাঙ্গা প্রয়াণ।
আপনি না আসিলে জমিবে না।

এবার চিন্তা করুন—প্ল্যাটফর্মকে বলা হয়েছে রোয়াক মঞ্চ। আজকে শিয়ালদহ স্টেশনে আপনি যদি মাইকে ঘোষণা শোনেন—'বনগাঁগামী বৈদ্যুতিক শকট ৫নং রোয়াকমঞ্চ হইতে ছাড়িবে'—তবে কেমন মজা লাগবে?

চিরদিনের সুকুমার রায়

বিমল কর

বাংলা শিশু ও কিশোর সাহিত্যের যাদুকর সুকুমার রায় আজ আমাদের কাছে এক ইতিহাস। রূপকথার রাজপুত্রের সবই তাঁর কালজয়ী সাহিত্য।

কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের তাঁর জীবনসীমা বেশী দিন ছিল না। কিন্তু অল্প পরিসরে তিনি যা লিখে গেছেন কালের গতিতে চির-উজ্জ্বল। আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত।

সুকুমার রায় জন্মেছিলেন, এক আশ্চর্য পরিবারে। শিক্ষায় ও দীক্ষায় সব দিকে সে পরিবার ছিল বাংলা নবযুগের অগ্রণী। পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, তাঁরই সুযোধ্য পুত্র সুকুমার রায়।

এমন আর অপর দিকে সুপরিণত ফল। পথচলতি ঘাসের ফুল তাকে বলা চলবে না। একদিকে এক নীবর অনুভূতি ফুলের মত ফুটে উঠেছে। অন্তরের সূর্যালোক আর অপরদিকে সেই সূর্যালোকে ক্রমশপ্রদীপ্ত হয়েছে তার সাহিত্যে নানা চরিত্র চিত্রণে।

সুকুমার রায় 'সন্দেশ' সম্পাদনা কালে তাঁর লেখা ও রেখার এক নতুন ধারা বইয়ে ছিলেন, তাঁর হাসির কবিতাগুলি চরিত্র চিত্রণে ও রসধারায় সঞ্জীবিত। সুকুমার রায়ের 'ঝালাপালা' নাটকের 'অবাক জলপান' বিজ্ঞান আর হাসির ধারায় উৎস। তাই অন্যবদ্য চরিত্র দাশু, পণ্ডিতমশাই, রামপদ—বাংলার জাতীয় জীবনের জ্বলন্ত দলিল। একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, সুকুমার রায় ছিলেন তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন লেখক। সমগ্র মানসকে বাঙালী জীবন ধারায় একাত্ম করে বাস্তব চিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে সৎ সাহিত্য পাঠকের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছেন এবং, থাকবেনও।

প্রকৃতি আর মানবতার সংঘাতে মহিত্য স্রষ্টার সৃষ্ঠ কর্মটি শিল্প এবং রসতীর্ণ হয়ে ওঠে সত্য আমরা তা যে কোন সাহিত্য পাঠেই জানতে পারি। মানুষের মনের মধ্যে সুকুমার রায় সহজ করে মিশে গিয়ে কালের সীমা রেখায় আজ তিনি চির নবীন।

শিশুসাহিত্যের যাত্নকর সুকুমার রায়ের শতবর্ষে আমাদের ও ভাবীকালের কাছে এই আমাদের দাবী তাঁর চির অমর সাহিত্য শুধু ভারতে নয় পৃথিবীর সব প্রান্তে যেন ছড়িয়ে যায়।

সুকুমার রায় ও ব্রাহ্মসমাজ

দিলীপকুমাব বিশ্বাস

এই যে মন্দির হেরিছ যার
ইট কাঠময় স্থুল আকার ;
ইহাবি মাঝারে কত যে স্মৃতি,
কত আকিঞ্চন সমাজপ্রীতি,
ব্যাকুল ভাবনা দিবসরাত
বিনিদ্র সাধনে জীবনপাত।
বহুকর্মময় এই সমাজ,
সেসব কাহিনী না কব আজ,—
আজিকে কেবল স্মরণে আনি
ব্রাহ্মসমাজের মহান বাণী।
যে বাণী শুনিনু রাজার মুখে,
মহর্ষি যাহারে ধরিল বুকে,
কেশব যে বাণী প্রচাব করে—
স্মরি আজ তাহা ভকতি ভরে।
রক্তাক্ষরে লিখা যে-বাণী রটে
এই সমাজেব জীবনপটে—
"স্বাধীন মানবহৃদয়তলে
বিবেকের শিখা নিয়ত জ্বলে।
গুরুর আদেশ সাধুর বাণী
ইহার উপরে কারো না মানি।"
স্বাধীন মনের এই সমাজ
মুক্ত ধর্মলাভ ইহার কাজ।

হেথায় সকল বিরোধ ঘুচি
রবে নানা মত নানান রুচি,
কাহাবো রচিত বিধি বিধান
রুধিবে না কাহারো প্রাণ।
প্রতি জীবনের বিবেক ভাতি
সবাব জীবনে জ্বালিবে বাতি।
নরনারী হেথা মিলিয়া সবে
সম অধিকারে আসন লভে।
প্রেমেতে বিশাল জ্ঞানে গভীর,
চরিত্রে সংযত, করমে বীর,
ঈশ্বরে ভকতি মানবপ্রীতি,—
হেথা মানুষেব জীবন নীতি।
ফুরাল কি সব হেথায় আসি ?
আসিবে না প্রেম জড়তা নাশি ?
জাগিবে না প্রাণ ব্যাকুল হয়ে,
নব নব বাণী জীবনে লয়ে ?
জ্বলিবে না নব সাধন শিখা ?
নব ইতিহাস হবে না লিখা ?
চিররুদ্ধ রবে পূজার দ্বার ?
আসিবে না নব পূজারী আর ?
কোথাও আশার আলো কি নাহি ?
শুধাই সবার বদনে চাহি।

সুকুমার রায়ের 'অতীতের ছবি' (১৯২২) থেকে উৎকলিত এই পঙক্তিগুলির তাৎপর্য বুঝবার পক্ষে উক্ত দীর্ঘ কবিতাটির রচনার সময়

ও উপলক্ষ একটু খুঁটিয়ে জানবার প্রয়োজন আছে। জীবনের শেষ প্রায় আড়াই বছর সুকুমার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এবং ১৯২৩ সালে এই রোগেই তাঁর জীবনান্ত হয়। মৃত্যুর বৎসরাধিক কাল পূর্বে রোগশয্যায় শয়ান অবস্থাতেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ১৯২২/১৯২৯ সালের বার্ষিক মাঘোৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত বালক-বালিকা সম্মেলনে বিতরণের জন্য কবিতাটি পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হয়েছিল। বর্তমান নিবন্ধের পক্ষে রচনাটির গুরুত্ব এখানেই। এই আদ্যোপান্ত পাঠ করলে স্পষ্ট বোঝা যায় জীবনের প্রায় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লেখকের আধ্যাত্মিক জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শ কি ছিল ; এবং ব্রাহ্মসমাজে সেই আদর্শের অবক্ষয় মৃত্যুশয্যায় তাঁর কি গভীর মর্ম-পীড়ার কারণ হয়েছিল। ব্রাহ্মসমাজের গৌরবময় অতীতের সঙ্গে তার নৈরাশ্যজনক বর্তমানের তুলনা করে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এর মহান আদর্শের দ্বারা উদ্বোধিত হবার ব্যাকুল আহ্বান জানিয়ে কবিতা শেষ করেছেন।

নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মপরিবারে সুকুমার রায়ের জন্ম। পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত মসুয়াগ্রামের এই রায়চৌধুরী (পরে এঁরা সংক্ষেপে লিখতেন রায়) পরিবার চারিত্রিক দৃঢ়তা বিদ্যানুরাগ ও আধ্যাত্মিক প্রবণতার জন্য বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিলেন সুকুমারের প্রপিতামহ লোকনাথের সময় থেকেই। সুকুমারের পিতারা পাঁচ ভাই—এঁদের মধ্যে পিতা উপেন্দ্রকিশোর সহ তিনজন—দ্বিতীয় উপেন্দ্রকিশোর (কামদারঞ্জন), চতুর্থ কুলদারঞ্জন এবং কনিষ্ঠ ও পঞ্চম প্রমদারঞ্জন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, জ্যেষ্ঠ সারদারঞ্জন ও তৃতীয় মুক্তিদারঞ্জন সনাতন হিন্দু সমাজভুক্তই থেকে যান।

কিন্তু তিন ভাইয়ের এই ধর্মান্তর গ্রহণ শেষ পর্যন্ত কোনো পারিবারিক অপ্রীতি ঘটায়নি—ভাইদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, স্নেহ ও সদ্ভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। সুকুমারের পিতা উপেন্দ্রকিশোর বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন এবং সমকালে চিত্রশিল্প, সংগীত, সাহিত্য ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিলেন। নিজস্ব পেশার ক্ষেত্রেও তাঁর

কীর্তি স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল।

হাফটোন ব্লক্ মুদ্রণের কাজে তাঁর উদ্ভাবিত প্রণালী সমসাময়িক ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞ মহলে স্বীকৃতি পেয়েছিল। এই প্রতিভাবান যুবক ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করবার পর ক্রমশ এঁদের পরিবাব তদানীন্তন ব্রাহ্মমণ্ডলীতে সুপরিচিত হয়ে ওঠে। উপেন্দ্রকিশোর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এদেশে নাবীমুক্তি ও নারীপ্রগতি আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রবাদপুরুষ দ্বাবকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁর সর্বকনিষ্ঠ ব্রাহ্ম ভ্রাতা প্রমদারঞ্জনের বিবাহ হয়েছিল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেব এককালীন সুবিখ্যাত প্রচারক (পরবর্তী যুগের পরিব্রাজক স্বামী বামানন্দ ভারতী) পণ্ডিত রামকুমাব বিদ্যারত্নের কন্যাব সঙ্গে। এঁব উপবের ভাই কুলদারঞ্জনের কন্যা ছিলেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেব অপব প্রতিষ্ঠাতা ও নেতৃস্থানীয় পুরুষ গুরুচবণ মহলানবিশেব পুত্র প্রবোধ-চন্দ্রের পুত্রবধূ।

এইভাবে আত্মীয়তাসূত্রে রায়চৌধুরী পরিবার সমকালীন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্ম ঐতিহ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত হয়েছিল। সেকালের ব্রাহ্মগণকে বক্ষণশীল হিন্দুসমাজের হাতে সামাজিক নির্যাতন ও ব্যঙ্গবিদ্রূপ সহ্য করতে হত। এ কারণেও বটে এবং নূতন আদর্শবাদের প্রেরণাতেও বটে তৎকালীন ব্রাহ্মমণ্ডলীর মধ্যে একটি খুব জমাট একাত্মতার ভাব ছিল। পরস্পরের মধ্যে মেলামেশা, যাওয়া আসা, সুখদুঃখের খবর নেওয়া, কারও কোনো সমস্যা বা বিপদ এলে অন্য পাঁচজনের স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্য করা প্রভৃতি খুব বেশী ছিল। তখন কলকাতা শহরের পরিধিও এত বিস্তীর্ণ হয়নি; উত্তর কলকাতাই শহরের সাংস্কৃতিক জীবনের প্রাণকেন্দ্র ছিল। ব্রাহ্ম পরিবারগুলিও বেশীর ভাগ বাস করতেন পরস্পরের অনতিদূরে। নিত্য দেখা শোনা ও মেলামেশার পক্ষে এই পরিস্থিতি খুবই সহায়ক ছিল। উপেন্দ্র-কিশোরের পরিবারেও তাই ছিল তদানীন্তন অনেক জ্ঞানী গুণী নেতৃস্থানীয় মানুষের আনাগোনা। এঁদের মধ্যে ছিলেন স্বনামধন্য

আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রেমিক ভক্ত ও দরদী ব্রাহ্ম প্রচারক পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস, বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ। উপেন্দ্রকিশোর ছিলেন কবির বিশেষ প্রীতিভাজন বন্ধু। তাঁর সাহিত্য ও সংগীতচর্চার বিশেষ অনুরাগী ও উৎসাহদাতা ছিলেন কবি। তাছাড়া উপেন্দ্রকিশোরের শ্বশুর সুকুমারের মাতামহ দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ও এঁদের সঙ্গে বাস করেছেন একই বাড়িতে। তাঁর ও তাঁর দ্বিতীয়া পত্নী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের (প্রথম বাঙালী মহিলা গ্র্যাজুয়েটদের অন্যতমা ও সুপ্রসিদ্ধ বাঙালী মহিলা চিকিৎসক) সঙ্গেও এই পরিবারের ছিল নিত্য যোগাযোগ। সুকুমার তাঁর বাল্যকালে মাতামহের খুব ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসবার সুযোগ না পেলেও (দ্বারকনাথের মৃত্যু হয় ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে সুকুমারের ১০/১১ বছর বয়সে) তৎকালীন সমাজ-সেবক মহলের এই প্রবাদ পুরুষকে বাল্যকালে অনেক দেখেছেন এবং তাঁর তেজস্বিতার অনেক কাহিনী নিশ্চয় শুনেছেন। অন্যদিকে উপেন্দ্রকিশোরের ভগ্নীপতি ছিলেন সুপরিচিত বিদগ্ধ ব্যবসায়ী হেমেন্দ্রমোহন বসু। শিল্প সংস্কৃতিতে খেলাধুলোর জগতে আমহার্স্ট স্ট্রীটের এই বসু পরিবার ছিলেন সেকালে কলকাতায় অগ্রগণ্য।

এঁদের সঙ্গেও আত্মীয়তাসূত্রে রায় পরিবারের সম্পর্ক ছিল অতি ঘনিষ্ঠ। এইভাবে সুকুমারের শৈশব, কৈশোর ও প্রথম যৌবন অতিবাহিত হয়েছে একটি নিটোল, সুন্দর ও উষ্ণ ব্রাহ্ম পরিবেশে। গুরুজনরা সকলেই ছিলেন গভীর ঈশ্বরবিশ্বাসী, ব্রহ্মসমাজের ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও মানবসেবার আদর্শে দৃঢ় আস্থাশীল। ব্যক্তিত্বের অবাধ স্ফূর্তির উপর পড়ত ঘনসন্নিবিষ্ট মণ্ডলীগত চেতনার তৃপ্তিকর প্রলেপ, কিন্তু কোথাও তা ব্যক্তিস্বরূপের বিকাশে বাধা জন্মাত না।

খুব স্বাভাবিক ভাবেই তাই ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের সমস্ত সংস্কার ও মূল্যবোধ আজন্ম সুকুমারের মনে সঞ্চারিত হয়েছিল। এর সঙ্গে তাঁর নৈসর্গিক প্রতিভা যুক্ত হয়ে গড়ে তুলেছিল সম্পূর্ণ মানুষটিকে যাঁকে আমরা প্রধানত চিনি তাঁর অদ্বিতীয় সাহিত্যকীর্তির

মাধ্যমে। কিন্তু স্বল্পপরিসর জীবনে ব্রাহ্মসমাজের কর্মক্ষেত্রেও যে সংগঠকরূপে তিনি স্বীয় বিশিষ্ট প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছিলেন এ তথ্য আমাদেব কাছে ততটা পরিচিত নয়।

সুকুমাব বায়ের ব্রাহ্মসমাজসংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের তাৎপর্য ঠিকমত বুঝতে হলে সর্বাগ্রে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। তা হল ব্রাহ্মসমাজেব ঘোষিত নীতি—ব্রাহ্মধর্ম সর্বাংশে গৃহীব ধর্ম।

রামমোহন তাঁর বেদান্তসংক্রান্ত আলোচনায এ কথা খুব জোব করেই বলেছিলেন যে ব্রহ্মজ্ঞানে কেবলমাত্র সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ের একচেটিয়া অধিকাব নেই, যে কোনো সংসারী গৃহস্থ প্রকৃত জিজ্ঞাসু হলে তা স্বচ্ছন্দে অর্জন করতে পারে। উত্তরকালে এই সাধারণ উদাব পুত্রটিকে সম্প্রসারিত কবে দেবেন্দ্রনাথ-কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্মকে সম্পূর্ণ গৃহীব ধর্মরূপে গড়ে তুলেছিলেন। তাই ব্রাহ্মসমাজে একদিকে যেমন কোনো পেশাদার পুবোহিত সম্প্রদায়েব সৃষ্টি হয়নি তেমনি একদল সংসাবত্যাগী সন্ন্যাসীরও উদ্ভব হয় নি। এতে অবশ্য ব্রাহ্ম-সমাজের লাভ ক্ষতি দুইই হয়েছে, সে আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

কিন্তু এর ফলে অবস্থা দাঁড়িয়েছে, এই ব্রাহ্মসমাজকে তার কার্য-পরিচালনার জন্য প্রায় 'সর্বদা নির্ভর করতে হয়েছে একদল সংসারী ব্যক্তির উপর যাঁবা আপন আপন সংসার চালিয়ে উদ্‌বৃত্ত সময়টুকু ব্যয় করেছেন এর কাজে। মুষ্টিমেয় বৃত্তিভুক্ত প্রচারক অবশ্য থাকতেন—কিন্তু সর্বাধিক নির্ভর ছিল যাঁদের উপর তাঁদেব এক কথায় বর্ণনা করা যায় lay worker এই ইংরেজি শব্দদ্বয়ের দ্বারা। আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা যাবে সুকুমার রায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে এইরকম একটি শক্তিশালী lay worker গোষ্ঠী সংগঠিত করে অল্পকালের জন্য হলেও এঁদের সার্থক নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই প্রচেষ্টার মধ্যে যে উজ্জ্বল সম্ভাবনা নিহিত ছিল তা সার্থকতা লাভ করে নি কতকটা তাঁর অকাল মৃত্যুর জন্যও বটে এবং হয়ত কতকটা জীবনের অন্তিম পর্বে তাঁর অন্তর্জগতে সংঘটিত এক বিপর্যয়ের জন্যও বটে।

১৯১১ সালে ফটোগ্রাফি এবং মুদ্রণশিল্পে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য বিলাতগমনের পূর্বেই সুকুমারকে কেন্দ্র করে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত যুবকদের একটি মণ্ডলী ক্রমশ দানা বাঁধতে থাকে। সুকুমারের মধ্যে নেতৃত্বের স্বাভাবিক শক্তি ছিল, ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে তিনি সকলকে কাছে টেনে নিতে এবং স্থিরবুদ্ধিব দ্বারা পরিচালিত করতে পারতেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দির সংলগ্ন গলিতে তখন অনেকগুলি সুপবিচিত ব্রাহ্ম পরিবার বাস করতেন। সেজন্য এই অঞ্চল 'সমাজপাড়া' নামে খ্যাত হয়েছিল। এই গলিতে কোনো কোনো বাড়ির রকে বা মন্দিরের পশ্চিম প্রান্ত সংলগ্ন সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে এই যুবকদল আড্ডা-আলোচনার জন্য প্রায় প্রত্যহ সমবেত হতেন। ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে তর্কবিতর্ক, নিছক হাসিতামাশা সব কিছুই চলতে অবাধে। এঁদের উচ্চকণ্ঠে কখনো প্রবীণ গৃহস্থদের শান্তিভঙ্গও হত। সুকুমারের অন্তরঙ্গ বন্ধু এই দলভুক্ত শ্রদ্ধেয় স্বর্গত বিমলাংশু প্রকাশ রায় সুকুমারের স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে (সুকুমার রায়ের স্মৃতি' তত্ত্বকৌমুদী ১-১৬ কার্তিক ১৩৭৩/১৯৬৬, পৃঃ ১০৮-১১) এই সব সমাবেশের সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন : "সুকুমারের শুধু একটা দিকই এখানে দেখাতে চেষ্টা করছি।'...'এসো আমরা একটা দল পাকাই' বলে সুকুমার কোন দিন তাঁর দল গড়ে তোলেন নি। তাঁব দল গড়ে উঠেছিল অতি সহজ স্বাভাবিক ভাবে যেমন করে জলাশয়ের মধ্যকার একটা খুঁটিকে আশ্রয় করে ভাসমান পানার দল গিয়ে জমাট বাঁধে। সত্যই তিনি ছিলেন খুঁটিস্বরূপ. আমাদের অনেকের আশ্রয়। তাঁর বন্ধুপ্রীতি ছিল অপূর্ব। তাঁর স্নিগ্ধ শান্ত উদার চোখ দুটির মধ্যে একটা সম্মোহিনী শক্তি ছিল। যার দিকে তাকাতেন তাকেই বশ করে ফেলতেন। এ ছিল প্রেমপ্রীতির আকর্ষণ। তাঁর দলের আসর ছিল পথে পথে, তদানীন্তন সমাজপাড়ার প্রবাসী কার্যালয়ের সামনে সংকীর্ণ গলিতে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বা অধুনা অবলুপ্ত 'পান্তির মাঠে'-বসে, অথবা তাঁর ২২নং সুকিয়া স্ট্রীটের ভাড়াটে বাড়িতে

'ননসেন্স ক্লাবের' সাময়িক বৈঠকে বা ১০নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীটে গগন হোম মহাশয়ের ঘরে বসে বা দাঁড়িয়েই মাছভাজা বা আলু-ভাজা চর্বণের সঙ্গে সঙ্গে। আবার অনেক সময় আড্ডা জমতো প্রশান্ত মহলানবিশের ঘরে।...ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত যুবজনের জন্য তখন 'ছাত্রসমাজ' ছিল বটে কিন্তু তা ছিল তখন ছত্রাকরে।

জমাট একটা ব্রাহ্মযুবকগোষ্ঠীর অভাব বোধ করেছিলেন সুকুমার। তাঁর বন্ধুদের মধ্যে এমনতর একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সকলেই মহা উল্লাসে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। আর অবিলম্বে গড়লেন তিনি ব্রাহ্ম যুবসমিতি। এইভাবে ব্রাহ্ম যুবসমিতির পত্তন। আধ্যাত্মিক ও সামাজিক বিষয়ে আলোচনাদি চলতে লাগল। প্রারম্ভে উপাসনা। অনেক ব্রাহ্ম যুবক এসে যোগ দিলেন। সমাজে একটা নূতন সাড়া পড়ে গেল। মরা গাঙে বান ডাকল। সপ্তাহে একদিন—বুধবার সমাজমন্দিরেই উপাসনা ও হতে লাগল।...মাসে একবার সুকুমার এই ব্রাহ্মযুবসমিতির দলটিকে নিয়ে যেতেন কলকাতার নানা স্থানে এবং কলকাতার বাহিরেও। তাতে করে নূতন প্রেরণা পাওয়া যেত। সুকুমারের এই সব কাজের মূলে ছিল ঈশ্বরে গভীর বিশ্বাস।" বিমালাংশুপ্রকাশের এই মনোজ্ঞ প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে তদানীন্তন ব্রাহ্মযুবগোষ্ঠীর মধ্যে সুকুমারের সহজ স্বাভাবিক নেতৃত্বের পরিচয়টি সুন্দর ব্যক্ত হয়েছে। তবে তিনি স্মৃতিচারণপ্রসঙ্গে বেশ কয়েক বৎসরের কাহিনী সাধারণভাবে বিবৃত করেছেন বলেই এর কিছু টীকা প্রয়োজন। ১৮৭৮ সালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠাতৃবর্গ সমাজের আদর্শানুসারী ও সমাজনিয়ন্ত্রিত একটি যুবসংগঠনের প্রয়োজন অনুভব করেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ২৭ এপ্রিল ১৮৭৯-এ স্থাপিত হয় ছাত্রসমাজ বা **Students Weekly Service**। এই সংগঠনটির বর্ণনা দিয়েছেন শিবনাথ শাস্ত্রী...

"It was a system of weekly lectures, preceded by short divine service, intended for the students of the colleges. The

lectures were delivered on religious social, moral and politico-moral subjects. In the beginning the meetings of the service used to be held on Sunday morning in the city school hall, but were subsequently transferred to the Sadharan Brahmo Samaj Mandir and the time of the lecture was changed from Sunday morning to Saturday evening, a rule observed up to the present time. Mr. A M. Bose had a leading hand in starting that insitituion and was one of its first lecturers. The discourses of Mr. Bose…attacted large numbers of students and made the services a success from the very beginning. During the course of the last 32 years of its existence (শিবনাথ এই উক্তি করেছেন ১৯১১ সালে।—লেখক) the the students." Weekly Service has proved to be one of the most useful institutes of the Sadharan Brahmo Samaj. It has drawn into its fold a large number of young men many of whom have subsequently taken an active part in the affaris of the Samaj." (History of the Brahmo Samaj. Second Ed 1974. pp. 286-87)।

তা ছাড়া সমাজের যুব সম্প্রদায়ের "The Young Men's Theistic Society" নামক আরো একটি সংগঠন ছিল মাসে একবার করে যার নিয়মিত অধিবেশন হত। ব্রাহ্মসমাজভুক্ত শিক্ষকেরা একটি রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয়ও পরিচালনা করতেন। সুকুমার রায় যখন ব্রাহ্মসমাজের যুবশক্তিকে নূতন করে সংগঠন করবার পরিকল্পনা করছিলেন তখনো ছাত্রসমাজ নামক সংস্থাটি বর্তমান এবং সুকুমার ও তাঁর বন্ধুবর্গ অনেকেই সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এই যোগ সুকুমারের আজীবন ছিল।

১৯১৭ সালের ২ ভাদ্র সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে বর্ষীয়ান শ্রদ্ধেয় আচার্য ও প্রচারক নবদ্বীপচন্দ্র দাসকে অভিনন্দন করা হয়। এক উপলক্ষে ছাত্রসমাজের মুখপাত্ররূপে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন সুকুমার (বংকবিহারী কর, প্রেমিকবর নবদ্বীপচন্দ্র দাসের জীবনবৃত্তান্ত, পৃঃ ৮৭)।

মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে বন্ধু প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লিখিত তাঁর অধুনা প্রকাশিত গোপনীয় পত্রেও ছাত্রসমাজের সঙ্গে যোগের উল্লেখ আছে। কিন্তু সুকুমারের নেতৃত্বে সমকালীন যুবগোষ্ঠী যখন থেকে ব্রাহ্মসমাজের কাজে আকৃষ্ট হতে আরম্ভ করেছিলেন তখন ছাত্রসমাজের পূর্বের প্রতিপত্তি আর ছিল না। বিমলাংশুপ্রকাশও তাই লিখেছেন—ছাত্রসমাজ ছিল বটে, কিন্তু তা ছিল তখন ছত্রাকারে। তাই যুবকবৃন্দ একটি নূতন সংগঠনের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। এর থেকেই ব্রাহ্ম যুবসমিতির উৎপত্তি।

যুব সমিতি সংগঠনের কাজে সুকুমারের ভূমিকাকে দুটি পর্বে ভাগ করা যায়। ১৯১১ সালে উচ্চ শিক্ষার জন্য তাঁর ইংলণ্ড গমন পর্যন্ত সময়েকে আমরা প্রথম পর্ব বলতে পারি। এই সময়ে সুকুমারের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন সুকুমার। ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক সমস্যা নিয়ে এরা ত নূতন করে ভাবনাচিন্তা ও আলোচনা শুরু করেন, তা ছাড়া সমাজসেবামূলক নানা কাজে নিজেদের ব্যাপৃত রাখেন। কাজের নির্দেশের জন্যও সকলে সুকুমারের দিকেই চেয়ে থাকতেন, তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ ছিল এমনই অমোঘ। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র প্রফুল্লর (ডাক নাম মংলী) উদাহরণ এই প্রসঙ্গে বিমলাংশুপ্রকাশ দিয়েছেন। সম্পর্কে ইনি সুকুমারের মামা হতেন। এই কর্মপাগল পরহিতব্রতী মানুষটিকে যখনই যে কাজের ভার দেওয়া হত তা অল্পসময়ের মধ্যে শেষ করে তিনি এসে ভাগিনেয় সুকুমারের কাছে আরো কর্মপ্রার্থী হয়ে দাঁড়াতেন প্রশ্ন নিয়ে "তাতা, এখন কি করব বল।" নায়ক সুকুমার যেন একটু বিব্রত হয়েই মন্তব্য করতেন, "মংলুমামাকে যে কাজই দিই দুদিনেই তা সাবাড় করে এসে বলে এখন কি করব তাতা?"

দলপতি সুকুমারের এই ব্যক্তিত্ব প্রসঙ্গেই মন্তব্য করেছেন তাঁর একান্ত স্নেহভাজন প্রয়াত সাহিত্যিক হিরণকুমার সান্যাল অন্যত্র তাঁর স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে: "যেমন চেহারা, তেমনি কথাবার্তা।...তিনি আমাদের চোখের সামনে জ্বলজ্বল করতেন। তিনি দাঁড়াতেন

যেখানে আমরা সব তাঁকে ঘিরে দাঁড়াত।··· তিনি যেখানেই দাঁড়াতেন যেন চুম্বকের আকর্ষণের মতো লোক টেনে আনতেন। ·· ধরা পড়ত সুকুমার রায় ও প্রশান্ত মহলানবিশের মধ্যে একটা আত্মিক যোগসূত্র ; প্রশান্তচন্দ্র অনেক সময় যেন সুকুমার রায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেন।

প্রশান্তচন্দ্রেরও ছিল অসাধারণ ব্যক্তিত্ব কিন্তু সুকুমার রায়ের মতো ছিল না।

তাতাদার আকর্ষণী শক্তি ছিল অনেক বেশী" (পরিচয়-এর কুড়ি বছরও অন্যান্য স্মৃতি চিত্র, কলিকাতা ১৮৭৮, পৃঃ ১৬০, ১৬৬)। অবশ্য কালক্রমানুসারে হিরণকুমারের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে সুকুমারের ব্রাহ্মসামাজিক কর্মকাণ্ডের দ্বিতীয় পর্ব সংক্রান্ত। কিন্তু সুকুমারের ব্যক্তিত্বের উপর আলোকপাত করেছে বলেই এখানে বিমলাংশু-প্রকাশের সাক্ষ্যের সঙ্গে একযোগে তা উল্লিখিত হল। প্রথম পর্বে যুবসমিতি গড়ে উঠলে সুকুমারের প্রস্তাবানুযায়ী ব্রাহ্মযুবগোষ্ঠী ১৯১০ সালে "আলোক" নামে এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল চারা আনা। প্রথম সংখ্যাটি গোষ্ঠীপতি সুকুমার রায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে স্বয়ং নীলামে চড়ালেন, বিক্রী হল দশ টাকায়—ক্রেতা সংস্থার সেই নিরলস কর্মী প্রফুল্ল গঙ্গোপাধ্যায়, সুকুমারের মংলু মামা। প্রথম সংখ্যা "আলোক"-এ রবীন্দ্রনাথের একটি গান প্রকাশিত হয়েছিল "আলোয় আলোকময় করে হে এলে আলোর আলো।" বিমংলাশুপ্রকাশ বলেছেন, "সুকুমারের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ কি এটি আমাদের আলোকের জন্য নতুন রচনা করে দিলেন, না তাঁর পূর্বরচিত গান ছিল এটি, সুকুমার তাঁর অনুমতি দিয়ে উদ্ধৃত করে দিয়েছিলেন তা ঠিক জানি না।··· এখন বিচার করে দেখুন তা ঐতিহাসিকগণ।" এই প্রসঙ্গে বক্তব্য, উল্লিখিত গানটি 'গীতাঞ্জলি'র '৪৫' সংখ্যক গান, এর রচনার তারিখ ২০ অগ্রহায়ণ ১৩১৬। সে হিসাবে রচনাটির বৎসর হবে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ। অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ

'গান' সংজ্ঞক গীতসংকলনের এটি অন্তর্ভুক্ত। তাই ১৯১০ সালে প্রথম প্রকাশিত "আলোক" পত্রিকার জন্য এটি বিশেষভাবে রচিত হবার সম্ভাবনা নেই। বিমলাংশুপ্রকাশের দ্বিতীয় অনুমানই যথার্থ। এক বছর পূর্বে রচিত এই গানটি অবশ্যই কবির অনুমতি নিয়ে সুকুমার "আলোক"-এব প্রথম সংখ্যায় মুদ্রিত করেছিলেন। কবি তাঁর একান্ত স্নেহভাজন এই যুবককে নিশ্চয় আনন্দের সঙ্গেই প্রকাশের অনুমতি দিয়ে থাকবেন।

"আলোক"-এ সুকুমার ও তাঁর বন্ধুবর্গের অনেক রচনা প্রকাশিত হয়েছিল শোনা যায়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পত্রিকাটি কোনো ফাইলের সন্ধান এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। ১৯১১ সালে সুকুমারের বিদেশ-গমনেব পর পত্রিকাটিও বন্ধ হয়ে যায়। ১৯১১ থেকে ১৯১৩-প্রায় দু'বছর ইংলণ্ডে সুকুমারের ছাত্রজীবন।

লেখাপড়াটই এখানে তাঁর মুখ্য কাজ ছিল, কিন্তু যেটুকু খবর পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় এখানেও ফাঁকে ফাঁকে সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা তাঁর ঠিকই চলছে এবং ইংলণ্ডে স্থানীয় ব্রাহ্মমণ্ডলীর উৎসবানুষ্ঠানেও তিনি যোগ দিচ্ছেন।

শ্রদ্ধেয়া লীলা মজুমদার তাঁর সুকুমার-জীবনীতে যে পত্রগুলি প্রকাশ করেছেন সেগুলির মধ্যে এ বিষয়ে কিছু ইঙ্গিত আছে। ২ ফেব্রুয়ারী ১৯১২ তারিখের চিঠিতে সুকুমার তাঁর মা'কে লিখছেন, "এখানে মাঘোৎসব হয়ে গেল। শুক্রবার ওয়ালডর্ফ হোটেলে মস্ত পার্টি হল। প্রায় ২৫০ লোক হয়েছিল।···কে জি গুপ্ত ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে কিছু বললেন। তারপর গান বাজনা হল। তারপর 'বঙ্গ আমার জননী আমার' আর 'ধন-ধান্যে (?) পুষ্পে ভরা' এই গান হল। তার আগের রবিবার মিসেস রায়দের ওখানে প্র্যাক্টিস হয়েছিল। আমিও গেয়েছিলাম।" ১ মে (১৯১২) বোন পুণ্যলতা (খুশি)-কে লেখা চিঠিতে জানাচ্ছেন, **Manchester Indian Association** এর বার্ষিক ডিনার উপলক্ষে তিনি জনগণমন অধিনায়ক' গান গেয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ভারতের বর্তমান জাতীয় সংগীত 'জনগণমন অধিনায়ক' ১৯১১ সালে 'ব্রহ্মসংগীত' রূপেই রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক রচিত হয়। ঐ বৎসর কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে গানটি গাওয়া হয় দেশাত্মবোধক সংগীতরূপে এবং ১১ই মাঘ ১৩১৮ (২৫ জানুয়ারী ১৯১২) আদি ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসবে ব্রহ্মসংগীতরূপে। ২৭ জুন ১৯১২ (?) তারিখে মা'কে লেখা পত্রাংশঃ "গত শনিবার ব্রাহ্মসমাজে রবিবাবু কর্মযোগ বিষয়ে চমৎকার বক্তৃতা দিয়েছিলেন। অনেক লোক হয়েছিল।" ··কেবল শান্তিলতা (টুনি)-কে ম্যাঞ্চেস্টার থেকে ৯ জানুয়ারী ১৯১৩ তারিখের চিঠিঃ "···মাঘোৎসবের সব খবর দিয়ে চিঠি লিখিস, মণিকেও লিখতে বলিস। আমি মাঘোৎসবের সময় week-end ticket করে লণ্ডনে যাব। সেখানে মাঘোৎসব হবে।" এ ছাড়া সুকুমারের বিলাত প্রবাস সম্পর্কে যা উল্লেখযোগ্য তা হল সেখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ও ইংলণ্ডে রবীন্দ্রভাবধারা প্রচারে তাঁর প্রয়াস। রবীন্দ্রনাথও এই সময়ে ইংলণ্ডে ছিলেন।

উপেন্দ্রকিশোরের পরিবারের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ দিনের ঘনিষ্ঠতা এবং সেই সূত্রে সুকুমার ছিলেন তাঁর অত্যন্ত স্নেহভাজন। ২১ জুন ১৯১২ বোন পুণ্যলতা (খুশি)-কে লেখা চিঠিঃ "পরশুদিন Mr. Pearson···তাঁর বাড়িতে আমায় Bengali literature সম্বন্ধে একটা paper পড়বার নেমন্তন্ন করেছেন। ঘরে ঢুকে দেখি রবিবাবু বসে রয়েছেন। বুঝতেই পারছিস আমার কি রকম অবস্থা। যা হোক, চোখ কান বুজে পড়ে দিলাম। লেখাটার জন্য খুব পরিশ্রম করতে হয়েছে।

India Office Library থেকে বইটই এনে materials যোগাড় করতে হয়েছিল। তা ছাড়া রবিবাবুর কয়েকটা কবিতা ('সুদূর' 'পরশপাথর' 'সন্ধ্যা' 'কুঁড়ির ভিতর কাঁদিছে গন্ধ' ইত্যাদি) অনুবাদ করেছিলাম। সেগুলো সকলের খুব ভালো লেগেছিল।··· Mr. Cheshire আর Mr. Cranmer Byng (Northbrook

-এর Secretary) খুব খুশি হয়েছেন। Mr. Byng আমাকে আমাকে ধরেছেন আরও অনুবাদ করে দিতে, তিনি publish করবেন।...Rothenstein আমার ঠিকানা নিয়ে গেলেন। বললেন, "You must come to our place to dinner."। ২৫শে জুলাই ১৯১২ (?) আর এক পত্রে সুকুমার জানাচ্ছেন; "আজ একটা বড় পার্টি আছে। মিসেস নাইডু আসবেন। আমাদেরও সব নেমন্তন্ন হয়েছে। গত সোমবার এখানের একটা ক্লাবে East and West Society-তে "The Spirit of Rabindranath বলে একটা Paper পড়লাম। Quest কাগজের editor Mr. Mead তাঁর প্রবন্ধটা খুব পছন্দ হয়েছে। তিনি সেটা Quest-এ ছাপাচ্ছেন। রবিবাবু দু সপ্তাহ nursing home-এ ছিলেন, কয়েকদিন হল সেখান থেকে এসেছেন। তরশু দিন আমরা তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। সেদিন Royal Court Theatre-এ তাঁর 'ডাকঘর' অভিনয় হয়েছিল। 'মালিনী' আর 'চিত্রাঙ্গদা' ও বোধ হয় শীগ্‌গিরই কোথাও করা হবে। বিলেতে রবিবাবুর খুবই নাম হয়েছে। এখানকার বড় বড় poet-রা রবিবাবুর নাম করতে লাগল। এবার যিনি Poet Laureate হলেন, Dr. Bridges, তিনি তাঁর ছেলেকে রবিবাবুর সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করবার জন্য নিয়ে এসেছিলেন।" দেখা যাচ্ছে সুকুমার ইংলণ্ডে অবসরমত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগরক্ষা করতে তো চলছেনই এবং বাংলা সাহিত্য, রবীন্দ্র-ভাবধারা ইত্যাদি বিষয়ে সভাসমিতিতে প্রবন্ধ পাঠ করে ও প্রয়োজনানুসারে রবীন্দ্রনাথের কবিতার নিজকৃত ইংরেজি অনুবাদ শুনিয়ে রবীন্দ্রনাথকে ইংলণ্ডের বিদগ্ধ রসিক মহলে পরিচিত করবার চেষ্টাতেও রত আছেন।

এ কথা স্মরণযোগ্য রবীন্দ্রকাব্যের স্বয়ং কবিকৃত অনুবাদ পাশ্চাত্ত্যদেশে প্রচারিত হবার সমকালে কবির দুই তরুণ অনুরাগীও নিজেদের কিছু কিছু অনুবাদের মাধ্যমে ইংলণ্ডে কবির পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছিলেন। এঁদের একজন সুকুমার রায়, অন্যজন তাঁরই

অন্তরঙ্গ বন্ধু অজিতকুমার চক্রবর্তী। আমেরিকাতে অতি সীমিত বৃত্তের মধ্যে একই কাজ করেন কবির পুত্রসম স্নেহভাজন সন্তোষ মজুমদার। সুকুমার রায়ের পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধটির (**The Spirit of Rabindranath**) কিছু আলোচনা যথাস্থানে আমাদের প্রয়োজন হবে।

দেশে ফেরবার পর ব্রাহ্মসমাজের কর্মক্ষেত্রে সুকুমার ও তাঁর বন্ধুবর্গ রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যে বিতর্কে জড়িত হয়ে পড়েন তার ভূমিকা হিসাবে ইংলণ্ডে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুকুমারের এই যোগাযোগ ও তাঁর রবীন্দ্রকাব্য প্রচারের উদ্যম খুবই প্রাসঙ্গিক। যতদিন সুকুমার প্রবাসে ছিলেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃপক্ষ কিন্তু তাঁদের এই তরুণ প্রতিভাশালী ভবিষ্যতের ভরসাস্থল কর্মীটিকে ভোলেননি। ১লা আশ্বিন ১৩২০ সংখ্যা 'তত্ত্বকৌমুদী' (পৃঃ ১৩০) তাঁর কৃতিত্বের সংবাদ সগর্বে প্রচার করেছেন: "ব্রাহ্মযুবকের কৃতিত্ব: শ্রীউপেন্দ্র-কিশোর রায় চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীসুকুমার রায় চৌধুরী লণ্ডন সিটি এণ্ড গিল্ডস পরীক্ষার টেকনলজিতে প্রথম বিভাগের প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।" সে যাত্রা সুকুমার দেশে ফেরেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একই সময়ে। সে খবরটুকুও দিয়েছেন ১৬ আশ্বিন ১৩২০ তারিখের 'তত্ত্বকৌমুদী' (পৃঃ ১৪৪): "প্রত্যাগমন: বিগত ২৯এ সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংলণ্ড ও আমেরিকা পরিভ্রমণ করিয়া কলিকাতা প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তিনি গান ও কবিতার ভিতর দিয়া জগৎকে যে উদার আধ্যাত্মিক সত্য দিয়াছেন, পাশ্চাত্য দেশে এবার তাহার একটু আভাস পাইয়া স্তম্ভিত হইয়াছেন। তাঁহার আদরে ভারতের গৌরব, ব্রাহ্মসমাজের গৌরব। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অনেক লোক হাওড়া স্টেশনে সমবেত হইয়াছিল। শ্রীমান সুকুমার রায়চৌধুরী ও শ্রীমান কালীমোহন ঘোষও ইংলণ্ডে শিক্ষা সমাপন করিয়া এই সঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।"

বিদেশ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর থেকে তাঁর মৃত্যুকাল

(১০ সেপ্টেম্বর ১৯২৩) পর্যন্ত সময়ই সুকুমারের জীবনের শ্রেষ্ঠ পর্ব। সৃজনশীল সাহিত্যপ্রতিভারূপে, নানা যোগ্যতা ও বিচিত্র কর্মশক্তির অধিকারী এক বিদগ্ধ যুবগোষ্ঠীর মধ্যমণিরূপে, ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহী, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সংগঠকরূপে সুকুমার সর্বক্ষেত্রেই যেন এই সময়ে তুঙ্গ স্পর্শ করেছিলেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভার বিচিত্র বিকাশ লক্ষ করা গেলেও সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে একটি যোগসূত্রও খুঁজে পাওয়া যায়। পূর্বতন 'ননসেন্স ক্লাব'-এর ধারাটিই এই পর্বে আবও জমাটভাবে মুঞ্জরিত হয়ে উঠেছিল নূতন প্রতিষ্ঠিত মণ্ডে ক্লাব (বা মণ্ডা ক্লাব)-এর মধ্যে। আবার এই গোষ্ঠীতে যাঁরা এসে সমবেত হয়েছিলেন তাঁদের অধিকাংশকেই একই সময়ে দেখতে পাওয়া যায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহী যুবক কর্মীরূপে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পূর্বতন যুব-ছাত্র সংগঠন students' weekly service-এ (যা এতদিনে কিছু বিশৃঙ্খল ও হীনবল হয়ে পড়েছিল) নূতন প্রাণসঞ্চার করতে এগিয়ে এলেন সুকুমারের নেতৃত্বে এই যুবগোষ্ঠী। ফলে এই পর্বে ব্রাহ্মসমাজের যুবশক্তি নূতন করে নব আদর্শে সংগঠিত হয়েছিল। এই রূপান্তরকে ঠিক মত বুঝতে হলে— যুবচিত্তে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আদর্শগত আকর্ষণের প্রকৃত হেতু কি ছিল তা একটু তলিয়ে দেখা আবশ্যক। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠাতৃবর্গ একটা সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার আদর্শকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। ধর্মসমাজ পরিচালনায় একনায়কত্বের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত স্বাধীন বিচারবুদ্ধির সম্পূর্ণ প্রয়োগেব দাবি উপলক্ষে এই সংগ্রাম প্রথম শুরু হয় বটে—কিন্তু তত্ত্বগতভাবে এটি আদৌ ছিল জীবনের সর্বক্ষেত্রে এই ব্যক্তিস্বাধীনতার আদর্শকে জয়যুক্ত করবার আন্দোলন। কথাটি পরিষ্কার করে বলেছেন বিপিনচন্দ্র পাল : "ব্রাহ্মসমাজ যে স্বাধীনতার আদর্শকে ধর্মসাধনে ও পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহাকেই রাষ্ট্রীয় শাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য দেশের শিক্ষিত লোকেরা লালায়িত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম-

সমাজের স্বাধীনতার সাধকেরা এই স্বদেশপ্রেমকে তাঁহাদের ধর্মজীবনেব আদর্শে'র অঙ্গীভূত করিয়া নিজেদের স্বাধীনতার আদর্শকে পরিপূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী ব্রাহ্মসমাজের এই স্বাধীনতাব সাধকদের অগ্রণী হইয়া উঠেন" (বঙ্গবাণী, আশ্বিন ১৩২৯, পৃ: ১৪৬)। যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য—এই পরিপূর্ণতার আদর্শের দুটি লক্ষণ। তা ছাড়া, উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, বিশেষত শেষ দুই দশকে বিদেশী শাসন সম্পর্কে জাতিব মোহ ধীবে ধীবে ভাঙছে. দেশচেতনা ক্রমশ স্পষ্ট রূপ গ্রহণ কবছে, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অন্তত‌পক্ষে স্বায়ত্তশাসনের আদর্শ আব শিক্ষিত সম্প্রদায়েব কল্পনাবহির্ভূত নয়। সাধাবণ ব্রাহ্মসমাজ প্রচাবিত সর্বাঙ্গীণ মুক্তির আদর্শে এই নবজাগ্রত স্বদেশচেতনা এবং স্বদেশপ্রীতির স্পর্শ লেগেছিল। এই সময় কিন্তু দেখা যায় কেশবচন্দ্র ও তাঁর মণ্ডলী কতকটা জোয়ারের উল্টো মুখে চলতে প্রয়াসী। তাঁবা ঘোষণা করলেন বাজভক্তি তাঁদের মণ্ডলীর ধর্মাচরণেব এক অচ্ছেদ্য অঙ্গ। নববিধান ব্রাহ্মসাজের ইংরেজি মুখপত্র New Dispensation-এর প্রথম সংখ্যায় লেখা হয়েছিল :

"The earthly sovereign is God's representative and must therefore have our allegiance and homage. We look upon Victoria as our Queen Mother and we are politically her children···Therefore we love her and honour her, and consider loyalty to be as sacred as filial obedience. A man who hates his sovereign, is morally as culpable as he who abhors and maltreats his father or mother. Sedition is rebellion against the authority of God's representative and therefore against God."

এর প্রতিবাদ করেছিলেন আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে :

"Politics is beyond the sphere of operations of the Brahmo samaj. Yet when our friends go to the length of meking it an

important article of faith, we must at once tell the Brahmo reader, that in politics we are for representative Government by the people themselves in a Government where laws are made and the country is governed not for them but by them." (The New Dispensation and the sadharan Brahmo Samaj, Madras, 1881, p. 72)।

এই নীতি ভারতবর্ষে কতদিনে কার্যকর করা যাবে সে বিষয়ে তাঁরা নিশ্চিত ছিলেন না—কিন্তু তত্ত্বগতভাবে তাঁরা প্রথম থেকেই এতে বিশ্বাস করেছেন এবং বারবার এটি ঘোষণা করেছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'তত্ত্বকৌমুদী'তে এই সময়ে লেখা হয়েছিল: "[ব্রাহ্মসমাজ] অন্যায়ের উপর ন্যায়, অসাম্যের উপর সাম্য, রাজার উপর প্রজার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া পৃথিবীব্যাপী একটি মহাসাধারণতন্ত্রের আয়োজন করিতেছেন। এই স্বাধীনতা দেখিয়ে বহু লোক এখানে সমাগত হইয়াছেন। এই সর্বতোমুখী ভাব ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ গৌরব" ('তত্ত্বকৌমুদী' ১৬ ফাল্গুন, ১৮০৩ শক ১৮৮ খ্রীঃ পৃঃ ২০৬)। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে যাঁদের জন্ম সেই প্রজন্মের যুবকগণের কাছে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ভাবাদর্শের মধ্যে প্রকাশিত এই সর্বাঙ্গীণ মানবমুক্তির আদর্শ এর বিমূর্ততা সত্ত্বেও অবশ্যই আকর্ষণের বস্তু ছিল। এককালে কেশবচন্দ্রও ব্যক্তি-স্বাধীনতা আদর্শের প্রবক্তা ছিলেন, এখন তিনি পিছিয়ে পড়েছেন। ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন শাখার মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকেই যে সুকুমার রায় ও তাঁর সহচরগণ কর্মক্ষেত্র নির্বাচন করেছিলেন, এই সমাজের সঙ্গে তাঁদের জন্মগত যোগসূত্র ছাড়াও এর আদর্শের উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যও তার একটি কারণ বলে গণ্য করা চলে।

বিদেশ থেকে ফেরবার পর সুকুমার তাঁদের পারিবারিক ব্যবসায়ে পিতার প্রধান সহায়করূপে আত্মনিয়োগ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাংগঠনিক কাজের সঙ্গেও যুক্ত হন। ১৬ মাঘ ১৩২০ সংখ্যা 'তত্ত্বকৌমুদী'তে দেখা যায় (পৃঃ ২৩৯) ১৯১৪

সালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছেন। 'ছাত্রসমাজ'-এর সঙ্গেও এই সময় থেকে তিনি আরো ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু যথেষ্ট আগ্রহ থাকলেও সমাজের কাজে নিজেকে সম্পূর্ণ ডুবিয়ে দেওয়ার অবসর সম্ভবত প্রথম দু'তিন বছর তিনি পাননি। এই সময় পিতা উপেন্দ্রকিশোরের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং ১৩২২ ১৯১৫ সালে তাঁর অকাল মৃত্যু ঘটে। এর ফলে 'ইউ রায় অ্যাণ্ড সন্স' প্রতিষ্ঠানের সমস্ত ভার এসে পড়েছিল সুকুমারের উপর।

প্রসঙ্গত বক্তব্য, পিতার শ্রাদ্ধবাসরে সুকুমার জ্যেষ্ঠ পুত্র হিসেবে স্বলিখিত যে জীবনীটি পাঠ করেছিলেন (প্রকাশিত 'তত্ত্বকৌমুদী' ১ মাঘ ১৩২২ ১৫ জানুয়ারী ১৯১৬, পৃঃ ২২৬-২৯) সেটি তাঁর কোনো রচনা সংগ্রহে আজ পর্যন্ত সংকলিত হয়নি। পিতার প্রতি তাঁর অসীম শ্রদ্ধা এর ছত্রে ছত্রে যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি অন্তিম মুহূর্তে উপেন্দ্রকিশোরের অকুতোভয়তা, অটল স্থৈর্য ও আনন্দচেতনার বর্ণনা মৃত্যুপথযাত্রীর এক নতুন পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করেছে প্রচলিত জীবনী-গুলিতে যার অনেকটাই খুঁজে পাওয়া যায় না। তা ছাড়া, জীবন-মৃত্যু সংক্রান্ত ব্রাহ্মসমাজের অধ্যাত্মদর্শনে সুকুমার স্বয়ং যে কতখানি দৃঢ়প্রত্যয়ী ছিলেন ঈষৎ ভাবপ্রবণ এই রচনাটি তারও এক উল্লেখযোগ্য স্মারক।

পারিবারিক দায়দায়িত্ব ছাড়াও ব্রাহ্মসমাজের কাজে সুকুমারের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ১৯১৩-১৪ সালে উচ্চ শিক্ষার জন্য ছিলেন ইংলণ্ডে। ১৯১৫ সালে তাঁর প্রত্যাবর্তনের পর ধীরে ধীরে তিনিও জড়িত হলেন মনডে ক্লাবে এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কাজে সুকুমারের নিত্যসঙ্গীরূপে।

সমাজের কাগজপত্র থেকে দেখা যায়, ১৯১৬-১৭ থেকেই সুকুমার সমাজের কাজে ক্রমশ অগ্রণীর ভূমিকা নিচ্ছেন এবং তাঁর পাশে সর্বদা রয়েছেন প্রশান্তচন্দ্র। অবশ্য আরো অনেকেই ছিলেন এঁদের পাশে, অজিতকুমার চক্রবর্তী, প্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, কেদারনাথ

চট্টোপাধ্যায়, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, অমল হোম, জীবনময় রায়, শিশিরকুমার দত্ত, কালিদাস নাগ, সুশোভনচন্দ্র সরকার, হিরণকুমার সান্যাল প্রভৃতি অনেকের নামই এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। কিন্তু পুরোভাগে সর্বদা থেকেছেন উল্লিখিত দুজন।

এককালীন এই মণ্ডলীর অন্তর্গত স্বর্গত হিরণকুমার সান্যালের কথায়ঃ "মানডে ক্লাব কিছুদিন পরে উঠে গেল।...এই সময় অন্য একটি ক্ষেত্রে সুকুমার রায়ের ব্যক্তিত্ব যেন আরো বেশি করে প্রকট হয়েছিল ও আশ্চর্যভাবে আমাদের স্পর্শ করেছিল। ওঁকে আমরা আরো বেশি করে আরো বড় করে পেলাম। সেই ক্ষেত্রটি হল ব্রাহ্মসমাজ।

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের মনে হল ব্রাহ্মসমাজের সংস্কার-সাধন প্রয়োজন, তাকে আরো প্রগতিশীল করতে হবে।...প্রশান্তচন্দ্র এই আন্দোলনে ছিলেন স্ট্র্যাটেজিস্ট কিন্তু সুকুমার রায় ছিলেন এর প্রাণকেন্দ্র" ('পরিচয়-এর কুড়ি বছর ও অন্যান্য স্মৃতিচিত্র' পৃঃ ১৬৬)।

যুবগোষ্ঠী যখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে এই আন্দোলন আরম্ভ করেন এই প্রতিষ্ঠানের সেই সময়কার আভ্যন্তরীণ চিত্রটি এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠাতৃ নেতৃবর্গের মধ্যে অধিকাংশই তখন হয় প্রয়াত না হয় অবসৃত। শিবচন্দ্র দেব, আনন্দমোহন বসু, দুর্গামোহন দাস, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির মত অসাধারণ পুরুষেরা সকলেই ইহলোক ত্যাগ করেছেন। শিবনাথ শাস্ত্রী জীবিত থাকলেও (মৃত্যু ১৯১৯) ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য প্রায় সর্বদা শয্যাশায়ী, সমাজের কাজকর্মের সঙ্গে সর্বদা যোগরক্ষা করে চলা তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না।

প্রবীণদের মধ্যে গুরুচরণ মহলানবিশ তখনো সক্রিয়, কিন্তু সমাজের নেতৃত্ব বলতে যা বোঝায় তা এসে বর্তেছিল অপেক্ষাকৃত বয়ঃকনিষ্ঠ আর এক দলের হাতে যাঁদের মধ্যে কৃষ্ণকুমার মিত্র, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, নীলরতন সরকার, শশিভূষণ বসু,

ডঃ প্রসন্নকুমার রায়, ললিতমোহন দাস, নবদ্বীপচন্দ্র দাস, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ প্রভৃতি ছিলেন প্রধান। ব্যক্তিত্বে, সততায়, নিষ্ঠায়, চরিত্রবলে এঁরা সকলেই বরণীয় পুরুষ। এঁদের মধ্যে জ্ঞানী, গুণী, শাস্ত্রজ্ঞ, প্রেমিক, ভক্ত, বিশ্বাসীরও অভাব ছিল না। কিন্তু এঁদের অনেকেরই নৈতিক শুচিতার ও শৃঙ্খলাবোধের আদর্শ ছিল কিছুটা সংকীর্ণ ও কঠোর। তাছাড়া যেহেতু একনায়কত্ব, ভক্তির অসংযত' উচ্ছ্বাস। প্রভৃতির সংগে সংগ্রামের মাধ্যমে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্ম হয়, সেই কারণে গোড়া থেকেই এখানে ধর্মাচরণে বিন্দুমাত্র নবমীয়তার আভাসকে সন্দেহের চোখে দেখা হত। ধ্যানধারণা বা শাস্ত্রচর্চায় বাধা অবশ্য ছিল না, কিন্তু এসবের চেয়ে নীতিজ্ঞান, কর্তব্যপরায়ণতা, লোককল্যাণ সমাজ সংস্কার প্রভৃতির স্থান উচ্চতর বিবেচিত হত। নেতৃবৃন্দের মধ্যে শিবনাথ শাস্ত্রী সর্বপ্রথম অনুভব করেন যে এই মনোভাব ভবিষ্যতে আধ্যাত্মিক জীবনের গভীরতার পথে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে। তাই এর প্রতি-ষেধকরূপে বহু প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করে ১৮৯২ সালে শিবনাথ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'সাধন-আশ্রম'। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এটি কালক্রমে হয়ে দাঁড়াবে সমাজের আধ্যাত্মিক শক্তির মূল উৎস। ১৯১৬-১৭ খ্রীষ্টাব্দে 'সাধন-আশ্রম' ছিল যথেষ্ট সজীব ও সক্রিয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও rationalism ও mysticism এই দুটি ধারার মধ্যে সমগ্রভাবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে প্রথমটিরই প্রাবল্য দেখা যেত।

সুকুমার রায়ের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ যুবগোষ্ঠী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে প্রথম যে পরিবর্তন ঘটালেন তার কাহিনী সাধারণ্যে সুপরিচিত নয়। বর্তমান সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দির যখন নির্মিত হয় তখন সেখানে যে উপাসনা বেদীটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা ছিল সিমেন্ট বাঁধানো একটি স্থায়ী আসন।

যুবকবৃন্দের মনে এমন আশংকা হয় যে এই স্থায়ী, অনড় উপাসনার আসনটি হয়তো কালক্রমে একটি প্রতীকে পরিণত হতে পারে। এমন হওয়াও অসম্ভব নয় যে ভবিষ্যতে কোনো উপসক ঐ আসনেই বিশেষ

পবিত্রতা আরোপ করে তাকেই প্রণাম নিবেদন করবেন।

ব্রাহ্মসমাজের প্রতীকহীন উপাসনা যে সম্পূর্ণ এ বিপদ থেকে মুক্ত নয় এ নজির ছিল নববিধান ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রয়াণের পর সেখানকার প্রচারক সংঘ বা 'শ্রীদরবার'-এর পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে নববিধানের আচার্য (কেশবচন্দ্র) যদিও এখন প্রয়াত, তবু তিনি এখনো আমাদের আচার্য ও নেতা আছেন এবং অনন্তকাল তাই থাকবেন। সুতরাং ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মা-মন্দিরে তাঁর যে বেদী ছিল তা চিরকালই শূন্য রাখা হবে। এর পর আর কোনো আচার্যও নিযুক্ত হতে পারেন না, যাঁরা নিযুক্ত হবেন তাঁরা হবেন উপাচার্য এবং তাঁদের ব্যবহারের জন্য একটি স্বতন্ত্র বেদী নির্মিত হবে। এই ব্যবস্থার প্রবল প্রতিবাদ করেছিলেন নববিধান ব্রাহ্ম-সমাজেরই সুপ্রসিদ্ধ নেতা ও আচার্য প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। তাঁর নিজের ভাষায়.

"The wording of their resolution was to the effect that 'the pulpit of the Brahma Mandir was to be kept vacant in token of our eternal relationship to the (late) minister.' This was against the spirit and principle of the Brahmo Samaj. Apart from the policy of keeping the pulpit of a place of worship for ever vacant, a material object to symbolise spiritual relation is the beginning of idolatry." (S. C. Bose The Life of Protap Chunder Mozoomdar, Vol II, Nabavidhan Trust, Calcutta 1929. p. 118)।

প্রতাপচন্দ্র শতচেষ্টা করেও এই ব্যবস্থার প্রতিকার করতে পারেননি, নিজেই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দির থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। কেশবচন্দ্র ব্যবহৃত বেদী ও আসন দীর্ঘকাল যেখানে শূন্য রাখা হয়েছিল। (বর্তমানে অবশ্য এই ব্যবস্থা আর নেই।) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যুবক কর্মীরা আশংকা করলেন স্থায়ী উপাসনার আসন রক্ষা করলে এখানেও ভবিষ্যতে এমন বিপদ কোনো দিন দেখা দিতে

পারে। তাই রাতারাতি তাঁরা একদিন শাবল দিয়ে এই সিমেণ্ট গাঁথা স্থায়ী বেদী ভেঙ্গে ফেলেন এবং তার স্থানে পূর্বপরিকল্পিত এমন একটি কাষ্ঠাসন বসিয়ে দেন যেটিকে ইচ্ছামত সবানো যায়, প্রয়োজন হলেই খুলে ফেলা যায়, যার নিজস্ব কোনো অনড় অচল মহিমা নেই, বা ভবিষ্যতে হবারও সম্ভাবনা নেই।

আজ পর্যন্ত এটিই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে উপাসনাব আসনরূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

এ ছাড়া নবগঠিত যুবগোষ্ঠী যে বিষয়টির উপব বিশেষ জোর দিলেন তা হল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্মসূচীকে একটি পরিপূর্ণ ইতি-বাচক ভিত্তির উপব প্রতিষ্ঠিত করবার আবশ্যকতা।

তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন ব্রাহ্মসমাজের অধ্যাত্মপ্রত্যয় ও নীতি-দর্শনেব মধ্যে বিধির চেয়ে নিষেধেবই যেন প্রাবল্য। একজন ব্রাহ্মের ধর্মবিশ্বাসেব লক্ষণ কি কি—এই প্রশ্নের উত্তরে সেকালে প্রথমেই শোনা যেত প্রকৃত ব্রাহ্ম শাস্ত্রের অভ্রান্ততা মানেন না, প্রতিমা পূজা করেন না, জাতিভেদ স্বীকার করেন না, থিয়েটার সিনেমা দেখেন না, মদ বা সিগারেট সেবন করেন না, কোনো রকম লঘু আমোদ প্রমোদে যোগ দেন না, ইত্যাদি এক রাশি নিষেধবাক্য।

কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্ম জীবনদর্শন বলতে যে ঠিক কি বোঝায় সে বিষযে একজন সাধারণ পর্যায়ের ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ব্যক্তিরও খুব স্পষ্ট ধারণা যে ছিল তা নয়। এই সমস্যা যে কেবল সমাজের তদানীন্তন যুবগোষ্ঠীকেই ভাবিযেছিল তা নয়, প্রবীণদের মধ্যেও এই নিয়ে ভাবনা ও বিতর্কেব অন্ত ছিল না। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, হীরালাল হালদার, প্রসন্নকুমার রায়, ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বেদান্তবাগীশ, মহেশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি জ্ঞানমার্গী মনীষী তাঁদের শাস্ত্রলোচনা ও দার্শনিক চিন্তার মাধ্যমে সমাজের ধর্মতত্ত্বকে একটি ইতিবাচক রূপ দেবার প্রয়াসী হয়েছিলেন।

এই ব্যাপারে তাঁরা অবলম্বন করেছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য

দর্শনের দুটি ধারাকে। প্রাচ্য বেদান্ত ও পাশ্চাত্ত্য হেগেলীয় দর্শনের (এর মধ্যে ব্রিটিশ নব-হেগেলীয় তত্ত্ববিদ্যাও ধর্তব্য) এক সমন্বয়ের উপব ব্রাহ্ম সমাজের অধ্যাত্মদর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল এঁদের উদ্দেশ্য। সীতানাথ তত্ত্বভূষণ এ-ক্ষেত্রে বেদান্তের নানা শাখাব মধ্যে দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্তকেই অবলম্বন কবেছিলেন। তাঁর **The philosophy of Brahmoism,** ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা, **'Vedanta and its Relation to Modern Thought,'** উপনিষদ ও ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য প্রভৃতির মধ্য দিয়ে এই তত্ত্বই তিনি তুলে ধবেছেন। এই প্রসঙ্গে হীবালাল হালদাবেব **'Neo-Hegelianism,' Hegelianism and Human Personality, Two Essayson Theology and Ethics** প্রভৃতি গ্রন্থগুলিও যথেষ্ট আলোকপাত কবে। কিন্তু সমাজেব একাংশ স্পষ্টত এই প্রচেষ্টাব বিরোধী ছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেব মুখপত্র 'তত্ত্বকৌমুদী'ব সমসাময়িক পৃষ্ঠা ছিল এ বিষয়ে নিযত বাদ-প্রতিবাদে মুখব। 'অদ্বৈতবাদ' ও 'দ্বৈতবাদ' 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদ' নিযে সেখানে প্রায় প্রতি সংখ্যায চুলচেবা বিচার-বিশ্লেষণ চলছে দেখা যায। দার্শনিক গোষ্ঠীব বিবোধীবা ব্রাহ্মধর্মকে কোনো নির্দিষ্ট তত্ত্বসিদ্ধান্তের নিগড়ে বেঁধে দেবাব পক্ষপাতী ছিলেন না। সুকুমাব রায, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ প্রমুখ প্রতিভাবান যুবকবৃন্দ ঠিক প্রত্যক্ষভাবে এই তাত্ত্বিক বিতর্কে নিজেদেব জড়িয়ে ফেলেননি। তাঁদেব প্রথম আপত্তি তাঁবা জ্ঞাপন কবেন 'ছাত্রসমাজ'-এর প্রচলিত নিয়মাবলীর নিষেধ বাহুল্যের বিরুদ্ধে। 'মদ্যপান করব না' 'ধূমপান করব না' 'থিয়েটাব দেখব না' ইত্যাদি সভ্যদের অবশ্যপাল্য নিয়মগুলিকে তাঁরা অতি অকিঞ্চিৎকর ও তুচ্ছ মনে করলেন। মাত্র এগুলির ভিত্তিতে যে চবিত্রনীতি গড়ে ওঠে তা যে হাস্যকররূপে অসম্পূর্ণ সে কথাও বলতে ছাড়লেন না। তাঁরা সঙ্গতভাবেই অন্বেষণ করছিলেন এক ইতিবাচক পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন। প্রবীণদের মধ্যে এ বিষয়ে যে বিচার-বিতর্ক চলছিল তা কিন্তু তাঁদের তেমনভাবে আকর্ষণ করল না। দুই দলনায়ক সুকুমার ও প্রশান্তচন্দ্র ছিলেন

বিজ্ঞান চেতনায় উদ্বুদ্ধ, ধোঁয়াটে তত্ত্ব কথায় তাঁদের বড় একটা রুচি ছিল না। কিন্তু সেজন্য অধ্যাত্মতত্ত্বেও যে তাঁদের অবিশ্বাস জন্মেছিল তা নয়। বিশেষত সুকুমার রায় ছিলেন সাধাবণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম। উৎসবানুষ্ঠানে তিনি যে নিয়মিত বেদীগ্রহণ করে উপাসনা, পাঠ বক্তৃতাদি করতেন তার বহু উল্লেখ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'তত্ত্বকৌমুদী' ও **Indian Messenger**-এর সমসাময়িক পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে রয়েছে। তাঁর অন্তর্জগৎ যে একটি সহজ আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে সমৃদ্ধ ছিল এ প্রমাণও দুর্লভ নয়।

কিন্তু ধর্মসাধনায় অস্পষ্ট ভাবালুতার প্রশ্রয় দিতে তিনি বা তাঁর সহযোগীরা প্রস্তুত ছিলেন না। তত্ত্বালোচনা ও সে-সংক্রান্ত বাদ-প্রতিবাদের ভিত্তিতে সমাজের মধ্যেই তখন বিভিন্ন দল-উপদলের সৃষ্টি হয়েছে—এঁরা তর্কবিতর্ক তো করছেনই, পরস্পবকে নিন্দা, দোষারোপ করতেও বিরত থাকছেন না. এই বিতর্কে জড়িত প্রত্যেকেই প্রায় দাবী করছেন—ব্রাহ্মধর্মের স্বরূপ সম্পর্কে তিনিই প্রকৃত বেত্তা। এই পরিস্থিতি নিয়েই সুকুমাব নির্দোষ কৌতুক কবেছেন।

'চলচিত্ত-চঞ্চরি', 'ভাবুক-সভা' প্রভৃতি রস রচনায়। 'খণ্ড সিদ্ধান্ত' 'অখণ্ড সিদ্ধান্ত' ও 'খণ্ডাখণ্ড সিদ্ধান্ত' নিয়ে রেষারেষি যে তদানীন্তন সমাজের প্রবীণ মহলের-দ্বৈতবাদ', অদ্বৈতবাদ' ও 'দ্বৈতাদ্বৈত' সংক্রান্ত ঝগড়ার প্রতি ছদ্ম কটাক্ষ তা বুঝতে কষ্ট হয় না। প্রকৃত-পক্ষে যুবকবৃন্দ যে অভাব ও অতৃপ্তিবোধ করছিলেন তার কারণ ছিল একটিই, কোনো ইতিবাচক পরিপূর্ণ জীবনবোধ তদানীন্তন ব্রাহ্ম সমাজেব ভাবাদর্শে বা কর্মকাণ্ডে তাঁবা খুঁজে পাননি।

এই পরিপূর্ণতার রূপ তাঁরা দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। তাই তাঁদের দৃঢ় সংকল্প হল বিশেষ সম্মানিত সদস্যরূপে কবিকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

সুকুমার রায়, প্রশান্ত মহলানবিশ ও তাঁদের বন্ধুবর্গের এই প্রচেষ্টার বিষয় আলোচনা করবার সময় এর পরিপ্রেক্ষিতটি মনে রাখা প্রয়োজন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে এবং বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দুই শতকে রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট সক্রিয়ভাবে ব্রাহ্মসমাজের কাজে জড়িত হয়েছিলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজ তখনো জবন্মৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয়নি।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক পদ গ্রহণ করেন, ও তারপর দীর্ঘকাল (২৫/২৬ বছর) এই পদে অধিষ্ঠিত থেকেছেন--কখনো এককভাবে, কখনো বা রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুব, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির সঙ্গে যুগ্ম সম্পাদক রূপে।

তা ছাড়া তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজে আচার্যসভাব সদস্য ছিলেন, এক সময়ে এব মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদনাব ভারও গ্রহণ করেছিলেন। ছেদ পড়ে বিংশ শতাব্দীব দ্বিতীয় দশকে তাঁর পশ্চিম যাত্রায়।

প্রত্যাবর্তনের পরেও আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে বেশ কয়েক বছব তাঁর সম্পর্ক ছিল প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ। পরে শান্তিনিকেতন আশ্রমেব কাজ এবং উত্তরকালে বিশ্বভারতীর ক্রমবর্ধমান দায়িত্বভাব তাঁকে ক্রমশ তাঁর নিজস্ব পথে আকর্ষণ করে।

কলকাতা-কেন্দ্রিক ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের সঙ্গে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। ততদিনে একে একে তাঁর প্রতিভাশালী অগ্রজগণও প্রয়াত হযেছেন, আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রাণশক্তিও নিঃশেষিত। উত্তর পর্বে তাই ঠাকুর পরিবারের টাকার তোড়ার সঙ্গে বাঁধা নামমাত্র সার কলকাতার আদি ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে তাঁর কোনো উৎসাহও ছিল না। কিন্তু আমাদের আলোচ্য পর্বে তাঁর মনন ও সাহিত্যকর্মের পিছনে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে এই সক্রিয় সংযোগের প্রভাব উপেক্ষণীয় নয়।

এই পর্বের কাব্যে, 'ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা' (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বৈশাখ ১৮৩৩ শক), 'আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদী' (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, চৈত্র, ১৮৩৩ শক), 'আত্মপরিচয়' (তত্ত্বাবোধিনী পত্রিকা,

বৈশাখ ১৮৩৪ শক), 'হিন্দু ব্রাহ্ম' (তত্ত্বাবোধিনী পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৮৩৪ শক) প্রভৃতি নিবন্ধগুলি এবং 'গোরা' উপন্যাসে (১৩১৬) এর পরিচয় আছে। (ডেভিড কফ ব্রাহ্ম আন্দোলন ও ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে কিছুদিন পূর্বে যে গ্রন্থখানি প্রকাশ করেছেন তাতে নানা ত্রুটি আছে, তা সত্ত্বেও ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাকে আধুনিক লেখকগণের মধ্যে সম্ভবত তিনিই প্রথম যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়েছেন, দ্রষ্টব্য ঃ

D. Kopf—The Brahmo Samaj and the Shaping of the Modern Indian Mind 1979, pp. 287-310.

১৯১২-১৩ সালে রবীন্দ্রনাথের কবি হিসাবে বিশ্বখ্যাতি অর্জন ব্রাহ্মসমাজে আনন্দ ও গর্বের ঢেউ তুলেছিল। তার কিছু কিছু নিদর্শন ব্রাহ্মসমাজের পত্র-পত্রিকাতে পাওয়া যাবে, যেমন ঃ

"রবীন্দ্রনাথের আদর : ভক্ত কবি রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদেশে সাহিত্য-জগতে বহু দিনাবধি পরিচিত ;—তাঁহার ভাষা ওজস্বিনী ও উদ্দীপনাপূর্ণ ; তাঁর যেমন কবিত্বশক্তি তেমনই গদ্যসাহিত্য লেখার অদ্ভূত ক্ষমতা। তাঁহার সংগীতাবলী সকল সমাজের আদৃত।

তাঁহাব ধর্মসংগীত নীরস প্রাণেও ধর্মভাব জাগ্রত করে, তাঁহার জাতীয় সংগীত মৃতপ্রাণও স্বদেশ প্রেমে মাতাইয়া তোলে। ইদানীং রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত ভক্ত বলিয়াই পরিচিত হইতেছিলেন। সম্প্রতি তিনি ইংলণ্ড আমেরিকা গমন করিয়া বহু আদর প্রাপ্ত হইতেছেন। তিনি কয়েকটি সংগীত ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়া 'গীতাঞ্জলি' নামে প্রকাশ করিয়াছেন।

ঐ সংগীতগুলির উচ্চ ধর্মভাব, উদ্দীপনাপূর্ণ ভাষা দেখিয়া ইংলণ্ড আমেরিকার মনীষিগণ মোহিত হইয়াছে। তাঁহারা যদি বাঙলা ভাষা জানিতেন তবে তাঁহার সঙ্গীত, কবিতা, সাহিত্যপুস্তক ও গল্পসমূহ পাঠ করিয়া বিহ্বল হইতেন। রবীন্দ্রনাথ কবি, রবীন্দ্রনাথ ভক্ত, তাঁহার গৌরবে ভারতের গৌরব, ব্রাহ্মসমাজের গৌরব" (তত্ত্ব-কৌমুদী ১ আষাঢ়, ১৩২০/১৯১৩, পৃঃ ৬০)। উত্তরকালের আর

একটি প্রতিবেদন ; "প্রত্যাগমন—জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ পর্যটন করিয়া শ্রীযুক্ত ডাঃ সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অল্পদিন হইল প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তিনি যেখানে গিয়াছেন সেখানেই এদেশের আদর্শ প্রচার করিয়াছেন ; সর্বদেশে তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন। তাঁহার দ্বারা ব্রাহ্ম-সমাজের ও ভারতের গৌরব বর্ধিত হউক" (তত্ত্বকৌমুদী ১৬ চৈত্র, ১৩২৩/১৯১৬ পৃঃ ২৮৬)। শুধু তাই নয়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে কবিকে বিশেষভাবে সংবর্ধনাও জ্ঞাপন করা হয় এই সময়। এ সম্পর্কে তত্ত্বকৌমুদীর প্রতিবেদন : "অভ্যর্থনা—সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ বিগত ১লা শ্রাবণ শ্রীযুক্ত ডাক্তার স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভ্যর্থনার আয়োজন করেন। তদুপলক্ষে রামমোহন লাইব্রেরী গৃহ নরনারীতে পূর্ণ হইয়াছিল।

একটি সংগীতের পর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস প্রার্থনা করেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ ও ডাক্তার ব্রজেন্দ্র নাথ শীল অভ্যর্থনাসূচক বক্তৃতা করিলে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাপান ও আমেরিকার অভিজ্ঞতা ও নিজ জীবনের সুখ দুঃখের অনেক কাহিনী বর্ণনা করেন।

শ্রীমান সুকুমার রায়চৌধুরী কর্তৃক ধন্যবাদ প্রদত্ত হইলে সভাভঙ্গ হয়" (তত্ত্বকৌমুদী ১৬ শ্রাবণ ১৩২৪/১ আগস্ট ১৯১৭, পৃঃ ৯৫)। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সংশ্রবের এবং তার প্রতি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এই মনোভাবের পরপ্রেক্ষিতে শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানের যুবগোষ্ঠী যে রবীন্দ্রনাথকে তাঁদের মধ্যে সম্মানিত সদস্যরূপে পেতে উদ্যোগী হবেন তা খুবই স্বাভাবিক। এই প্রচেষ্টার পথে যে কোনো বাধা উপস্থিত হতে পারে তা সম্ভবত প্রথমে তাঁদের কল্পনাতে আসেনি।

কিন্তু বাধা এসেছিল প্রবল ভাবেই। যুবকদের কাছে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন পরিপূর্ণ জীবনবোধের প্রতীক। এই পরিপূর্ণতার আদর্শ

বলতে তাঁরা কি বুঝতেন তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় সুকুমার রায়ের দুটি রচনায। এব প্রথমটি ইংলণ্ডে রচিত তাঁব ইংবেজী রবীন্দ্রভাষ্য The Spirit of Rabindranath (পুনর্মুদ্রিত সুকুমার রায়ের প্রবন্ধ সংগ্রহ 'বর্ণমালাতত্ত্ব ও বিবিধপ্রবন্ধ', সিগনেট প্রেস, কলিকাতা ১৩৬৩, পৃঃ ৯৩-১০৯); দ্বিতীয়টি ৯ এপ্রিল ১৯১৭ তারিখে ব্রাহ্ম যুবমণ্ডলীর উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত উপাসনাব আচার্যরূপে প্রদত্ত তাঁর উপদেশ 'যুবকেব জগৎ' (মুদ্রিত 'তত্ত্বকৌমুদী, ১৬ বৈশাখ, ১৩২৪ ২৯ এপ্রিল, ১৯১৭ পৃঃ ১৯-২১)। ইংরেজি রচনাটিতে সুকুমার শুরু করেছেন মানবাস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত সেই চিবন্তন প্রশ্ন দিয়ে—অস্তিত্বের অর্থ কি ?

সমকালীন বিশ্বপরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্নটিকে স্থাপন করেছেন তিনি এই বলে যে আধুনিক যুগে বিশ্বের মানুষ পরস্পরের খুব কাছে এসে পড়েছে—দেশকালের গণ্ডী তাকে আর আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যে আবদ্ধ রাখতে পারছে না—মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত সমস্যা বা স্থানীয় সমস্যা সর্বমানবেব সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

(The commerce of ideas, no less than the commerce of wealth and industry, is fast weaving the many-coloured threads of human endeavour into one organic whole. Problems of state and politics, problems of society and of religions, are rapidly becoming the common problems of humanity itself.)

এই অখণ্ড মানববিকতাবোধের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে রবীন্দ্রকাব্যে (…seldom, in the self-expression of an individual life, has this ideal of a world-wide rapproachment been sung with such never ending freshness and perfection of harmony as in the poetry and writings of Rabindranath Tagore. The inner growth of the poet's ideal, as clearly reflected in the evolution of his poetry, is so typical of the fundamental laws of thought and of realisation through conflict, that it may almost be taken as a summarised history of the world-wide thought adjustment through which we are passing at the present moment)।

এই প্রসঙ্গে সুকুমার খুব সঙ্গতভাবেই রবীন্দ্রনাথকে ভারতীয় (হিন্দু) ঔপনিষদ আধ্যাত্মিক ধারার সার্থক উত্তরাধিকারী ও ব্যাখ্যাতারূপে চিত্রিত করেছেন। সৃষ্টির মূলে এক অখণ্ড যে চৈতন্যের বোধ হিন্দু চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য তা রূপ পেয়েছে অদ্বৈত, দ্বৈত বেদান্তের দুই শাখার মধ্যে।

আত্মার স্বরূপকে জানাই হল এখানে চরম লক্ষ্য। এই মৌল জিজ্ঞাসাকে বাদ দিয়ে বা দূরে সরিয়ে রেখে আমরা যদি জীবনের সমস্যাবলীর সমাধান খুঁজি সে-ক্ষেত্রে সমাজ কল্যাণ বা মানব প্রগতির যে কর্মকাণ্ডই আমরা অবলম্বন করি না কেন শেষ পর্যন্ত আমাদের চিরন্তন প্রশ্নের কোনো মীমাংসা মেলে না।

(And deep down at the bottom of all such queries we find the haunting shadow of the questions we have always tried to suppress: Who am I? What is this life? What is the purpose of my existence?)।

নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদী এ প্রশ্নের মীমাংসা করেন নিবৃত্তিমূলক জ্ঞানমার্গের মাধ্যমে মায়িক জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করে; অপর পক্ষে দ্বৈতবাদী এই সৃষ্টিকে ও ব্যক্তিজীবনকে দেখেন লীলাময় ঈশ্বরের বিচিত্র ইচ্ছার প্রকাশরূপে—বৈষ্ণব প্রেমধর্মের মধ্যে যে দৃষ্টিভঙ্গীর বিশিষ্ট প্রকাশ।

প্রকৃতপক্ষে এই দুই মার্গের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা তাঁর সাহিত্যে এই জ্ঞান ও প্রেমভক্তি মার্গদ্বয়ের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছে।

(Such are the twin streams of love and knowledge that have been so exquisitely harmonised and have found such perfect expression in the genius of Rabindranath Tagore)।

রবীন্দ্রনাথ বৈদান্তিক জ্ঞানমার্গ ও বৈষ্ণব ভক্তিমার্গ দুই-এর দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছেন, কিন্তু অন্ধভাবে কোনোটিরই অনুসরণ করেননি। এই সূত্রে লেখক রবীন্দ্রমানসে তাঁর পিতার গুরুকর

প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন—এবং রামমোহন-বিদ্যাসাগর সৃষ্ট সুস্থ প্রাণবান ঐতিহ্যধারাকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ যে বঙ্গ সাহিত্যপ্রাঙ্গণ থেকে মরমীয়তার নামে প্রচলিত সস্তা ভাবালুতাকে দূর করেছেন তাও জোর দিয়ে বলেছেন। সুকুমারের এই রচনাটি উল্লেখযোগ্য মাত্র রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন প্রচেষ্টা হিসেবেই নয়।

লেখকের জীবনদৃষ্টির উপরও রচনাটি যথেষ্ট আলোকপাত করে। দেখা যাচ্ছে তাঁর প্রজন্মের শিক্ষিত সচেতন যুবকদের মত সমাজ-কল্যাণ বা মানব প্রগতির কর্মসূচী তাঁকে আকর্ষণ করেছে ঠিকই। সমাজবিচ্ছিন্ন ব্যক্তিকেন্দ্রিক 'বিশুদ্ধ' অধ্যাত্মমার্গকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। কিন্তু এখানেই তিনি থামছেন না। অস্তিত্বের সঙ্গে যে চিরন্তন প্রশ্ন অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে—আমি কে? অস্তিত্বের চরম অর্থ কি?

এর উত্তর খুঁজে পাওয়াটাই যে জীবনের চরম লক্ষ্য সে কথাটাও স্পষ্ট করে বলতে তিনি এতটুকু দ্বিধা করেননি। সেই সেই সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার নামে চলতি সস্তা রুগ্ন ভাবপ্রবণতার প্রতি প্রকাশিত তাঁর ঘৃণার মনোভাবও লক্ষণীয়।

(...morbid sentimentalism masquerades under the garb of religious devotion and a tawdry diffusiveness of thought poses as spiritual mysticism.)

প্রধানত এই শ্রেণীর ধোঁয়াটে, তরল ভাবোচ্ছ্বাসের প্রতিই কৌতুকবাণ নিক্ষেপ করেছিলেন সুকুমার তাঁর 'ভাবুকসভা' নামক ক্ষুদ্র প্রহসন-নাটিকায়। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে জ্ঞান ও উক্তির এক ও বহুর যে সামঞ্জস্য সুকুমার লক্ষ্য করেছিলেন তাঁর 'যুবকের জগৎ' শীর্ষক ভাষণটি সেই ভাবনাতেই অনুপ্রাণিত: "বিশ্বজীবনে শাশ্বত এক আছেন, শাশ্বত বৈচিত্র্যও আছে। কেবল ঐক্যই জগতের নিয়ম নয়, জীবন ব্যাপারের মধ্যে বৈচিত্র্যের নিয়ম আরও স্পষ্ট, আরও উজ্জ্বল। বৈচিত্র্য সর্বত্রই সাধনের বৈচিত্র্য, প্রকাশের বৈচিত্র্য, চিন্তার বৈচিত্র্য, অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য। বিচিত্রকর্মা ভগবানের বিচিত্র বিধাতৃত্ব বিচিত্র

জীবনকে আশ্রয় করিয়াই পরিপূর্ণ বৈচিত্র্যের মধ্যে আপনাকে ব্যক্ত করিতেছে।" অন্যত্র: "প্রত্যেকটি জীবন জগতের এক একটি স্বতন্ত্র নূতন সমস্যা ; জীবনবিধাতা জীবনের অব্যাহত আনন্দের মধ্যে আপনি অন্বেষণ করিতেছেন ; আপনার বিশ্বরূপকে জীবনের বৈচিত্র্যের মধ্যে তাহার নিত্যনূতন সমাধান করিতেছেন। বিশ্বশক্তি প্রতি জীবনের মধ্যে চৈতন্যরূপে জাগ্রত থাকিয়া আপনাকে আপনি খণ্ডিত করিয়া দেখিতেছেন। ইহার মধ্যে একটি জীবনও ব্যর্থ নয়, খণ্ডিত নয়। বিশ্ববিধানের মধ্যে প্রত্যেক জীবনের স্বতন্ত্র স্থান আছে।" এই পূর্ণতার আদর্শ ব্রাহ্মসমাজের প্রচলিত সংকীর্ণ নৈতিক বিশুদ্ধির আদর্শের চেয়ে ব্যাপকতর: "অপরাহত বিশ্বশক্তি আমার মধ্যে মূর্তি গ্রহণ করিয়াছে, প্রতি জীবনের মধ্যে নিয়ন্তারূপে জাগ্রত রহিয়াছে।...শুধু ধর্মসমাজে নয়, শুধু উপাসনাশীল সাধু জীবনে নয় সর্বত্র সে জয়যুক্ত। আমার জীবনে—শুধু ভবিষ্যৎ জীবনে নয়, কেবল সেই কল্পিত সর্বপাপমোহমুক্ত জীবনে নয়, এই আমার বর্তমান জীবনের প্রতি মুহূর্তেই সে পরিপূর্ণ-রূপে জয়যুক্ত।...ভগবানের অকাট্য ইচ্ছা পাপের কাছেও পরাজিত নয়। মানুষের জীবনের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া যে ভগবান আমার পাপের বোঝাও সেই ভগবানই অপরাজিত প্রসন্নতার সহিত বহন করিতেছেন।" সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তদানীন্তন নেতৃবৃন্দের "কল্পিত সর্বপাপমোহমুক্ত" জীবনাদর্শ সমাজের যুবগোষ্ঠীর কাছে সংকীর্ণ নেতিবাচক মনে হয়েছিল, সুখদুঃখ পাপপুণ্য বিজড়িত সমগ্র মানব-জীবনের সর্বত্র সৃষ্টিকর্তার লীলা প্রকাশিত হয়েছে—রবীন্দ্রনাথের এই বাণীর মধ্যে তাঁরা এক ইতিবাচক পূর্ণতর জীবনবোধের আভাস পেয়েছিলেন। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথকে সমাজের সম্মানিত সদস্য রূপে বরণ করতে তাঁরা এত আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

স্মরণ রাখতে হবে এই সময় অর্থাৎ বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ব্রাহ্মধর্মের স্বরূপ নিয়ে একটি বিতর্ক চলছে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এতে জড়িত হয়ে পড়েছেন (দ্রষ্টব্য তাঁর প্রবন্ধত্রয় 'ব্রাহ্ম সমাজের সার্থকতা'—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ

১৮৩৩ শক ; 'আত্মপরিচয়' তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ ১৮৩৪ শক), 'হিন্দু ব্রাহ্ম'-তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা জ্যৈষ্ঠ ১৮৩৪ শক)। রবীন্দ্রনাথের বলবার ছিল—ব্রাহ্মধর্ম—ধর্ম হিসাবে নিশ্চয় হিন্দুধর্ম থেকে স্বতন্ত্র কেননা হিন্দুধর্মবিশ্বাসের কতগুলি মূল নীতিকেই তা অস্বীকার ও বর্জন করেছে। কিন্তু হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজের এক আভ্যন্তরীণ এবং স্বাভাবিক বিকাশরূপেই ব্রাহ্মধর্মের আবির্ভাব।

মুক্ত এবং সার্বভৌমিক দৃষ্টি সত্ত্বেও হিন্দুসমাজাগত কোনো ব্রাহ্ম জাতিগত ভাবে হিন্দুই থাকেন যেমন হিন্দুসমাজ থেকে ধর্মান্তরিত কোনো খ্রীষ্টান হিন্দু খ্রীষ্টান থাকেন বা কোনো মুসলমান হিন্দু মুসলমান থাকেন। এখানে কবি হিন্দুর যে সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন শব্দটির প্রচলিত অর্থ থেকে তা কিঞ্চিৎ ভিন্ন এবং ব্যাপকতর। এই সিদ্ধান্তটি নিয়ে ব্রাহ্মসমাজের পত্র-পত্রিকায় বাদ-প্রতিবাদ শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথের 'আত্মপবিচয়' সমালোচিত হয়েছিল ১৬ চৈত্র ১৩২০/ ২৮ মার্চ ১৯১২ সংখ্যা 'তত্ত্বকৌমুদী'তে (পৃঃ ২৭৮-৭৯)। সে রচনাটির প্রতিপাদ্য ছিল, ব্রাহ্মসমাজ বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস, বর্ণাশ্রমে বিশ্বাস এবং ব্রাহ্মণ প্রাধান্যে বিশ্বাস হিন্দুধর্মের এই তিনটি দোষাবহ লক্ষণ বর্জন করেছেন, তাই ব্রাহ্মগণকে হিন্দু বলা যেতে পারে না। 'তত্ত্ববোধনী পত্রিকা'র পৃষ্ঠায় বিতর্কটি অনেকদূর গড়িয়ে ছিল। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত হয়েও অজিতকুমার চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী সমর্থন করলেন, বিতর্কে যোগ দিলেন সুকুমার রায়, অনামা পত্রলেখক ও গুরুচরণ মহলানবিশ (দ্রষ্টব্য, অজিতকুমার চক্রবর্তী 'ব্রাহ্মসমাজের সমস্যা'—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৮৩৬ শক, পৃঃ ৪০-৪২ ; "ব্রাহ্ম ও হিন্দু" ঐ, আষাঢ় ১৮৩৬ শক, পৃঃ ৪৫-৫০ ; সমর্থনে স্বাক্ষরহীন পত্র, ঐ, শ্রাবণ ১৮৩৬ শক, পৃঃ ৮১ ; অজিতকুমার চক্রবর্তী 'পত্রোত্তর' ঐ, পৃঃ ৮২-৮৪ ; 'সুকুমার রায় চৌধুরী 'ব্রাহ্ম ও হিন্দু' প্রবন্ধের প্রতিবাদ'-ঐ ভাদ্র ১৮৩৬ শক, পৃঃ ৯৭-৯৮ ; অজিত-কুমার চক্রবর্তী, ঐ, পৃঃ৯৯-১০২ ; 'ধর্ম সমন্বয় সম্বন্ধে পত্র' ঐ, আশ্বিন-কার্তিক ১৮৩৬ শক, পৃঃ ১০৭-১০ ; 'সুকুমার রায় চৌধুরী 'ব্রাহ্ম হিন্দু

সমস্যা-প্রতিবাদ', ঐ পৃঃ ১১৮-২১ ; অজিতকুমার চক্রবর্তী 'ব্রাহ্ম হিন্দু সমস্যা-প্রতিবাদের উত্তর ঐ পৃঃ ১২২-২৬ : গুরুচরণ মহলানবিশ 'প্রতিবাদ-পত্র' ঐ, অগ্রহায়ণ ১৮৩৬ শক পৃঃ ১৪৩-৪৯ ; অজিতকুমার চক্রবর্তী 'প্রতিবাদ সম্বন্ধে বক্তব্য, ঐ পৃঃ ১৪৯-৫০ ; 'ব্রাহ্ম হিন্দু সমস্যা', ঐ পৌষ ১৮৩৬ শক, পৃঃ ১৬১-৬৪)। একদিকে যেমন রবীন্দ্রনাথের মতবাদকে কেন্দ্র করে আদি ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ব্রাহ্মগণকে কোনো অর্থে হিন্দু বলা যায় কি না এ বিষয়ে বাদানুবাদ চলছিল—তেমনি আদি ব্রাহ্মসমাজের অভ্যন্তরেও রবীন্দ্রনাথ সমালোচিত হলেন। শরৎচন্দ্র ঘোষ নামক এক ব্যক্তি এক পত্রে এই বলে অভিযোগ করেন, আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক রূপে কবির ব্যবস্থায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রবীণ নেতা ও আচার্য কৃষ্ণকুমাব মিত্র আদি ব্রাহ্ম সমাজের বেদীগ্রহণ করে উপাসনা করেছেন। একজন অব্রাহ্মণ আচার্যের কাজ করায় আদি ব্রাহ্মসমাজের চিরাচরিত নীতি আচার্যমাত্রেই ব্রাহ্মণ হবেন—ভঙ্গ হয়েছে। পত্রলেখক রবীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করেছেন, "ব্রাহ্মণ আচার্য যখন দুষ্প্রাপ্য নহে তখন, অব্রাহ্মণকে বেদীতে বসাইয়া হিন্দুসমাজের অশ্রদ্ধাভাজন হইবার আবশ্যক কি ?" এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে পরামর্শ দিয়েছেন, "আদি ব্রাহ্মসমাজের যোগরক্ষা আপনার পক্ষে অসুবিধাজনক বোধ হইলে আপনি প্রকাশ্য ভাবে সাধারণ সমাজে মিলিত হউন, আদি ব্রাহ্মসমাজের ভাবকে পরিবর্তন করিবার আপনার অধিকার নাই।" এই পত্রের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লেখেন এক প্রতিবাদ (শরৎচন্দ্র ঘোষের পত্র ও তদুত্তরে রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ-প্রবন্ধ 'আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদী'র জন্য দ্রষ্টব্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৮৩৩ শক পৃঃ ২৬৩-৬৪ ২৮৫-৮৮)। কবির চূড়ান্ত জবাব এই : "এই আদি ব্রাহ্মসমাজের ভাবকে পরিবর্তন করিবার অধিকার আমার নাই ? নিশ্চয়ই নাই। কিন্তু এই ভাবকে পরিণত করিয়া তুলিবার আমার সম্পূর্ণই আছে।

ভাবের পূর্ণ বিকাশ এক মুহূর্তেই হয় না। তাই বলিতেছি কোন মতে ব্রাহ্মণকে বেদীতে বসাইয়া দিলেই অদ্যকার হিন্দুসমাজ

যদি আমাকে শ্রদ্ধা করে তবে সেই শ্রদ্ধা গ্রহণ করিয়া মানবসমাজের চিরকালীন সত্যধর্মকে অশ্রদ্ধা করিতে পারিব না।” দেখা যাচ্ছে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও আদি ব্রাহ্মসমাজ দু'তরফের গোঁড়া সমর্থকগণের কাছে রবীন্দ্রনাথেব মতামত গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হচ্ছে না।

হিন্দু-ব্রাহ্ম বিতর্কে সুকুমারও যোগ দিয়েছিলেন—কিন্তু সমস্যাটিকে তিনি দেখেছিলেন একটু স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে। ব্রাহ্ম সমাজ হিন্দু কি অহিন্দু এ প্রশ্নটিকে তিনি খুব গুরুত্ব দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। উপনিষদ্ বেদান্তের চিন্তাধারা বৈষ্ণব প্রেমভক্তিবাদ প্রভৃতির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার পবিচয় পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথ সংক্রান্ত আলোচনায়।

ভারতীয় হিন্দু চিন্তাব বিশিষ্ট ও বিচিত্র ধারাগুলি রবীন্দ্রকাব্যে কি ভাবে সমন্বিত হয়ে রসরূপ পেয়েছে সে কথা প্রমাণসহকারে সেখানে তিনি জোর দিয়ে বলেছেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের অবাধ গতিশীলতার সঙ্গে হিন্দুত্বের স্থিতিশীলতা জুড়ে দিলেই যে একটি সুসমঞ্জস চলার ছন্দ পাওয়া যাবে এ বিষয়ে তাঁর সন্দেহ ছিল: “হিন্দু নামে আমার কিছু মাত্র আপত্তি নাই কিন্তু নামটা ব্যাপক বলিযা ইহাই যে আমার ‘বড়’ পরিচয় আর ‘ব্রাহ্ম’ নামের বিশিষ্টতা সে পরিচয়টাকেও ছোট করিয়া ফেলে এমন মনে করিবার হেতু কি? হইতে পারে যে ঐতিহাসিক হিসাবে ‘হিন্দু’ নামটার একটা বিশেষ দাবী দেখা যায়। দাবী থাকে তো ভালই সে থাকুক না। এ দাবীকে স্বীকার করা না করাকে জাতীয়তার পরিমাপক মনে করিতে যাই কেন?”

তবে ব্রাহ্মসমাজের সমস্যামোচনে কোন পন্থা অবলম্বনীয়? সুকুমারের ভাষায়: “ব্রাহ্মসমাজ এককালে যাহাই থাকুক আজ সে অতিরিক্ত মাত্রায় গতিশীল নহে, স্থিতিশীলতার ব্যাধি তাহার হাড়ে হাড়ে। কোথা হইতে প্রাণের বেগ আসিয়া এ দৈন্যকে ঘুচাইবে তাহা নির্দেশ করা আমার সাধ্যাতীত। ব্যক্তিগত ভাবে নিজজীবনে ইহার উত্তর অন্বেষণ করা ছাড়া যথার্থ কার্যকরী আর কোন মীমাংসার কথা আমি জানি না।” অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন নূতন প্রাণ-

শক্তির যা দুর্বার গতিতে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত করে সেখানে নূতন গতিবেগ সঞ্চারিত করবার জন্য এই কারণেই তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে এই নূতন আন্দোলন পরিচালনার ভার ন্যস্ত দেখি প্রধানত দু'জনের উপরে, সুকুমার রায় ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। প্রথমে এঁরা কার্য-নির্বাহক সভায় রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিত সভ্য করবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন।

যুবগোষ্ঠী কিন্তু দমলেন না। তাঁরা সমাজের বার্ষিক সাধারণ সভায় এক প্রস্তাবের বিজ্ঞপ্তি দিলেন যে বার্ষিক সভা যেন কার্য নির্বাহক সমিতিকে নির্দেশ দেন সভ্যপদের জন্য রবীন্দ্রনাথের নাম সুপারিশ করেন। প্রতিবাদের ঝড় উঠল। ১ মাঘ ১৩২৪ ১৪ জানুয়ারী ১৯১৭ সংখ্যা 'তত্ত্বকৌমুদী'তে প্রকাশিত হল দু'খানি পত্র —লেখকদ্বয় যথাক্রমে অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (পৃঃ ২২৩-২৪) এবং ললিতমোহন দাস (পৃঃ ২২৪-২৭)। অবিনাশচন্দ্রের প্রধান বক্তব্য যত বড়ই হোক না কেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মৌলিক মতভেদ আছে।

শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন আজ যদি বুদ্ধ স্বর্গ থেকে নেমে আসেন, পুণ্যাত্মা যীশু 'শোণিত স্রোত প্রবাহিত দেহে কণ্টকমুকুট শিরে' যদি ব্রাহ্মসমাজের দরজায় এসে দাঁড়ান, মহাশক্তিধর মহম্মদ যদি উপস্থিত হন, যদি সেই 'মত্তমাতঙ্গ শ্রীগৌরাঙ্গ'ও আসেন, আমরা ভক্তিভরে এঁদের প্রণাম করব, কিন্তু এঁদের সমাজের সভ্য করা? নৈব নৈব চ! "কেহ হয়ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন—তবে কি ব্রাহ্মসমাজ এতই উচ্চ? ইহা কি বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ ও চৈতন্য হইতেও উচ্চতর? নিশ্চয়ই উচ্চতর।

সত্য যে উহার সাধক অপেক্ষা উচ্চতর তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সত্যের গৌরবেই সাধকের গৌরব, সাধকের গৌরবে কখনও সত্যের গৌরব নহে।" এই একরাশ বিভ্রান্তিকর analogy দেবার সময় তাঁর মনে পড়ল না সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হবার পর দু'বছর

পরেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে এবং রবীন্দ্রনাথের নাম প্রস্তাবিত হবার অল্প কিছুদিন পূর্বে মহারাষ্ট্রের সুপ্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ প্রার্থনা সমাজের নেতা রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মানিত সদস্য নির্বাচিত করা হয়েছিল। ললিতমোহন কিন্তু তাঁর আপত্তি নিছক নিয়মতান্ত্রিক প্রশ্নের মধ্যেই সীমিত রাখলেন।

তিনি বলতে চাইলেন কার্য-নির্বাহক সমিতি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবার বার্ষিক সভায় সমবেত সাধারণ সদস্যদের দ্বারা নির্দেশ পাঠিয়ে সমিতিকে নিজের মতের বিরুদ্ধে প্রস্তাব নিতে বাধ্য করলে সমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে এক অবাঞ্ছিত নজিরের সৃষ্টি হবে। তা ছাড়া সমাজের সংবিধানে সম্মানিত সদস্য গ্রহণ করবার যে নিয়ম আছে তা অত্যন্ত অস্পষ্ট—তাতে সম্মানিত সদস্যের যোগ্যতা কি, অধিকার ও দায়িত্বই বা কি—তা স্পষ্ট করে বলা নেই। তিনি স্বীকার করলেন কিছুদিন আগে তিনি বিশেষ না ভেবেচিন্তে রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরকে সম্মানিত সদস্য করবার পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন – কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বেলা সে ভুল করতে চান না, যদিও কবির প্রতি তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধা আছে। কার্য-নির্বাহক সমিতির প্রত্যাখ্যান ও এঁদের মনোভাব দেখে সুকুমার ও প্রশান্তচন্দ্র তখনকার মত নিরস্ত হলেন এবং বার্ষিক সভায় সুকুমার তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিলেন (**Annual Report of the Sadharan Brahmo samaj for 1917, p. 68**)। কিন্তু এই সাময়িক পশ্চাদপসরণ ছিল তাঁদের রণকৌশলেরই এক অঙ্গ।

এবার যুবকগণ কাজে নামলেন খুবই আটঘাট বেঁধে। সুপকল্পিত ভাবে জমি তৈরী করা হল। প্রবীণদের মধ্যে যাঁরা রবীন্দ্রানুরাগী যেমন বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সাংবাদিক প্রধান রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ডঃ নীলরতন সরকার, ডঃ ব্রজেন্দ্র নাথ শীল, আচার্যদের মধ্যে উদীয়মান সুপণ্ডিত ও বিদগ্ধ সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী—সকলের সঙ্গেই আলোচনা করলেন তাঁরা এবং এঁদের সহানুভূতি ও সমর্থনও পেলেন।

সুকুমার এই সময়কার এক ভাষণে খোলাখুলি ভাবেই ঘোষণা করলেন ব্রাহ্মসমাজের এই মুহূর্তে প্রয়োজন এক পরিপূর্ণ জীবনবোধের যা কোনো ক্ষুদ্র সীমিত সংস্কারের দ্বারা খণ্ডিত নয়ঃ "ব্রাহ্মসমাজ এই দৃষ্টি লাভের জন্যই জগতে আসিয়াছিল, কেবল কতগুলি মূঢ় সংস্কারের প্রতিবাদের জন্য নয়, কেবল কতগুলি সাময়িক কুব্যবস্থার মোচনের জন্য নয়, জীবনের এই পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে জগতকে উজ্জ্বল করিয়া দেখিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজের ডাক পড়িয়াছিল।...সাধকমণ্ডলী চাই, উপাসক সম্প্রদায় চাই, আদর্শবহনকামী সমাজ চাই, কর্মের বিধিবিধান, অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান, এ সমস্তই চাই, কিন্তু সর্বোপরি চাই অন্ধসংস্কারমুক্ত উদারচিত্ত প্রশস্তপ্রাণ ব্যক্তিমানবকে, সত্যের জন্য অকুতোভয় সর্বত্যাগীকে, যে সত্যের জন্য এমন সংস্কার নাই এমন বন্ধন নাই যাহা ছাড়িতে পারে না। চাই বিশ্বমানবের সেই সব প্রতিনিধিকে যাহারা এই জীবনকে ক্ষুদ্র বলিয়া জানিবে না...যাহাদের জীবনপর্বে এই জগৎছবির জীবন্ত রূপ প্রকাশ লাভ করিবে ('জীবনের হিসাব' প্রবাসী চৈত্র ১৩২৩, পৃঃ ৫১২-১৯)। রচনাটির সন-তারিখ (১৯১৭) লক্ষ করলে 'বিশ্বমানবের সেইসব প্রতিনিধি' বলতে কার চিত্র তাঁর মানসপটে উদ্‌ভাসিত তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথও দিন দিন নূতন মহিমায় ভাস্বর হয়ে উঠছেন। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলাকা (১৯১৬) প্রকাশিত হয়েছে। উদ্দাম বন্ধনহীন পথচলার নেশায় মাতিয়ে দিয়েছে তরুণ চিত্তকে।

আমরা চলি সমুখপানে
কে আমাদের বাঁধবে।
রইল যারা পিছুর টানে
কাঁদবে তারা কাঁদবে।

প্রভৃতি পঙক্তি বার বার আবৃত্তি করে তারা পাগল হয়ে যাচ্ছেন। ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালা হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে কবির উপাধিত্যাগ তাঁকে দেশবাসীর চিত্তে গভীর শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ কথা স্মরণীয় এ কর্মে কবির নিকটতম বিশ্বস্ত পার্শ্বচর

ছিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ যিনি তদানীন্তন ব্রাহ্ম যুব আন্দোলনেরও এক নায়ক। কিন্তু এত সব সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথকে সভা করবার বিরুদ্ধে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃপক্ষের মনোভাবও প্রবলভাবে দানা বেঁধে উঠল। উত্তেজনা এমন চরমে গিয়ে পৌঁছাল যে সকলে আশঙ্কা করলেন ব্রাহ্মসমাজের চতুর্থ সংঘভেদ বুঝিবা উপস্থিত। সুকুমারের নেতৃত্বে সংগঠিত ব্রাহ্ম যুবগোষ্ঠী স্বতন্ত্রভাবে মাঘোৎসবানুষ্ঠান করলেন. সে উপলক্ষে সুকুমারই হলেন আশ্চর্য।

১৯১৯ থেকেই সংঘর্ষ আবার শুরু হয়। বিপক্ষে জোট বাঁধলেন সমাজের প্রবীণ কর্তৃস্থানীয়দের প্রায় সকলেই: কৃষ্ণকুমার মিত্র, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, রজনীকান্ত গুহ, বরদাকান্ত বসু, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, নবদ্বীপচন্দ্র দাস, অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকেরই নাম এ প্রসঙ্গে করা যায়। পরম শ্রদ্ধেয় প্রচারক প্রেমিক ও ভক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় প্রচারকপদ এমন কি সমাজের সভ্যপদও ত্যাগ করেছিলেন। যদিও অনুরুদ্ধ হয়ে তিনিও পরে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করেন এবং বিতর্কে আর যোগ দেননি—তবুও শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্র বিরোধী দলেই ছিলেন। এদের মনোভাব আমাদের বিস্মৃত করে, কেন না বিশ্বখ্যাতি অর্জন করে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাবর্তনের পর তাঁকে এঁরাই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ২০ নভেম্বর সমাজের কার্যনির্বাহক সভা যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন তার বয়ান এই:

"Resolved that the Executive Committee of the S. B. Samaj offer their hearty congratulations to Babu Rabindranath Tagore on the unique distinction of he has won by obtaining the Nobel Prize for his Gitanjali and other works which are a noble expression of some of the most impressive aspects of the spiritual and ethical teachings of the Brahmo Samaj.

আরো আশ্চর্য এঁদের অনেকেই রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রকৃত আপত্তি যে কি সে-সম্পর্কে মুখ খুলতে চাননি কেবল সংক্ষেপে

এটুকু বলা ছাড়া যে রবীন্দ্রনাথ সভ্য হলে, "কেহ কেহ প্রাণে গভীর ক্লেশ ও যাতনা অনুভব করিবেন।" কয়েকজন ব্যতিক্রমও ছিলেন। এক্ষেত্রে এ পর্বে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন সমাজের প্রবীণ আচার্য আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়। ১৯২০-২১ সালে দু'পক্ষেই উত্তেজনা যখন তুঙ্গ স্পর্শ করেছে—তখন ইনি 'তত্ত্বকৌমুদী'-তে দুখানি পত্র প্রকাশ করেন যথাক্রমে ১৬ মাঘ ১৩২৭ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২১ তারিখে (দ্বিতীয় সংখ্যায় বাংলা তারিখ অনুল্লিখিত)। এই দুই পত্রে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তিনি রীতিমত বিষোদগার করেছেন। তাঁর মন ছিল যেমন আশ্চর্যরকম বাধ মুক্ত, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে জ্ঞানও তাঁর ছিল তেমনি অতি অল্প।

'ইহা আমাব শ্রুত কথা' সম্ভবতঃ' 'হয়ত'—দিয়ে প্রায় প্রত্যেক বাক্য আরম্ভ! ববীন্দ্রনাথকে তিনি অশ্রদ্ধা করেন এ-কথাটা পত্রে নির্দ্বিধায় স্বীকৃত, সেই সঙ্গে দেওয়া আছে একগাদা বিভ্রান্তিকব analogy যেমন, শাক্যসিংহ, ঈশা, মহম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষও সকলেব মাননীয় হতে পারেননি, রবীন্দ্রনাথ কোন ছার! পড়ে স্তম্ভিত হতে হয় তাঁর উক্তি—রবীন্দ্রনাথকে কেন তিনি অশ্রদ্ধা করেন, তা তিনি নিজেই জানেন না—"বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির প্রতি ··কেনই যে অনুরাগ যায় না তাহার কারণ সব স্থলেই সে খুঁজিয়া পাওয়া যায়, এমন নহে।" নির্বাচকমণ্ডলীকে কবির বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা ছাড়া পত্রদুখানির আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয় না। এই দ্বিতীয় পত্রের অভিযোগ খণ্ডন করে যুবগোষ্ঠীরপক্ষ থেকে প্রশান্ত মহলানবিশ ১৫ মার্চ ১৯২১ প্রকাশ করেন 'কেন রবীন্দ্রনাথকে চাই' শীর্ষক এক পুস্তিকা—ব্রাহ্মসাধারণের মধ্যে বিতরণের জন্য।

বাহান্ন পৃষ্ঠার এই প্রকাশটিতে তিনি অতি ভদ্র ও সংযত ভাষায় আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলির উত্তর দিয়েছেন প্রমাণ সহযোগে। তা ছাড়া এর থেকে জানা যায় সুকুমার রায় ও প্রশান্ত মহলানবিশ রবীন্দ্রনাথের পক্ষে আবেদন করে আর একখানি স্বাক্ষরহীন ইস্তাহার নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে বিতরণ করে-

ছিলেন। ইস্তাহার সমর্থন করেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ কয়েকজন ব্রাহ্ম প্রধান। অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথ-বিরোধী কর্তৃপক্ষের তরফেও ব্যক্তিগত পত্র লিখে ভোট সংগ্রহ প্রচেষ্টার বিরাম ছিল না। যুবগোষ্ঠী গিরিডির কোনো ব্রাহ্ম ভদ্রলোককে লেখা সমাজের সভাপতি কৃষ্ণকুমার মিত্রের একখানি ব্যক্তিগত পত্র উদ্ধার করে 'কেন রবীন্দ্রনাথকে চাই' পুস্তিকায় ছাপিয়ে দেন (পৃঃ ৪৬):

৫ই মার্চ

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

শশীবাবু, হেরম্ববাবু, প্রাণকৃষ্ণবাবু, সীতানাথবাবু, বরদাবাবু প্রভৃতি কার্যনির্বাহক সভার সভ্য ও সম্পাদক হরকান্তবাবু, সহকারী সম্পাদক অন্নদাবাবু, নরেন্দ্রবাবু ও আমি পদত্যাগ করিয়াছি। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে যদি রক্ষা করিতে হয় তবে অবিলম্বে এমন কিছু করিবেন যাহাতে গিরিডি এবং অন্যান্য স্থানের আপনার পরিচিত ব্রাহ্মগণ হরিবাবুকে ভোট না দেন।

আপনার

(স্বাঃ) কৃষ্ণকুমার মিত্র

এখানে বলা উচিত ১৯ মার্চ ১৯২১ ছিল সাধারণের ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভার নিধারিত দিন। সেখানে এই গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন হবার কথা। ২৮ ফেব্রুয়ারী আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পত্র-প্রকাশ, মার্চের প্রথম সপ্তাহে কার্যনির্বাহক সভার অধিকাংশ সদস্যের একযোগে পদত্যাগ নির্বাচনে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে একটি গরম আবহাওয়া তৈরীর জন্য কর্তৃপক্ষের অবলম্বিত কৌশল ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এই পরিস্থিতিতেই রবীন্দ্র সমর্থক যুবগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে সুকুমার ও প্রশান্ত চন্দ্র প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, "কেন রবীন্দ্রনাথকে চাই।" পুস্তিকার উপসংহারে তাঁরা যা বলেছেন তা তাঁদের মনোভাবের উপযুক্ত প্রকাশ (পৃঃ ৫১-৫২):

"আমরা দেখিয়াছি যে রবীন্দ্রনাথ সমগ্র বিশ্বমানবকে লইয়া একটি

বিরাট সার্বভৌমিকতার আদর্শ গড়িয়া তুলিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের সার্বভৌমিকতা স্বাতন্ত্র্যকে পরিহার করে নাই, জাতীয়ত্বকে বর্জন করে নাই, বৈচিত্র্যকে বিসর্জন দেয় নাই। রবীন্দ্রনাথের সার্বভৌমিকতার মূল মন্ত্র—বহুর মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য স্থাপন। এই একমেবাদ্বিতীয়মের সাধনাকেই রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত তপস্যা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসেও আমরা এই এক মূল আদর্শ দেখিতে পাই। রবীন্দ্রনাথ নিজে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে ব্রহ্মসাধনার এই সার্বভৌমিক আদর্শটিকে বিশ্বজগতের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করাই ব্রাহ্মসমাজের চরম সার্থকতা। তাই রবীন্দ্রনাথের বাণী।

রবীন্দ্রনাথের গানে, কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসপ্রবন্ধ ও ধর্মোপদেশে তাঁহার সুমহান আদর্শ প্রকাশিত হইতেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিদিনের জীবনে তাঁহার নানা বিচিত্র প্রতিষ্ঠানে, তাঁহার সমগ্র কর্মপ্রচেষ্টায় ব্রাহ্মসমাজের সাধনা সত্য হইয়া উঠিতেছে। রবীন্দ্রনাথের জীবন্ত আদর্শের প্রভাবে ব্রাহ্মসমাজে নূতন প্রেরণা আসিয়াছে, এই জন্যই আমরা রবীন্দ্রনাথকে চাই।

রবীন্দ্রনাথকে সভ্য করা সম্বন্ধে যে আপত্তি উঠিয়াছে তাহাকে আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি না, তাহাকে আমরা অশ্রদ্ধাও করিব না। এই আপত্তির মধ্যে আমরা ব্রাহ্মসমাজের অতীত ইতিহাসের পরিচয় পাইতেছি। কঠিন সতর্কতার সহিত অন্যকে পরিহার করিয়া বাধা বিপত্তি প্রলোভনের মধ্যে কঠোর আত্মপরায়ণ শুচিতা তাহার নির্মম রিক্ততার দ্বারা একদিন ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু আজ সেই সংকীর্ণতার প্রয়োজন ঘুচিয়ে গিয়াছে। সেই জন্যেই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণের আপত্তিকে শ্রদ্ধা করিব কিন্তু একান্ত করিয়া দেখিব না। ব্রাহ্মসমাজে "না"-এর মাপকাঠি দিয়া বিচার করিবার দিন চলিয়া গিয়াছে, মানুষ কি করিতে পারে নাই, কোথায় তাহার অভাব পড়িয়াছে এ সমস্তই ছোট কথা। সে কি করিয়াছে, সে কি দিয়াছে, ইহাই বড় কথা।

…রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আপত্তি প্রায় সমস্তই ভ্রান্ত ধারণা হইতে প্রসূত। তথাপি বলিব না যে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কোনো দোষ-ত্রুটি নাই। কারণ আমাদের মাপকাঠির বিচারে তিনি নির্দোষ কিনা তাহাই বড় কথা নহে।…তাঁহার সমস্ত দোষ-ত্রুটি অপেক্ষা তিনি বড় বলিয়াই তাঁহাকে চাই।

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে আজ নেতি হইতে "ওঁ ইতি"-তে যাইবার দিন আসিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের বাণী এই নূতন যাত্রাটিকে সূচনা করিতেছে, তাই আমরা রবীন্দ্রনাথকে চাই! তাঁহার বাণী শুধু একটি আদর্শ মাত্র নহে, রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনের মধ্যে ইহা মূর্ত। তাই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে মানুষ, সেই মানুষটিকে আমরা চাই। আমাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতির মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে আমরা চাই।"

এই আবেদন সেদিন ব্যর্থ হয়নি। প্রবল উত্তেজনার মধ্যে তিনবার স্থগিত থেকে (২২ জানুয়ারী, ২৮ জানুয়ারী, ২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯২১) ১৯ মার্চ ১৯২১ তারিখে সভার অধিবেশন শেষ পর্যন্ত বসে এবং ব্যালট ভোট গ্রহণ করা হলে রবীন্দ্রনাথ ৪৪৬-২৩৩ ভোটে জয়লাভ করেন (**Annual Report of the Sadharan Brahmo Samaj for 1920 pp 77-81**)। আমৃত্যু কবি এই সম্মানিত সদস্য-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সুকুমার ও তাঁর বন্ধুবর্গ সংগ্রামে জয়লাভ করলেন বটে, কিন্তু এই ব্যাপারে ব্রাহ্মসমাজের অভ্যন্তরীণ অবস্থার যে চিত্র তাঁদের সামনে উদ্‌ঘাটিত হল তা নিদারুণ হতাশব্যঞ্জক। দেখা গেল নিজেদের হাতে ক্ষমতা রাখবার জন্য এবং নিজেদের সংকীর্ণ আদর্শানুসারে সমাজ পরিচালনা করতে নেতৃবৃন্দ বদ্ধপরিকর।

তাঁদের কাজের অতি প্রকাশ্য স্ববিরোধিতার জন্য তাঁরা এতটুকু সংকুচিত বা অনুতপ্ত নন। এমন কি রবীন্দ্রনাথ নির্বাচিত হবার পরেও সমাজের মুখপত্রে প্রকাশিত নানা পত্রে ও রচনায় তাঁরা যুব-গোষ্ঠীর প্রতি উষ্মাপ্রকাশে বিরত হলেন না (দ্রষ্টব্য-তত্ত্বকৌমুদী ১ বৈশাখ ১৩২৮/১৪ এপ্রিল ১৯২১, পৃঃ ২-৪, ৮-৯, ১০-১২; ১৬ বৈশাখ ১৩২৮/২৯ এপ্রিল ১৯২১, পৃঃ ১৯-২৩, এক জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮/১৫

মে ১৯২৮, পৃঃ ৩১-৩৪)। যুবকদের পক্ষ থেকেও উত্তর দেওয়া চলতে লাগল কিছুদিন। 'কেন রবীন্দ্রনাথকে চাই'-পুস্তিকাটি বিতর্কে তাঁদের বক্তব্য সর্বসাধারণকে জানবার জন্য তাঁরা পাঁচ কিস্তিতে 'তত্ত্বকৌমুদী'তে প্রকাশ করলেন (১ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮, পৃঃ ৩৪-৩৬ ; ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮, পৃঃ ৪৬-৪৭, ১ আষাঢ় ১৩২৮, পৃঃ ৫৫-৫৭, ১৬ আষাঢ় ১৩২৮ পৃঃ৮০-৮৩)। কার্যনির্বাহক সভার ৯ জন সদস্যের পদত্যাগ সম্পর্কে মন্তব্য করে লিখিত সুকুমার রায় ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের পত্র অধ্যক্ষসভার অধিবেশনে পঠিত হল ('তত্ত্বকৌমুদী' ১ আষাঢ় ১৩২৮ ১৫ জুন ১৯২১, পৃঃ ৬০)। সবচেয়ে সুকুমার এবং তাঁর বন্ধু-বর্গকে ব্যথিত করেছিল শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণকুমার মিত্রের মনোভাব ও আচরণ। এঁকেই আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্যরূপে সেখানকার বেদীতে বসিয়ে সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ অপমানিত হয়েছিলেন। কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে রবীন্দ্রনাথের প্রবেশাধিকার লাভের পথে সর্বাধিক রাখা সৃষ্টি করতে তিনি দ্বিধা করলেন না, পত্র লিখে বিরুদ্ধ-প্রচারেও এঁর অনীহা দেখা গেল না। দেখে শুনে ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সুকুমার রায়ের মত সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতাসম্পন্ন মানুষ যে নিতান্ত হতাশ হয়ে পড়বেন সে আর আশ্চর্য কি ?

নৈরাশ্যজনক বাহ্য পরিস্থিতির উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে এই সময় সুকুমারের মনোরাজ্যে ঘটে গিয়েছিল এক বিপর্যয়। এই প্রসঙ্গ জানতে পারা যায় ২৩ আগষ্ট ১৯২০ তারিখে প্রশান্তচন্দ্র মহলান-বিশকে লেখা তাঁর এক একান্ত গোপনীয় পত্রে—যে পত্র তাঁর মৃত্যুর ৬২ বৎসর পরে শ্রীসত্যজিৎ রায় প্রকাশ করেছেন (এক্ষণ, শারদীয় সংখ্যা ১৩৮৯)। পত্রখানি মনের খানিকটা উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় লেখা এক অন্তরঙ্গ বন্ধুকে তাই বক্তব্য খুব গুছিয়ে প্রকাশ করেননি লেখক, কিন্তু কথাগুলি এত আন্তরিকভাবে স্পষ্ট করে বলা যে তাঁর মনোভাব বুঝতে এতটুকু কষ্ট হয় না।

সংক্ষেপে কথাটা এইরকম : বেশ কিছুকাল থেকে সুকুমারের মনে হচ্ছে সমাজের কাজকর্মের সঙ্গে তাঁর মনের কোন মিল নেই,

অভ্যাসের বসে কতকটা যান্ত্রিকভাবেই তিনি এসবের সঙ্গে যোগ রক্ষা করে চলেছেন।

সেদিন সন্ধ্যার সমাজমন্দিরে আনন্দমোহন বসু-স্মৃতিসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি অনুভব করলেন, যে সহজ আনন্দবোধ এতকাল তাঁর মনকে সঞ্জীবিত রেখেছিল তা সম্পূর্ণ তিরোহিত—তার স্থানে যা সেখানে বিরাজিত তা হল ra.npant, morbid out and out pessimism'। এক সপ্তাহ আগে সিটি কলেজে আনন্দমোহন-স্মৃতিসভায় বক্তৃতা দেবার সময় কিন্তু তিনি এর বিপরীতভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন: "আমি feel করছিলাম যে I am absolutely possessed by a power যাব উপর আমার কোন কর্তৃত্ব নাই। আশ্চর্য রকম elevation, strength ও inspiration বোধ করছিলাম।··

সেদিনকার experience এত exhilarating বোধ হয়েছিল, আমি জীবনে সেরকম খুব কম বোধ করছি।"

এর পর থেকেই তাঁর মনে একটা প্রতিক্রিয়া আসে যার চূড়ান্ত প্রকাশ ১৩ আগস্ট সন্ধ্যার স্মৃতিসভায়। এর পর তিনি বন্ধুর কাছে কবেছেন একটি বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা যা ঠিক যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য: "···আমি কিছুদিন থেকে feel করছি যে আমার জীবনের মধ্যে একটা বড় crisis বা turning point আসছে, সেটা যে কি তা আমি ঠিক জানি না। কিন্তু আমার মনের মধ্যে এই বিশ্বাস ক্রমশঃ প্রবল হচ্ছে সেটা death ছাড়া আর কিছু নয়।··· বিশেষ করে গত কয়েক মাস ধরে ক্রমাগত থেকে থেকে মনে হয়েছে —আমার আর অপেক্ষা করে থাকবার সময় নেই—সময় নষ্ট করে সময়ের প্রতীক্ষা করে থাকব, এত বেশী সময় আমার হাতে নেই।" মনের এই অবস্থায় তিনি সকল কর্ম থেকে অব্যাহতি চান:

"I decline to thinkabout khasi Misston [খাসিয়া পাহাড়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত সেবা ও প্রচার কেন্দ্র], about Rabi Babu's election and other similar things. এটা

তুমি বুঝতে পারবে।...আমার মনে হচ্ছে কি একটা drastic irrevocable steps (?) আমি already নিয়েছি যার full import আমি এখনও বুঝতে পারছি না। কেন এরকম মনে হচ্ছে আমি তার কোন explanation খুঁজে পাচ্ছি না।"

চিঠিখানির তারিখের প্রতি লক্ষ করলে দেখা যায় যে যখন রবীন্দ্রনাথের নির্বাচন নিয়ে সমাজে তুমুল কলরব চলেছে তখনই স্বয়ং আন্দোলনের অন্যতম নায়ক এই ধরনের কাজে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন ক্রমশ তাঁর মনোরাজ্যের এই আলোড়নের জন্য।

এর বাহ্য কারণ কতকটা বোঝা যায়—সমাজ কর্তৃপক্ষের 'ভূমিকা' সুকুমারকে খুবই নিরাশ করেছিল—কিন্তু প্রকৃত কারণ সেটা নয়। তা হল প্রধানত দুটি : স্বাভাবিক আনন্দচেতনার সাময়িক অবলুপ্তি এবং আসন্ন মৃত্যুর পূর্বাভাস (premonition)।

তাঁর পিতার মতই সুকুমাব ছিলেন তাঁর হাস্যময় কৌতুকপ্রবণ বাহ্যরূপ সত্ত্বেও প্রকৃতিতে অন্তর্মুখী ও একটি স্বাভাবিক আনন্দোপলব্ধির অধিকারী। তাঁর একটি ক্ষুদ্র কবিতায় এই উপলব্ধি প্রকাশিত :

যে আনন্দ ফুলের বাসে
যে আনন্দ পাখির গানে,
যে আনন্দ অরুণ আলোয়
যে আনন্দ শিশুর প্রাণে,
যে আনন্দে বাতাস বহে
যে আনন্দ সাগর জলে,
যে আনন্দ ধূলির কণায়
যে আনন্দ তৃণের দলে,
যে আনন্দে আকাশভরা,
যে আনন্দ তারায় তারায়,
যে আনন্দ সকল সুখে,
যে আনন্দ রক্তধারায়,

সে আনন্দ মধুর হয়ে
তোমার প্রাণে পড়ুক ঝরি,
সে আনন্দ আলোর মত
থাকুক তব জীবন ভরি।

(সুকুমার সাহিত্যসমগ্র— সম্পাদক সত্যজিৎ রায় ও পার্থ বসু, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১১৫)

সমাজে দলাদলি, ঝগড়াঝাঁটি ইত্যাদিতে এই অন্তর্মুখী প্রকৃতি ক্রমেই ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে উঠছিল তা সহজেই বোঝা যায়। এর পূর্বে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রীরও এই অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

আধ্যাত্মিক মূল্যবোধে প্রত্যয়ী মন বাহ্য কর্মকাণ্ডের অতিরিক্ত প্রাধান্য ও তৎসংক্রান্ত অনিবার্য তর্কবিতর্ক ও ক্ষমতার লড়াইকে একটানা সহ্য করে যেতে পারে না—তার মধ্যে ক্লান্তি ও বিরূপতা আসতে বাধ্য। অন্যদিকে সুখস্বাস্থ্যসমৃদ্ধ পরিপূর্ণ কর্মময় আনন্দোচ্ছল জীবনে যদি সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে মৃত্যুর ছায়াপাত হয় তাহলে প্রথম প্রতিক্রিয়া তো সুনিশ্চিত ভাবেই হবে এক অপরিমেয় শূন্যতাবোধ—কার্লাইল বর্ণিত eternal no জীবনকে গ্রাস করবেই সামগ্রিক ভাবে। মরমীয়তাবাদের ইতিহাসে দেখা গেছে মরমী প্রকৃতিতে এই সাময়িক আনন্দচ্যুতি ও শূন্যতাবোধ খুবই সাধারণ অভিজ্ঞতা—এর বহু সাক্ষ্য আছে। এই অন্ধকার ও যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে সাধকগণকে যেতেই হয়। কিন্তু এর পরে আসে পরমপ্রাপ্তি। এরই নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় টলস্টয়ের জীবনে—এবং আরো কাছের দৃষ্টান্ত রয়েছেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অন্ধকার থেকে আলোকে চরম উত্তরণের পালা যখন আসে তখন তা হয় এক নূতন জন্ম। উইলিয়ম জেম্‌সের ভাষায়ঃ

"The process is one of redemption, not of mere reversion to natural health and the sufferer, when saved, is saved by what seems to him, a second birth, a deeper kind of conscious being

than he could enjoy before." (The Varieties of Religious Experience. 1925, p. 157)।

সুকুমারের জীবনের অন্তিম পর্বেও দেখি একই অভিজ্ঞতার পুনরাবর্তন। তাঁর মৃত্যুর পূর্বাভাস নিষ্ঠুর সত্যে পরিণত হয়েছিল। যতদিন তিনি সুস্থ ছিলেন ততদিন অবশ্য সমাজে কাজ থেকে অব্যাহতি পাননি। কিন্তু এই পত্র লেখার ছয় মাস পরেই তিনি আক্রান্ত হন সেই কালব্যাধিতে যা ১৯২৩ সালে তাঁর ইহজীবনের সমাপ্তি ঘটায়। ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাভঙ্গ ঘটলেও এর আদর্শে যে শেষ পর্যন্ত তাঁর বিশ্বাস দৃঢ় ছিল তার স্পষ্ট প্রমাণ অতীতের ছবি, যাঁর অংশবিশেষের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্তমান প্রবন্ধ আরম্ভ করেছি। এ আদর্শ তাঁর একান্ত শ্রদ্ধার বস্তু না হলে মৃত্যুশয্যায় শয়ান অবস্থায় ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এর দ্বারা উদ্বুদ্ধ করে তোলবার প্রয়াস তিনি কখনো করতেন না। কিন্তু এর চাইতেও বড় কথা মৃত্যুশয্যাতেই তিনি ফিরে পেয়েছিলেন তাঁর অসীম আনন্দের উপলব্ধি—তাই রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁকে দেখতে এলেন তাঁর কাছে শুনতে চেয়েছিলেন আনন্দের গান। এর সাক্ষ্য রেখে গিয়েছেন কবি 'শান্তিনিকেতন'-এর অন্তর্ভুক্ত এক অপূর্ব ভাষণে: 'মানুষ যখন সাংঘাতিক রোগে পীড়িত, তখন মৃত্যুর সঙ্গে তার প্রাণশক্তির সংগ্রামটাই সকলের চেয়ে প্রাধান্য লাভ করে। যারা কেবল প্রাণী-মাত্র মৃত্যু তাদের পক্ষে একান্ত মৃত্যু। কিন্তু মানুষের জীবনে মৃত্যুই শেষ কথা নয়।...

আমার পরম স্নেহভাজন যুবকবন্ধু সুকুমার রায়ের রোগশয্যার পাশে এসে যখন বসেছি এই কথাই বার বার আমার মনে হয়েছে। আমি অনেক মৃত্যু দেখেছি কিন্তু এই অল্পবয়স্ক যুবকটির মতো, অল্প-কালের আয়ুটিকে নিয়ে মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে এমন নিষ্ঠার সঙ্গে অমৃতময় পুরুষকে অর্ঘ্যদান করতে প্রায় আর কাউকে দেখিনি। মৃত্যুর দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে অসীম জীবনের জয়গান তিনি গাইলেন।

তাঁর রোগশয্যার পাশে বসে সেই গানের সুরটিতে আমাব চিত্ত পূর্ণ হয়েছে। ··

এই কথাটি আজ এত জোরের সঙ্গে আমাব মনে বেজে উঠেছে তাব কাবণ সেদিন সেই যুবকের মৃত্যুশয্যায় দেখলুম সুদীর্ঘকাল দুঃখ-ভোগের পরে জীবনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর মতো অত বড়ো বিচ্ছেদকে, প্রাণ যাকে শত্রু বলে জানে, তাকেও তিনি পরিপূর্ণ করে দেখতে পেয়েছেন। তাই আমাকে গাইতে অনুরোধ করেছিলেন—

আছে দুঃখ আছে মৃত্যু বিরহদহন লাগে,
তবুও শান্তি তবু আনন্দ তবু অনন্ত জাগে।

যে গানটি তিনি আমাকে দু'বার অনুরোধ করে শুনলেন সেটি এই ঃ

দুঃখ এ নয় সুখ নহে গো
গভীর শান্তি এ যে,
আমার সকল ছাড়িয়ে গিয়ে
উঠল কোথায় বেজে।

সুকুমারের জীবনের অন্তিম মুহূর্তগুলিতে পূর্ণতা ও আনন্দের উপলব্ধির ভূমিতে তাঁর চূড়ান্ত উত্তরণ ঘটেছিল—তাঁর অধ্যাত্মজীবনের এটাই সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

ভাবতে ভাল লাগে ইহলোক থেকে বিদায়ের কালে তাঁর জীবনে এই অবিস্মরণীয় পঙক্তিগুলি প্রায় আক্ষরিকভাবেই সত্য হয়েছিল ঃ

ওরে মন
যাত্রার আনন্দগানে পূর্ণ আজি সকল গগন
তোর রথে গান গায় বিশ্বকবি
গান গায় গ্রহতারা রবি।

আর রবীন্দ্রনাথ? তিনিও দুর্লভ অমূল্য অভিজ্ঞতা আহরণ করে নিয়ে গেলেন এই মৃত্যুশয্যা থেকে।

এ অভিজ্ঞতা তার একবার মাত্র আর একজনের মৃত্যুশয্যায় তাঁর হয়েছিল। কবি রজনীকান্ত সেন।

কেন রবীন্দ্রনাথকে চাই

সুব্রত রুদ্র

সুশোভন সরকারের স্মৃতিচারণ নানা দিক থেকেই মূল্যবান। তাঁর সময়ের অনেক টুকরো ঘটনা আর অনেকেরই স্মৃতি জড়ানো জীবনছবি পাওয়া যায় এখানে। সুকুমার রায় ছিলেন সুশোভন বাবুদের ছাত্রদলের নেতা। সে সময়ে ব্রাহ্ম নব্য যুবকদের কাছে তাতাদা (সুকুমার রায়) এক পরম বিস্ময়!

সুশোভনবাবুর সঙ্গে সুকুমার রায়ের যোগাযোগ হয় ১৯১৮ সালের শেষ দিকে। সুশোভনবাবু তখন বি-এ পড়বেন ব'লে কলকাতায় এসেছেন। সে-সময় পুরানো ছাত্রসমাজকে পুনর্গঠিত করার একটা প্রচেষ্টা নিয়ে ছিলেন ব্রাহ্মযুবকরা। তাঁদের অবিসম্বাদিত নেতা সুকুমার রায়। তখন ছাত্রসমাজের সভ্য হ'তে হলে কয়েকটি নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি দিতে হ'তো। সংস্কারকরা সেই বিধি সংশোধন করে ইতিবাচক কয়েকটি লক্ষ্যের দিকে ঝোঁক দিয়ে নতুন প্রবেশপত্র রচনা করেন। এ-নিয়ে এক কমিটি তৈরি হয় 'Rules Revision committee'। কমিটিতে নেওয়া হয় সুশোভনবাবুকে। তারপরই তিনি জড়িয়ে পড়েন নতুন আন্দোলনে।

ছাত্রসমাজ পুনর্গঠিত হ'লে অ-ব্রাহ্মসভ্যদেরও নেওয়া হ'তে থাকে। নিয়মিত ও বিশেষ অধিবেশন ছাড়া ছাত্রসমাজের সভ্যদের activise করার জন্য কয়েকটি সমিতি গঠিত হয় ১৯১৯ সালে। নাম দেওয়া হয় ফ্রেটারনিটি। ফ্রেটারনিটি ছিল চারটি—ডিভোসনাল, এডুকেশনাল, লিটারারি, সোশ্যাল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পাশেই প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের ঘরে বৈঠকগুলি হ'তো। পরে প্রভাত কুসুম রায়চৌধুরীর বাড়ির ছাদেও বৈঠক হয়েছে। এই চারটি ফ্রেটারনিটির মধ্যে 'সোশ্যাল ফ্রেটানিটি বৈঠকের কথা সুশোভনবাবু লিখেছিলেন 'দেশ' পত্রিকায়।

কিছুদিনের মধ্যেই ছাত্রসমাজের প্রাথমিক আন্দোলন ছাপিয়ে ব্রাহ্মসমাজে এক বৃহত্তর আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনে সংস্কারকদের নেতৃত্ব দেন সুকুমার রায়। সহযোগই ছিলেন প্রশান্ত চন্দ্র। প্রথমেই আন্দোলনের কেন্দ্রে ছিল একটি প্রস্তাব। প্রস্তাব তোলেন নবীন ব্রাহ্মদল। প্রস্তাবটি এই বকম: শ্রীযুক্ত ববীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনারারি সভ্য করতে হবে।

কাকুকে অনারারি সভ্য নির্বাচন কবাব রীতি আগে থেকেই চালু ছিল সমাজে। এই প্রস্তাবে প্রবীনরা প্রচণ্ড রকম আপত্তি তুললেন। সেকালেব প্রবীন অনেক ব্রাহ্মই রবীন্দ্রনাথকে ব্রাহ্ম ব'লে মানতেন না। তাঁদের বিশ্বাস ছিল প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম নন। নবীনরা ব্রাহ্মসমাজেব উদার আদর্শের প্রচাবক. তাঁরা এই আদর্শেব দিকটিকে দৃঢ় করতে রবীন্দ্রনাথকে চাইতেন। নবীনদের পক্ষে প্রশান্ত চন্দ্র ছোট্ট একটি পুস্তিকা বের করলেন 'কেন রবীন্দ্রনাথকে চাই'।

সুকুমার রায়ের নবীন ব্রাহ্মদলেব পক্ষ থেকে এই পুস্তিকায় রবীন্দ্রনাথের সমর্থনে সমস্ত রকম যুক্তি দেখানো হয়। প্রত্যেকটি অধিবেশনে সুকুমার প্রস্তাব তুলতেন রবীন্দ্রনাথকে নির্বাচন করা হোক. কিন্তু প্রবীনরা নানা অজুহাতে প্রত্যেকবারই বাতিল ক'রে দিতেন। প্রবীনরাই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃত্ব করতেন। এক সময় এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছিল সবাই ভাবতেন ব্রাহ্মসমাজ আবার ভেঙে টুটুকরো হবে। সুশোভনবাবু ব'লেছিলেন এ-প্রসঙ্গে: 'রবীন্দ্রনাথকে নির্বাচিত হতে বাধা দেবার মতো তারা (প্রবীনরা) নিয়মতন্ত্র-বিরোধী কিছু কাজ করতে থাকেন। প্রতি অধিবেশনে সুকুমার রায় প্রস্তাব করতেন যে, রবীন্দ্রনাথকে নির্বাচন করা হোক আর প্রস্তাব সমর্থন করতেন প্রশান্তচন্দ্র। কিন্তু কর্তৃপক্ষ প্রতিবারই নানা কৌশলে নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করে সে প্রস্তাব নাকচ করে দিতে থাকেন।···এ'রকম এক মুহূর্তে যুবকদের দল সুকুমার রায়ের নেতৃত্বে স্থির করেন যে, আসন্ন বাৎসরিক মাঘোৎসব তাঁরা বর্জন করবেন।'

ব্রাহ্মসমাজ অবশ্য ভাঙেনি। ভাঙন এড়ানো গেল কয়েকজন

ব্রাহ্ম আইনবিদের মধ্যস্থতায়। তাঁরা ঠিক ক'রে দিলেন মন্দিরের অধিবেশনের বদলে শহর আর মফঃস্বলে ছড়ানো ব্রাহ্মসমাজের সকল সভ্যদের একটা Reforendum করতে। প্রবল উত্তেজনার মধ্যে যে Referendum অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এবার রবীন্দ্রনাথ সম্মানিত সদস্য হ'লেন।

অনেকের ধারনা ব্রাহ্মসমাজের এ-সব ব্যাপারে এই সময় সুকুমার রায়ের মন কিছুটা ভেঙে যায়। মনে জোর বিশ্বাস পাচ্ছিলেন না ব্রাহ্মসমাজ নিয়ে আদর্শগত বিশ্বাসটি নিজের মধ্যে আস্তে-আস্তে ভাঙছিল। ঠিক এরপরই সুকুমার রায় অসুস্থ হন। তাঁর কালাজ্বর হয়েছিল। ওষুধ তখনো আবিষ্কার হয় নি। ১৯২১ সাল থেকে ১৯২৩ পর্যন্ত তিনি অনেকরকম চিকিৎসা করান। নানা জায়গা ঘুরে হাওয়াবদল করতেন। এদিকে তাঁর অভাবে নবীন ব্রাহ্ম যুবকদের আন্দোলন স্তিমিত হ'য়ে এল। বলতে গেলে ব্রাহ্মসমাজ প্রায় নিভেই গেল।

সুকুমার রায়ের গল্প

স্নেহাশীষ ঘোষ সংকলিত

সুকুমার রায়ের অসামান্য লেখনিতে ছোটদের জন্য গল্পগুলি আর আজ পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না। তবুও তাঁর কয়েকটি গল্প সংকলিত করে পাঠকদের কাছে তুলে ধরা হল।

নয় বোনের গল্প

নয়টি বোন ছিলেন, তাঁহারা ছন্দের দেবী। গানের ছন্দ, কবিতার ছন্দ, নৃত্যের ছন্দ, সংগীতের ছন্দ—সকল রকম ছন্দকলায় তাঁহাদের সমান আর কেহই ছিল না। তাঁহাদেরই একজন, দেবরাজ জুপিটারের পুত্র আপোলোক বিবাহ করেন।

আপোলো ছিলেন সৌন্দর্যের দেবতা, শিল্প ও সংগীতের দেবতা। তিনি যখন বীণা বাজাইয়া গান করিতেন তখন দেবতারা পর্যন্ত অবাক হইয়া শুনিতেন।

এমন বাপ-মায়ের ছেলে অর্ফিয়ুস যে গান-বাজনায় অসাধারণ ওস্তাদ হইবেন, সে আর আশ্চর্য কি? অর্ফিয়ুসের গুণের কথা দেশ-বিদেশে রটিয়ে গেল-স্বয়ং আপোলো খুশী হইয়া তাঁহাকে নিজের বীণাটি দিয়া ফেলিলেন। পাহাড়ে-পর্বতে বনে-জঙ্গলে অর্ফিয়ুস বীণা বাজাইয়া ফিরিতেন আর সমস্ত পৃথিবী স্তব্ধ হইয়া তাহা শুনিত। অর্ফিয়ুসের বীণার সুরে আকাশ যখন ভরিয়া উঠিত, তখন সুরের আনন্দে গাছে গাছে ফুল ফুটিত, সমুদ্রের কোলাহল থামিয়া যাইত, বনের পশু হিংসা ভুলিয়া অবাক হইয়া পড়িয়া থাকিত।

এইরকমে দেশে দেশে বীণা বাজাইয়া অর্ফিয়ুস ফিরিতেছেন। এমন সময় একদিন ইউরিডিস নামে এক আশ্চর্য সুন্দরী মেয়ে তাঁহার বীণার সুরে মোহিত হইয়া দেখিতে আসিলেন, কে এমন সুন্দর

বাজায়। ইউরিডিসকে দেখিবামাত্র অর্ফিয়ুসের মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, তাঁহার আনন্দ বীণার ঝংকারে ঝংকারে আকাশকে মাতাইয়া তুলিল। তন্ময় হইয়া সেই সংগীত শুনিতে-শুনিতে ইউরিডিসের মন একেবারে গলিয়া গেল। তারপর ইউরিডিসের সঙ্গে অর্ফিয়ুসের বিবাহ হইল; মনের আনন্দে দুইজনে দেশ-দেশান্তরে বেড়াইতে চলিলেন।

কিন্তু এ আনন্দ তাঁহাদের বেশিদিন থাকিল না। একদিন মাঠের মধ্যে এক বিষাক্ত সাপ ইউরিডিসকে কামড়াইয়া দিল এবং সেই বিষেই ইউরিডিসের মৃত্যু হইল। অর্ফিয়ুস তখন শোকে পাগলের মতো হইয়া পড়িলেন, তাঁহার বীণার তারে হাহাকার করিয়া করুণ সংগীত বাজিয়া উঠিল। কি করবেন, কোথায় যাইবেন, কিছুই ভাবিয়া না পাইয়া, ঘুরিতে ঘুরিতে অর্ফিয়ুস একেবারে অলিম্পাস পর্বতের উপর আসিয়া পড়িলেন। সেখানে দেবরাজ বজ্রধারী জুপিটার তাঁহার দুঃখের গানে ব্যথিত হইয়া বলিলেন, "যাও, পাতালপুরীতে প্রবেশ করিয়া যমরাজ প্লুটোর নিকট তোমার স্ত্রীর জন্য নূতন জীবন ভিক্ষা করিয়া আন। কিন্তু জানিও, এ বড় দুঃসাধ্য কাজ, প্রাণের মায়া যদি থাকে, তবে এমন কাজে যাইবার আগে চিন্তা করিয়া দেখ।"

অর্ফিয়ুস নির্ভয়ে বীণা বাজাইতে বাজাইতে পাতালের দিকে চলিলেন। পাতালপুরীর সিংহদ্বারে যমরাজের ত্রিমুণ্ড কুকুর দিনরাত পাহারা দেয়। অর্ফিয়ুসকে আসিতে দেখিয়া রাগে তাহার ছয় চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল—তাহার মুখ দিয়া বিষাক্ত আগুন ফেনাইয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু অর্ফিয়ুসের বীণার সুর যেমন তাহার কানে আসিয়া

মুহূর্তের মধ্যে থামিয়া গেল। জলের মধ্যে আকণ্ঠ ডুবিয়া অত্যাচারী ট্যান্টেলাস পিপাসায় পাগল—পান করিতে গেলেই জল সরিয়া যায়। বীণার সংগীতে সে তাহার তৃষ্ণা ভুলিয়া গেল। মহাপাপী ইক্সিয়ন নরকের ঘুরন্ত চক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে এতদিন পরে বিশ্রাম পাইল, ঘুরন্ত চক্র স্তব্ধ হইয়া রহিল। ধূর্ত নিষ্ঠুর সিসিফাস চিরকাল ধরিয়া পাহাড়ের উপর পাথর গড়াইয়া তুলিতেছে, যতবার তোলে ততবার পাথর গড়াইয়া পড়ে, সেও দারুণ শ্রমের দুঃখ ভুলিয়া সেই সংগীত শুনিতে লাগিল।

অর্ফিয়ুস যমরাজের সিংহাসনের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। যম-রাজ প্লুটো ও রানী প্রসেরপিনা গম্ভীর হইয়া বসিয়া আছেন, তাঁহাদের পায়ের কাছে নিয়তিরা তিন বোনে জীবনের সূতা লইয়া খেলিতেছে। একজন সূতা টানিয়া ছাড়াইতেছে, একজন সেই সূতা পাকাইয়া জড়াইতেছে, আর-একজন কাঁচি দিয়া পাকান সূতা ছাঁটিয়ে ফেলিতেছে। অর্ফিয়ুসের সংগীতে যমরাজ সন্তুষ্ট হইলেন, নিয়তিরা প্রসন্ন হইলেন। তখন আদেশ হইল, 'ইউরিডিসকে ফিরাইয়া দাও, সে পৃথিবীতে ফিরিয়ে যাক। কিন্তু সাবধান অর্ফিয়ুস! যমপুরীর সীমানা পার হইবার পূর্বে ইউরিডিসের দিকে ফিরিয়া চাহিও না-তবে কিন্তু সমস্তই পণ্ড হইবে।'

অর্ফিয়ুস মনের আনন্দে বীণা বাজাইয়া চলিলেন, তাঁহার পিছন পিছন ইউরিডিসও চলিলেন। যমপুরীর সীমানায় আসিয়া অর্ফিয়ুস মনের আনন্দে নিষেধের কথা ভুলিয়া ফিরিয়া তাকাইলেন। অমনি তাঁহার চোখের সম্মুখেই ইউরিডিসের অপূর্ব সুন্দর মূর্তি বিদায়ের ম্লান হাসি হাসিয়া শূন্যের মধ্যে মিলাইয়া গেল।

তারপরে অর্ফিয়ুস আর কি করিবেন? তিনি বনে-জঙ্গলে পাহাড়ে পাগলের মতো সন্ধান করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল, বনের আড়ালে আড়ালে পর্বতের গুহায় গুহায় ইউরিডিস লুকাইয়া আছেন। মনে হইল, গাছের পাতায় পাতায় বাতাসের নিশ্বাস বলিতেছে, 'ইউরিডিস, ইউরিডিস—' পাখিরা শাখায় শাখায়

করুণ সুরে গান করিতেছে, 'ইউরিডিস, ইউরিডিস!'

এমনিভাবে অস্থির মনে যখন তিনি ঘুরিতেছেন, তখন একদিন মদের দেবতা ব্যাকাসের সঙ্গীরা তাঁহাকে ধরিয়া বলিল, "তুমি ফুর্তি করিয়া বীণা বাজাও, আমরা নাচিব।" কিন্তু অর্ফিয়ুসের মনে সে স্ফুর্তি নাই, তাই বীণার তারেও কেবল দুঃখের সুরই বাজিতে লাগিল। তখন মাতালেরা রাগিয়া বলিল, "মার ইহাকে—এ আমাদের আমোদ মাটি করিতেছে।" তখন সকলে মিলিয়া অর্ফিয়ুসকে মারিয়া তাহার দেহ নদীতে ভাসাইয়া দিল। সেই দেহ ইউরিডিসের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে ভাসিয়া চলিল। শূন্যে অর্ফিয়ুসের আনন্দধ্বনি শুনিয়া সকলে বুঝিতে পারিল আবাব তিনি ইউরিডিসকে ফিরিয়া পাইয়াছেন।

জলে স্থলে নদীর কলস্রোতে ঝরনার ঝর্ঝর শব্দে আনন্দ-কোলাহল বাজিয়া উঠিল।

দুই বন্ধু

এক ছিল মহাজন, আর এক ছিল সওদাগর। দুজনে ভারী ভাব। একদিন মহাজন এক থলি মোহর নিয়ে তার বন্ধুকে বললে, "ভাই ক'দিনের জন্য শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছি, আমার কিছু টাকা তোমার কাছে রাখতে পারবে?" সওদাগর বললে, "পারব না কেন? তবে কি জানো, পরের টাকা হাতে রাখা আমি পছন্দ করি না। তুমি বন্ধু মানুষ, তোমাকে আর বলার কী আছে, আমার ঐ সিন্দুকটি খুলে তুমি নিজেই তার মধ্যে তোমার টাকাটা রেখে দাও—আমি ও টাকা ছোঁব না।" তখন মহাজন তার থলেভরা মোহর সেই সওদাগরের সিন্দুকের মধ্যে রেখে নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি গেল।

এদিকে হয়েছে কি, বন্ধু যাবার পরেই সওদাগরের মনটা কেমন

উস্‌খুস্‌ করছে। সে কেবলই ঐ টাকার কথা ভাবছে আর মনে হচ্ছে যে, বন্ধু না জানি কত কী রেখে গেছে! একবার খুলে দেখতে দোষ কি? এই ভেবে সে সিন্দুকের ভিতব উঁকি মেরে থলিটা খুলে দেখল —থলিভরা চক্‌চকে মোহর! এতগুলো মোহর দেখে সওদাগরের ভয়ানক লোভ হ'ল—সে তাড়াতাড়ি মোহরগুলো সরিয়ে তার জায়গায় কতগুলো পয়সা ভরে থলিটাকে বন্ধ ক'রে রাখল।

দশ দিন পরে তার বন্ধু যখন ফিরে এল, তখন সওদাগর খুব হাসিমুখে তার সঙ্গে গল্প-সল্প কবল, কিন্তু তার মনটা কেবলই বলতে লাগল, "কাজটা ভালো হয়নি। বন্ধু এসে বিশ্বাস করে টাকাটা বাখল, তাকে ঠকানো উচিত হয়নি।" একথা-সেকথার পর মহাজন বললে, "তা'হলে বন্ধু, আজকে টাকাটা নিয়ে এখন উঠি—সেটা কোথায় আছে?" সওদাগর বললে, "হ্যাঁ বন্ধু, সেটা নিয়ে যাও। তুমি যেখানে রেখেছিলে সেইখানেই পাবে—আমি থলিটা আব সরাইনি।" বন্ধু তখন সিন্দুক খুলে তার থলিটা বের ক'রে নিল। কিন্তু, কি সর্বনাশ! থলিভরা মোহর ছিল, সব গেল কোথায়? সব যে কেবল পয়সা! মহাজন মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল!

সওদাগর বললে, "ওকি বন্ধু! মাটিতে বসলে কেন?" বন্ধু বললে, "ভাই, সর্বনাশ হয়েছে! আমার থলিভরা মোহর ছিল- - এখন দেখছি একটাও মোহর নেই, কেবল কতগুলো পয়সা!" সওদাগর বললো "তাও কি হয়? মোহর কখনও পয়সা হয়ে যায়?" সওদাগর চেষ্টা করছে এমন ভাব দেখাতে যেন সে কতই আশ্চর্য হয়েছে; কিন্তু তার বন্ধু দেখল তার মুখখানা একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। ব্যাপারটা বুঝতে তার আর বাকি রইল না—তবু সে কোনো রকম রাগ না দেখিয়ে হেসে বললে, "আমি তো মোহর মনে করেই রেখেছিলাম—এখন দেখছি কোথাও কোনো গোল হয়ে থাকবে। যাক, যা গেছে তা গেছেই—সে ভাবনায় আর কাজ নেই।" এই বলে সে সওদাগরের কাছে বিদায় নিয়ে পয়সার থলি বাড়িতে নিয়ে গেল। সওদাগর হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

দু'মাস পরে হঠাৎ একদিন মহাজন তার বন্ধুর বাড়ি এসে বললে, "বন্ধু, আজ আমার বাড়িতে পিঠে হচ্ছে—বিকেলে তোমার ছেলেটিকে পাঠিয়ে দিও।" বিকালবেলা সওদাগর তার ছেলেকে নিয়ে মহাজনের বাড়িতে রেখে এল, আর বললে, "সন্ধ্যার সময় এসে নিয়ে যাব।" মহাজন করল কি ছেলেটার পোশাক বদলিয়ে তাকে কোথায় লুকিয়ে রাখল—তার একটা বাঁদরকে সেই ছেলের পোশাক পরিয়ে ঘরের মধ্যে বসিয়ে দিল।

সন্ধ্যার সময় সওদাগর আসতেই তার বন্ধু এসে মুখখানা হাঁড়ির মতো করে বললে, "ভাই! একটা বড় মুশকিলে পড়েছি। তোমার ছেলেটিকে তুমি যখন দিয়ে গেলে, তখন দেখলাম দিব্যি কেমন নাদুস-নুদুস্ ফুটফুটে চেহারা—কিন্তু এখন দেখছি কি রকম হয়ে গেছে —ঠিক যেন বাঁদরের মতো দেখাচ্ছে! কি করা যায় বলতো বন্ধু?" ব্যাপার দেখে সওদাগরের তো চক্ষুস্থির! সে বললে, "কি পাগলের মতো বক্‌ছ? মানুষ কখনও বাঁদর হয়ে যায়?" মহাজন অত্যন্ত ভালো মানুষের মতো বললে, "কি জানি ভাই। আজকাল কি সব ভূতের কাণ্ড হচ্ছে, কিছু বুঝবার জো নেই। এই দেখ না সেদিন আমার সোনার মোহরগুলো খামকা বদলে সব তামার পয়সা হয়ে গেল। অদ্ভুত ব্যাপার!"

তখন সওদাগর রেগে বন্ধুকে গালাগালি দিয়ে কাজির কাছে দৌড়ে গেল নালিশ করতে। কাজির হুকুমে চার-চার প্যায়দা এসে মহাজনকে পাকড়াও ক'রে কাজির সামনে হাজির করল। কাজি বললেন, "তুমি এর ছেলেকে নিয়ে কী করেছ?" শুনে চোখ দুটো গোল ক'রে মস্ত বড় হাঁ ক'রে মহাজন বললে, "আমি? আমি মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, আমি কি অত সব বুঝতে পারি? ওর বাড়িতে মোহর রাখলাম, দশ দিনে সব পয়সা হ'য়ে গেল। আবার দেখুন ওর ছেলেটা আমার বাড়ি আসতে-না-আসতেই ল্যাজ-ট্যাজ গজিয়ে দস্তুরমতো বাঁদর হয়ে উঠেছে। কি রকম যে হচ্ছে—আমার বোধ

হয় সব ভূতুড়ে কাণ্ড।” এই ব’লে সে কাজিকে লম্বা সেলাম করতে লাগল।

কাজিও চালাক লোক, ব্যাপার বুঝতে তাঁর বাকি রইল না। তিনি বললেন, “আচ্ছা তোমরা ঘরে যাও। আমি দৈবজ্ঞ ফকির ডাকিয়ে মন্ত্র পড়ে ভূত ঝাড়িয়ে সব শায়েস্তা করছি। তোমার পয়সার থলি ওর কাছে দাও—আর তোমার বাঁদর ছেলেকে এর কাছেই রাখ। কাল সকালের মধ্যে সব যদি ঠিক না হয় তবে বুঝব এতে তোমাদের কারুর শয়তানি আছে। সাবধান! তাহ’লে তোমার পয়সাও পাবে না, মোহরও পাবে না—আর তোমার ছেলে তো মরবেই, ছেলের বাপ মা খুড়ো জ্যাঠা সবসুদ্ধ মেরে সাবাড় করব।”

সওদাগর পয়সার থলি সঙ্গে নিয়ে ভাবতে ভাবতে ঘরে চলল। মহাজন বাঁদর নিয়ে হাসতে হাসতে বাড়ি ফিরল। ভোর না-হতেই সওদাগর থলির মধ্যে আবার মোহর ভ’রে মহাজনের বাড়ি গিয়ে বলছে, “বন্ধু! বন্ধু! কি আশ্চর্য দেখে যাও! তোমার পয়সাগুলো আবার সব মোহর হয়েছে।” মহাজন বললে, “তাই নাকি? কি আশ্চর্য, এদিকে সেই বাঁদরটাও আবার তোমার খোকা হয়ে গেছে।” তারপর মোহরের থলি নিয়ে সওদাগরের ছেলেটাকে ফিরিয়ে দিয়ে মহাজন বললে, “দেখ্‌ জোচ্চোর! ফের যদি আমায় ‘বন্ধু’ ‘বন্ধু’ বলবি তো মেরে তোর থোঁতামুখ ভোঁতা ক’রে দেব।”